বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১ (২২০০)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৬৩ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : শ্রীপরিমল গোস্বামী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভ্রম-সংশোধন ঃ ভূমিকার ১০৫ পৃষ্ঠায় ১৬ জুন, ১৯২৩ এর পরিবর্তে ১৯ জুন, ১৯২৯ পড়িতে হইবে।



ভূমিকা

(১)

মনের ভিতরের শিশুটাকে চেপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে না পারলে সংসারে জ্ঞানী গুণী বিদ্বান বা বিচক্ষণ হওয়া যায় না—এ বিশ্বাস যাদের আছে তাদের বিভূতিভূষণ অত্যন্ত দুর্ভাগা জীব বলেই মনে করতেন। তাদের জন্য জীবনে তিনি এক লাইনও লেখেন নি। তাঁর নিজের মনের শৈশব-সত্তাটিকেও সারা জীবন তিনি সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—তাই বিস্মিত হবার, আনন্দিত হবার ক্ষমতা তিনি কখনও হারান নি; তাই তাঁর রচিত মানবিক সুখ দুঃখের কাহিনীর প্রতিটি পৃষ্ঠা এই শিশুদৃষ্টির প্রসন্নতার আলোয় সর্বদাই আলোকিত হয়ে আছে। প্রধানতঃ এই জন্যই তিনি শিল্পী হিসাবে অসাধারণ।

তাঁর অপুও অসাধারণ। গড়পড়তা মানুষের ছাঁচে তাকে ঠিক ফেলা যায় না। তার বাইরের জীবন অত্যন্ত সাধারণ—ইংরাজ আমলে সহায়-সম্বলহীন নিম্নবিত্ত স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রসন্তানের জীবন যেমন হওয়া সম্ভব ছিল ঠিক তাই। এমন কি, তার ছাত্রাবস্থার ও চাকুরী-জীবনের দুঃখকষ্টের ও অনশন-অর্ধাশনের যে কাহিনী আজ আমাদের মনকে এত বিচলিত করে তোলে তা একা অপুর কাহিনী নয়। তদানীন্তন কালের কলকাতায় সন্ধান করলে এমন শত শত অপুর দেখা মিলত। ঘটনাগত বিচারে অপুর জীবনে সত্যই অসাধারণত্ব কিছু নেই। তার অসাধারণত্ব তার অন্তর্জীবনে।

'অন্তর্জীবন' কথাটা একটু গোলমেলে ধরনের। চিন্তা অনুভূতি কল্পনা স্বপ্ন কামনা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা 'অবাস্তব' উপাদানের সংমিশ্রণে যে জটিল অথচ একীভূত মানসিকতা মানুষের অন্তর্লোকে গড়ে ওঠে, তার সামগ্রিক স্বরূপ বোঝানোর মত কোন সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয় নি। সমালোচকের হাতে বিশ্লেষণ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই, অথচ বিশ্লেষণের ফলে এই সামগ্রিক স্বরূপের কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটবেই।

এই বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি 'অপরাজিত' উপন্যাসের নায়কের মনোধর্ম বিচার করে দেখি, তাহলে প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ে দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা—এদের একটি তাকে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে চলেছে উৎকেন্দ্রিক চাঞ্চল্য, অগ্রগতি ও বিস্তৃতির দিকে, অপরটি সর্বদাই টেনে ধরে রেখেছে এক অচঞ্চল প্রশান্তি ও মাধুর্যের আপাত-সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। বস্তুতঃ বিশ্লেষ-বিচারের সুবিধার জন্য আমরা অনায়াসে এক অপুকে ভেঙে দুই অপু করে নিতে পারি।

এক অপু বেরিয়ে পড়তে চায় বিশাল বিশ্বের সুমহান ব্যাপ্তির মধ্যে, ইতিহাস ভূগোল প্রত্নতত্ত্ব জ্যোতিষ প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-রাজ্যের মধ্যে, কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের অপার্থিব আনন্দানুভূতির মধ্যে, বলিষ্ঠ আত্মোপলব্ধি ও প্রত্যয়ের মধ্যে, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যে। এই অপুই বাল্যে মায়ের সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে জোর করে ইস্কুলে

পড়তে গিয়েছিল্।   এই অপুই পরিণত বয়সে কাজলের মমতা-বন্ধন অগ্রাহ্য করে অজ্ঞাত দ্বীপ-ভূমির উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছিল।   মধ্যপ্রদেশের আরণ্য জীবনের গভীর-গম্ভীর অভিজ্ঞতার মধ্যে এই অপুর ছবিই আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এই কেন্দ্রাতিগ গতি-প্রবণতা অপুর নিজের অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়—এ তার সহজাত মনোধর্ম, জন্মলব্ধ সংস্কার।   সাবালক অপু যেদিন নাবালক ছিল সেদিনও কি সে রামায়ণ-মহাভারত বা 'রাজপুত-জীবন সন্ধ্যা'র কোলাহলময় কর্মোন্মাদনার কাহিনীতে, জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরির অস্পষ্ট ছায়াছবিতে, ভবঘুরে গ্রামবৃদ্ধের মুখে শোনা বিদেশ-পর্যটনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্যে এই বাইরের হাতছানি দেখতে পায় নি ?

আর এক অপু আছে যে একান্তভাবে নিশ্চিন্দিপুরের। এই অপু চিরশিশু।   নিশ্চিন্দিপুরের নির্জন নিসর্গ-পট সেই শিশুর লীলা-প্রাঙ্গণ।   নিশ্চিন্দিপুরের আকাশ-মাটি-নদী-বনভূমির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ অতি নিবিড়, অতি ঘনিষ্ঠ।   অনুভূতির অতি অন্তরঙ্গ, অতি গহন কন্দর এই mystic আকর্ষণের উৎসভূমি।—বড় হয়ে অপু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর তাকে ছাড়ে নি।   কলকাতার জনকোলাহল আর ধুলোধোঁয়ার মধ্যেই হোক আর মধ্যপ্রদেশের জনহীন অরণ্য-পর্বতের মধ্যেই হোক—নিশ্চিন্দিপুরের প্রশান্ত মাধুর্যময় জীবন তাকে সর্বদাই পরমকাম্য প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।   এ বন্ধন সে জীবনে কোনদিন ছিঁড়তে পারে নি—ছিঁড়তে চায়ও নি।

এই আকর্ষণটাকে শুধু শৈশবের সুখস্মৃতি বলে ভাবলে ভুল করা হবে।   স্মৃতি তো আছেই, কিন্তু স্মৃতি অতীত-প্রতিফলন মাত্র।   নিশ্চিন্দিপুরের জীবন অপুর কাছে অতীত জীবন মাত্র নয়—বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে।   যে শিশুটি নিশ্চিন্দিপুরের স্নেহস্নিগ্ধ স্তন্য-রসে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, পরিণত বয়সেও অপু তার মন থেকে তাকে নির্বাসিত করে নি।   অপুর মনের আধখানা তাই চিরদিনই শিশুমন রয়ে গেছে।   এই শিশু অপু অল্পেই অত্যন্ত খুশী হয়ে ওঠে—বোকার মত হি-হি করে হাসে, বাইরের চটকদার রং চং দেখে সহজেই ভুলে যায়—টুইশনের কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে খেলো জাপানী পর্দা কেনে, অপরের কাছ থেকে সামান্য একটু স্নেহ বা সদয় ব্যবহার পেলে সহজেই কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে পড়ে, পরকে বিশ্বাস করে ঠকে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কাল্পনিক স্বচ্ছলতার মিথ্যা বড়াই করে আনন্দ পায়—আর অবসর পেলেই একা বসে বসে নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন দেখে।   অনেক সমালোচক অপুর এই চির-শিশুত্বকে তার চরিত্রের একটা ত্রুটি বলে মনে করেন।   ত্রুটি কিনা জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা যে বিভূতিভূষণের ইচ্ছাকৃত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।   কাজেই অপুকে বুঝতে হলে তার এই আংশিক চিরশিশুত্বের তাৎপর্যটিও বুঝতে হবে।

আরও একটা কথা।   নিশ্চিন্দিপুরের আকর্ষণ গ্রাম-বাংলার কোমল-মধুর নিসর্গ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ মাত্র নয়।   অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামবাংলার প্রতীক স্থানীয় বস্তু নয়।   ঠিক অপু যেমন অপু, অন্য কেউ নয়, তেমনি নিশ্চিন্দিপুরও একটা বিশিষ্ট ভাবসত্তা ও বস্তুসত্তা—বাংলা দেশের যে কোন একটা গ্রাম মাত্র নয়। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন—তাঁর

পরিচয় তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। অপুও প্রকৃতিপ্রেমিক —বিশ্ব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। কিন্তু তার সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরের যে সম্পর্ক তা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থীয় প্রকৃতিপ্রেমিকের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্পর্ক মাত্র নয়। এ সম্পর্ক একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক—জননী ও সন্তানের সম্পর্কের মত, প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্কের মত গোপন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক—mystic, esoteric সম্পর্ক। সব গ্রাম অপুর ভালো লাগে না। যে মনসাপোতায় জীবনের এতগুলি বিষণ্ন মধুর দিন সে কাটিয়ে গেল সেই মনসাপোতাকেও সে ভালোবাসতে পারে নি কোনদিন: 'অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই।'—অপুর মনের ভিতরকার শিশুটির পক্ষে তাই নিশ্চিন্দিপুরকে ভোলা অসম্ভব।

সাবালক অপু ও নাবালক অপুর সহাবস্থানজনিত এই সমস্যা 'পথের পাঁচালী'-তে ছিল না; এবং এই সহাবস্থানের ফলেই 'অপরাজিত'-র অপু অনেক বেশি জটিলতর চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এই জটিলতাই তার অসাধারণত্ব।—অপু মাঝে মাঝে কেমন খাপছাড়া কথা বলে বসে, অসঙ্গত আচরণ করে বসে; তার অনেক প্রত্যাশা অনুচিত বলে মনে হয়, অনেক স্বপ্ন-কল্পনা নিতান্ত অবিবেচনা-প্রসূত বলে মনে হয়। এ সবই তার মধ্যেকার দুই অপুর সংঘর্ষ-মুহূর্তগুলি থেকে উদ্ভূত। আপাত-দৃষ্টিতে তাদের যতই অসঙ্গত বলে মনে হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক বা শৈল্পিক অসঙ্গতি নেই।

অপু স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ ও কল্পনা-বিলাসী, অর্থাৎ অপু কবি। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাবালক অপু ও নাবালক অপু দুইজনই কবি, অথচ তাদের কাব্যক্ষেত্র এক নয়। একজন মাধুর্যের কবি, অপরজন ঔদার্য ও ব্যাপ্তির কবি; একজন ক্ষুদ্র বালুকণার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে, অপরজন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে হস্তামলকে পরিণত করতে চায়; একজনের কাব্য বৈষ্ণবের গান, অপরজনের কাব্য উপনিষদের উদাত্ত সঙ্গীত।—এই পার্থক্যটুকুর কথা যদি সব সময় মনে না রাখা যায় তাহলে অপুর কাব্যানুভূতির বিবৃতিগুলিকে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ, ও তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে।

নাবালক অপু নিশ্চিন্দিপুরকে শুধু গাছপালা নদী-মাটি আকাশ-প্রান্তরের মধ্যে পায় নি, কয়েকটি নারীর মধ্যেও পেয়েছে। অতি শৈশবে পেয়েছিল দিদি দুর্গার সস্নেহ সাহচর্যের মধ্যে। পরবর্তী জীবনে দুর্গার স্মৃতিছবিটিকে সে কখনও নিশ্চিন্দিপুরের ফ্রেম থেকে পৃথক করে দেখতে পারে নি—দেখা যে সম্ভব তাও কখনও তার মনে হয় নি।—বাল্যে ও কৈশোরে মাতা সর্বজয়ার অঞ্চলের ছায়ায় সে নিশ্চিন্দিপুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। বস্তুতঃ সর্বজয়াকে বিভূতিভূষণ শুধু মমতাময়ী জননী রূপেই চিত্রিত করেন নি, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতেই তাকে গ্রাম-জননীর প্রতীকমূর্তি রূপে গড়ে তুলেছেন। সে চায় তার অপু মনসাপোতার কুঁড়ে ঘরে চিরদিন বাস করুক, তেলিবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামের পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করুক, বিয়ে-থা' করে সংসারী হোক—শিষ্যের দক্ষিণায় সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করুক। এতকাল ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে জীবন যাপন করার পর সর্বজয়া আবার নতুন

করে ঘর বাঁধতে চায় অপুকে নিয়ে। তা হলেই তার স্বপ্ন সার্থক হবে। অতি ছোট সাধ; অতি তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু যার সাধ, যার আকাঙ্ক্ষা তার কাছে তো এ তুচ্ছ নয়। এ সেই নিশ্চিন্দিপুরের সাধ, নিশ্চিন্দিপুরের আকাঙ্ক্ষা।—কলকাতা থেকে সর্বজয়া চলেছে মনসাপোতায় ভবতারণবাবুর সঙ্গে। টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে নতুন সংসারে কাজে লাগবে বলে। অপুকে 'একটা বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জ্বালবো—কত বড় লম্পটা দেখেছিস্? ছ' পয়সার তেল ধরে।'—এ কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্দিপুরের কণ্ঠস্বর।—সর্বজয়ার মৃত্যুতে নাবালক অপুর মন অসহায় দুঃখে ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু সাবালক অপু মুহূর্তের জন্ত অনুভব করেছিল 'একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস···একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস।' এইবার বোধ হয় নিশ্চিন্দিপুর তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এইবার বোধ হয় সে মুক্তির অনন্ত আকাশে ঊর্ধ্বচারী ডানা মেলে উধাও হয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু এখনও সময় হয় নি। মাটির সুমধুর টান, নিশ্চিন্দিপুরের সেই পুরাতন মায়াময় আকর্ষণ এখনও তার গগনবিহারী আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দিতে রাজি নয়। সর্বজয়ার সাধ তো এখনও মেটে নি—নিশ্চিন্দিপুর অপুর কাছে যা চায় তা তো এখনও পায় নি।

মুক্তি এল না—এল অপর্ণা।

অপর্ণার সঙ্গে অপুর সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক নয়। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া অপর্ণাকে অপু স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছে, করুণার দৃষ্টিতে দেখেছে, ঈষৎ অনুকম্পা-মিশ্রিত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেছে; কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রেম বলতে আমরা যা বুঝি সে প্রেম অপর্ণা অপুর কাছ থেকে কখনও পায় নি। অল্পে সন্তুষ্ট বোকা মেয়ে অপর্ণা এইটুকু পেয়েই ভেবেছে সব পেলাম। সে কি করে জানবে যে অপু একজন নয়, দুইজন? সে কি করে বুঝবে যে, যে-অপুকে সে এত আপনার করে পেয়েছে সে সেই নিশ্চিন্দিপুরের শিশু অপু? এ অপুর কাছ থেকে শিশুর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়—আর সে ভালোবাসা তো খেলারই নামান্তর মাত্র। মনসাপোতার পর্ণ-কুটিরেই হোক আর কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতেই হোক, অপর্ণা ও অপুর সংসার অপুর পক্ষে শুধু নিশ্চিন্দিপুর-নিশ্চিন্দিপুর খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপর্ণার মৃত্যুতে অপুর যে অপরিসীম বেদনা ও নৈরাশ্য তার কারণ শুধু প্রিয়বিরহ নয়—তার সত্যকার কারণ অপুর মনের আরও গভীর গহনে নিহিত। যে নিশ্চিন্দিপুর অপুর সচেতন ও অবচেতন মনের অর্ধাংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তার বাস্তব মৃত্তিকা-প্রাঙ্গণ থেকে সে নির্বাসিত। কিন্তু মাতা সর্বজয়া ছিলেন—তাঁর করুণ-কোমল স্নেহ-স্পর্শের মধ্যে অপু নিশ্চিন্দিপুরের জলমাটির স্পর্শ অনুভব করতে পারত, তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে নিশ্চিন্দিপুরের মায়াময় রসরূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারত। তারপর তিনি গেলেন, এল অপর্ণা। তার মধ্যে অপু আবার সর্বজয়াকে, নিশ্চিন্দিপুরকে ফিরে পেতে চেয়েছিল—পেয়েও ছিল আংশিকভাবে। শান্ত মেয়ে অপর্ণা, নরম মেয়ে অপর্ণা অপুর মনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চিন্দিপুরের প্রতিনিধি হয়ে।

তাই অপর্ণার মৃত্যুতে এত বেদনা, এত নৈরাশ্য। তাহলে কি এতদিনে সত্যই বাঁধন

ছিঁড়ল? জীবন-রসস্রোত-বাহিনী নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিশ্চিন্দিপুর কি তাহলে সত্যাই স্মৃতির কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত হল? এই কি মুক্তি? কিন্তু মুক্তির বেদনা যে এত অসহনীয় অপু আগে তো তা জানত না।

সাবালক অপু মুক্তি চায় সত্য, কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু তাকেও গভীর ভাবে বেদনার্ত করে তুলেছে। বিশ্লেষণী বিচারের ত্রুটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে কথাটা আরও একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন। যে দুই অপুর কথা এতক্ষণ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি আসলে তো তারা পৃথক নয়। তাদের সহাবস্থান mechanical mixture নয়, chemical compound. দুই অপু যেমন পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছে, এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলে সমগ্র অপুকে একটা অসাধারণত্বের মর্যাদা দান করেছে, তেমনি তারা পরস্পরকে প্রভাবিতও করেছে—একের রঙ অপরের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, অপুর জটিল চরিত্রকে জটিলতর করে তুলেছে। অপর্ণার মৃত্যুর বেদনা, নিশ্চিন্দিপুরের বন্ধনছেদনের বেদনা তাই শুধু শিশু অপুর বেদনা নয়; অপুর সামগ্রিক সত্তার হাহাকার এই বেদনার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুশোকের অভিজ্ঞতা না হলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সর্বজয়ার ও অপর্ণার মৃত্যু অপুকে পূর্ণ মানবত্ব দান করেছে।

আরও একটি মৃত্যু অপুর মানস-পরিপুষ্টির সহায়তা করেছে—লীলার মৃত্যু। লীলাই ছিল সাবালক অপুর জীবনের একমাত্র নারী। জীবনে একমাত্র লীলাকেই সে ভালবেসেছিল। কিন্তু লীলার প্রতি নিজের প্রেমকে সে desire of the moth for the star ছাড়া অন্য কিছু বলে কোনদিনই ভাবতে পারে নি। লীলাও তাকে ভালোবাসত, কিন্তু সে প্রেম আদৌ সচেতন প্রেম ছিল না। অপুর প্রতি নিজের মনোভাবের স্বরূপ যখন সে বুঝতে পারল তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। নিজের ভেঙে-চুরমার-হয়ে-যাওয়া জীবনের টুকরোগুলো কুড়িয়ে আবার নতুন করে তাকে গড়ে তোলার সাধ্য আর তখন তার ছিল না। ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না। তাই লীলা বিষ খেয়ে মরল।—অপুর মনের ওপর লীলার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ প্রায় কিছুই লেখেন নি, কারণ তিনি বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনী লিখতে বসেন নি। তিনি শুধু আমাদের জানিয়ে দিতে চান যে তাঁর অপু কোন দিক দিয়েই অসম্পূর্ণ নয়। সে ভালোবেসেছে এবং ভালোবাসার ধনকে হারিয়েছে। অপর্ণা ছিল তার মাটি, লীলা ছিল আকাশ। দু'জনকেই হারিয়ে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আজ তার তপস্যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

এর একটু আগেই অপুর জীবনদেবতা তাঁর দুঃখসুখের দাবা-খেলায় একটা নতুন ঘুঁটি চেলে বসেছেন—কাহিনীর মধ্যে কাজলের আবির্ভাব হয়েছে।

একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভাল—কাজল অপুরই alter ego; অপুই কাজল। অপু অস্পষ্টভাবে হলেও তা বুঝতে পেরেছে; অপুর শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদির প্রথম কাজল-সন্দর্শনের কৌতুককর বিভ্রান্তিটুকুর মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ আমাদেরও তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

কাজলের ভিতর দিয়ে শিশু অপু আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু এ অপু এখনও অসম্পূর্ণ। এখনও তার সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরের নাড়ীর সংযোগ স্থাপিত হয় নি।

কাজলকে নিয়ে কলকাতার ভাড়াবাড়িতে গৃহস্থ জীবন যাপন করার চেষ্টার মত অসার্থক চেষ্টা অপু জীবনে আর কখনও করে নি। তখন সে সাহিত্যিক হিসাবে বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আর্থিক স্বচ্ছলতারও মুখ দেখেছে। কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'—মানসিক চাঞ্চল্য তার বেড়েই চলেছে। নানা দিক থেকে আসছে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান—বৃহত্তর সাধনা ও বৃহত্তর সিদ্ধির ইঙ্গিত। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের টানও প্রবল হয়ে উঠেছে—দুর্গা নেই, সর্বজয়া নেই, অপর্ণা নেই, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর এখনও আছে। তার দাবী এখনও অপু মেটাতে পারে নি—তার অদৃশ্য বন্ধন এখনও অপু ছিঁড়তে পারে নি।

দ্বিধা-বিভক্ত মানসিকতার এই অস্থিরতা ও অশান্ত চাঞ্চল্য থেকে সত্যই সে মুক্তি পেল সেইদিন—যেদিন সে নিশ্চিন্দিপুরে রাণুদির জিম্মায় কাজলকে রেখে আবার কলকাতার রওনা হল। এইবার তার বাইরের পথ নির্বাধ, উন্মুক্ত, এইবার সে নিশ্চিন্ত। ঘর ও বাহির দুই-ই তার বজায় রইল। কাজলরূপী শিশু অপু রইল নিশ্চিন্দিপুরকে নতুন করে উপভোগ করার জন্য—নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে নতুন করে সেই পুরাতন নাড়ীর যোগ স্থাপন করার জন্য; সাবালক অপু বেরিয়ে পড়ল তার মানস-দিগ্বিজয়ের রাজপথ ধরে বহির্বিশ্বের দিকে।—নিশ্চিন্দিপুরকে সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না, শিশু অপুর মনের একটা অংশকে সে চিরদিনই নিজের মনের মধ্যে বহন করবে। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত মনের সেই সংশয়াকুল বেদনা আর নেই, পুরাতন বাঁধন ছেঁড়ার আশঙ্কা আর নেই—প্রয়োজনও নেই, কারণ কাজল রইল যে। অপুই তো কাজল।

অমৃত-সন্ধানী গরুড় তার বলিষ্ঠ ডানা মেলে উড়ে চলল ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে।

আর এদিকে—

কাজল তখন তার ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটের পাশের জঙ্গলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এক ঝলক হাওয়া যেন পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।'

নিশ্চিন্দিপুরের দাবী মিটেছে, সর্বজয়া যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, অপর্ণা আজ পরিতৃপ্ত, দুর্গা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারছে—এখুনি বেরিয়ে এসে কাজলের হাত ধরে গ্রাম-পর্যটনে বেরিয়ে পড়বে।

অপু কর্মী পুরুষ নয়। সে জীবন-পলাতক যাযাবারও নয়। তার জীবনে ঘটনা কম, অনুভূতি ও চিন্তা বেশি—কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তার মূলে আছে অদম্য জীবন-

পিপাসা। সে introvert, কিন্তু morbid introvert নয়। তার জীবন-সাধনার মধ্যে কোন রুক্ষতা নেই, তিক্ততা নেই। তাই সে জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশটিকেও সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করতে পারে—জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা থেকে, সামান্যতম লাভক্ষতি থেকে, 'পথিকে পথিকে পথের আলাপন' থেকে মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ঋদ্ধি লাভ করতে পারে।

অপুর জীবনের ইতিহাস তার 'মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস।' এই আনন্দময় চেতনার মধ্যেই অপুর চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। এই আনন্দ সে কোনদিন হারায় নি। কিন্তু এই আনন্দের স্বরূপটি কি? এ আনন্দ সুখ নয়, সমৃদ্ধি নয়, সম্মান নয়, এমন কি মানসিক প্রশান্তিও নয়। নানা দুঃখ, নানা দুর্দৈব, কত গ্লানি, কত শোক, কত অশান্তি অপুর জীবনে এসেছে, কিন্তু কিছুই তার মনের এই আনন্দধারাকে ব্যাহত করতে পারে নি। বস্তুতঃ একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, সুখদুঃখ হাসি-কান্না বিরহ-মিলন শান্তি-অশান্তি সব কিছু মিলিয়ে যে জীবন-রসের সৃষ্টি হয় সেই জীবনরসই এই আনন্দের একমাত্র উৎস। দুঃখহীন জীবন অসম্পূর্ণ জীবন—সম্পূর্ণতাই আনন্দ। অপু পূর্ণতার সাধক, তাই আনন্দই তার জীবনের মৌল প্রেরণা।

যে আনন্দ থেকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভূতজগৎ সৃষ্ট হয়েছে সেই কেন্দ্রীয় আনন্দবহ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ কেমন করে ছিটকে এসে নিশ্চিন্দিপুরের শ্যামল ক্রোড়ে সুখসুপ্ত একটি শিশুর অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। সেই বহ্নিস্ফুলিঙ্গের জ্যোতির্ময় দীপ্তিই তার সমস্ত চেতনাকে সারাজীবন উদ্ভাসিত করে রেখেছে—তাকে সত্যকার জীবনরসরসিক করে তুলেছে। তাই অপু অসাধারণ —তাই সে অপরাজিত।

এই নিবন্ধটিকে 'অপরাজিত' উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা মনে করলে ভুল করা হবে। সমালোচনায় যে সব কথা থাকা বিশেষ প্রয়োজন তার অনেক কিছুই এতে নেই। বস্তুতঃ বিভূতিভূষণের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য, তাঁর প্রকৃতি-প্রীতির বৈশিষ্ট্য, তাঁর রচনাশৈলীর অনন্যতা প্রভৃতি নানাবিধ শৈল্পিক বিচারের চেষ্টাও এতে করা হয় নি—এজাতীয় বিচার-বিশ্লেষণের ভার যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হলেই ভাল হয়। তা ছাড়া 'অপরাজিত' উপন্যাসে নানা দোষত্রুটি নিশ্চয় আছে—কোন্ শিল্পসৃষ্টিতেই বা না থাকে?—Even Homer nods. সেগুলির কোন ফর্দ দেবার চেষ্টাও আমি করি নি।

অপুর চরিত্রটিকে আমি নিজে যতখানি বুঝেছি এবং যে ভাবে বুঝেছি, এই আলোচনায় চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলভাবে শুধু সেইটুকু বুঝিয়ে বলতে, কারণ আমার বিশ্বাস 'অপরাজিত' উপন্যাসের মূল তাৎপর্যটি অপুর চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। অপুর পূর্ণ পরিচয় জানতে না পারলে এ গ্রন্থের রসগ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিভূতিভূষণের দিনলিপির যে পাঁচটি অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে 'তৃণাঙ্কুর' তাদের অন্যতম—কালক্রম অনুসারে দ্বিতীয়াংশ। এই অংশের রচনাকাল ১৯২৯-এর জুন মাস থেকে ১৯৩৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত। এ সময় তিনি কলকাতায় খেলাতচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশানে শিক্ষকতা করতেন এবং মেসে বাস করতেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের ইতিহাসে এই দশটি বৎসরকে স্মরণীয়তম যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এই সময়েই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়, 'অপরাজিত' রচিত ও প্রকাশিত হয়, 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি,' 'বঙ্গশ্রী', 'উদয়ন' প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে; এবং এই সময়েই তিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের স্বীকৃতি, প্রশংসা ও সাহচর্য অর্জন করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কও স্থাপিত হয়।

তাই বলে কোন পাঠক যদি মনে করেন 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থে তিনি বিভূতিভূষণের এই দশ-বৎসর-ব্যাপী জীবনের ঘটনাবলীর একটা আনুপূর্বিক বিবরণ দেখতে পাবেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। বিভূতিভূষণ জীবন-রসিক ছিলেন। কিন্তু মাত্র ঘটনাগত জীবনের প্রতি তাঁর একটা প্রবল ঔদাসীন্য ছিল। যে ঘটনা চিন্তা ও অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে না—মানুষের মনকে ঔদার্য, ব্যাপ্তি, প্রশান্তি অথবা সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের দিকে প্রণোদিত করে না—সে ঘটনাকে তিনি একান্ত তাৎপর্যহীন বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর নায়ক-নায়িকাদের কাহিনী ঘটনা-বিবর্তনের কাহিনী নয়, চিন্তা ও অনুভূতি-বিবর্তনের কাহিনী।

গল্পোপন্যাসের ক্ষেত্রে কথাটা যতখানি সত্য দিনলিপির ক্ষেত্রেও ঠিক ততখানি, কারণ বিভূতিভূষণের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রায় কিছুই ছিল না। তাই 'তৃণাঙ্কুর' পড়লে আমরা তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় যতখানি পাই তার তুলনায় বহির্জীবনের পরিচয় প্রায় কিছুই পাই না বলা চলে।

'তৃণাঙ্কুর'-এ বিভূতিভূষণের মানসজীবনের বৈশিষ্ট্যটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। 'কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহল-মুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই।'—'তৃণাঙ্কুর' বিভূতিভূষণের মনের কথা।

এমন ভাবে অকপটে মনের কথা এখানে তিনি খুলে বলেছেন বা বলার চেষ্টা করেছেন যে অনেক সময় তার ফলে ভাষা ও রচনাশৈলীর যথেষ্ট ত্রুটি রয়ে গেছে—অকারণ বাগ্‌বিস্তার, পুনরাবৃত্তি দোষ, আকস্মিক রসাভাস, অপরিচিত ব্যক্তির বা অজ্ঞাত ঘটনার উল্লেখ প্রভৃতি নানা কারণে শিল্পরসান্বেষী পাঠককে বার বার হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু দিনলিপি-পাঠকের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে তিনি যা পড়তে বসেছেন তা বক্তব্য-প্রধান রচনা, রীতি-প্রধান

বা শৈলী-প্রধান নয় ;—'তৃণাঙ্কুর'-এর উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি নয়, মানস-উদ্‌ঘাটন ; এবং সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে বিভূতিভূষণের অনুভূতিক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, অপরটি মানব-কেন্দ্রিক। তাঁর এই প্রকৃতিপ্রীতি ও মানবপ্রীতি অনুভূতি হিসাবে স্বতন্ত্র হলেও এর কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; একটা অমোঘ প্রয়োজনের বন্ধনে এরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ, ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। মানব-বিমুখী প্রকৃতিপ্রীতি এবং প্রকৃতি-বিমুখী মানবপ্রীতি দুইই বিভূতিভূষণের কাছে সম পরিমাণে অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত।—এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের অনুভূতিক্ষেত্র থেকে আরও উর্ধ্বে উঠতে হবে। সেখানে আছে একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ক্ষেত্র, এবং এই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধ্যাত্মবোধের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। বিভূতি-ভূষণের আস্তিক্যবুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃসংশয়—যুক্তিতর্কের অবকাশ সেখানে আদৌ নেই। ঈশ্বর আছেন, এবং সমগ্র গ্রহজগৎ যেমনভাবে সূর্যের কাছ থেকে তাদের আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনিভাবে মানবজগৎ ও প্রকৃতিজগৎ দুইই তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত রস সংগ্রহ করে ঐশ্বরিক প্রেরণার উৎস থেকে। তাই এই দুই জগৎকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নরূপে অনুভব করা অসম্ভব।

ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি এই ত্রিতত্ত্বসমন্বিত চেতনাকেই বিভূতিভূষণ সত্যকার জীবন-চেতনা বলে মনে করতেন। সমগ্র জীবনধারার মধ্যে তিনি একটা সুষম সঙ্গতি ও ছন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মৃত্তিকাচারী ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে মহাব্যোমের নক্ষত্র-নীহারিকা পর্যন্ত, পল্লীজীবনের তুচ্ছ হাসিকান্নার কাহিনী থেকে বিশ্বেতিহাসের বিরাট পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী পর্যন্ত, হাস্যকর গ্রাম্য কুসংস্কার থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির তুরীয় অনুভূতি পর্যন্ত সব কিছুকেই অতি সহজে এই জীবনবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন।

বিভূতিভূষণের জীবনদৃষ্টি দার্শনিক দৃষ্টি নয়, কবিদৃষ্টি—শিল্পদৃষ্টি। 'তৃণাঙ্কুর'-এর একাধিক স্থানে তিনি ঈশ্বরকেও সুমহান শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বর জীবনশিল্পী—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ তুচ্ছ-মহৎ বিরোধী-অবিরোধী উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় সাধন করে তিনি গড়ে তুলেছেন এই বিরাট জীবনকে। এর সামান্যতম উপাদানটিরও যদি অণুমাত্র স্থানচ্যুতি ঘটে তাহলেই শিল্পসৃষ্টির ছন্দ-ভঙ্গ হবে। কাজেই জীবন-সাধককে জীবনানুবর্তী হতে হবে, সব কিছুকেই সমান প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখতে হবে—হাসির সঙ্গে অশ্রুকে, আলোর সঙ্গে অন্ধকারকে, পুণ্যের সঙ্গে পাপকে অবিচল চিত্তে স্বীকার করে নিতে হবে।

জীবন সাধনার ফলশ্রুতি আনন্দ। এই আনন্দের সাময়িক অনুভূতি বিভূতিভূষণের জীবনে বহুবার এসেছে—'তৃণাঙ্কুর'-এর একাধিক স্থানে এই অপার্থিব আনন্দ-মুহূর্তের বর্ণনা আছে। কোথাও কোথাও তিনি চেষ্টা করেছেন এই আনন্দের স্বরূপটি বোঝবার বা বোঝাবার, কিন্তু পারেন নি। কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। Becoming বর্ণনা করা চলে, কিন্তু Being এখনও ভাষার অতীত বস্তু।

একটা বিশেষ দিক থেকে বিচার করলে 'তৃণাঙ্কুর'কে 'পথের পাঁচালী'-র ও 'অপরাজিত'-র ভাষ্যগ্রন্থ বলা চলে। 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পরে বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছেন যে যাঁরা উপন্যাসখানিকে আত্মজীবনী-মূলক বলে বিবেচনা করেন তাঁরা ভুল করেন: একমাত্র সর্বজয়ার চরিত্রে তাঁর মাতার চরিত্রের আংশিক প্রতিফলন ব্যতীত এ গ্রন্থের বাকি সবই কল্পনা। কিন্তু 'অপরাজিত' প্রকাশিত হবার পর তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাই যে অপু 'ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো'।—বস্তুতঃ অপুর চরিত্রের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই লেখকের আত্ম-প্রক্ষেপের ফল, এবং দুখানি উপন্যাসই অপুর 'ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস' ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

'তৃণাঙ্কুর'-এ বিভূতিভূষণ এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁর মনের একটা অংশ চিরদিনই শিশু রয়ে গেছে। আবার অন্যত্র বলেছেন, '১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিংবা পনেরো বৎসর আগেকার সেই বালক নেই অনবিস্তর?'—কথাটা কি অপুর সম্বন্ধেও সত্য নয়? এবং অপুর মনের এই চিরন্তন শিশুসত্তাটির স্বরূপ না বুঝতে পারলে কি তার চরিত্রের এবং জীবন-পাঁচালীর পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা সম্ভব?

অপুর সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরের যে সম্পর্ক তার মধ্যে একটা বিশিষ্ট mystic রস নিহিত আছে। যে-কোন বালকের সঙ্গে যে-কোন গ্রামের সম্পর্ক সেটা নয়। একটা বিশেষ গ্রামের সঙ্গে একটা বিশেষ মনের যে নাড়ীর যোগের রহস্য তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, নিজের গ্রামের প্রতি বিভূতিভূষণের আকর্ষণের মধ্যেও আমরা তার পরিচয় পাই।—'মনে মনে তুলনা করে দেখলুম, এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখি নি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই··· এমন চাপা আলোটা হয় না··· এ জিনিস আর কোথাও দেখি নি তো। দেখবোও না···' —এ কথাগুলো কি objective সত্য? বিশেষ করে শেষের categorical assertion-টি? —অপুর মনের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনের অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য এই উক্তিটুকুর মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে অপুর মনের কেন্দ্রগত সমস্যাটিও বিভূতিভূষণের মধ্যে বিদ্যমান। অপুর সারাজীবন দুটি বিপরীতমুখী আকর্ষণের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত—একদিকে নিশ্চিন্দিপুরের আপাত-সংকীর্ণ শান্তি, বিশ্রান্তি ও মাধুর্যের আকর্ষণ, অপরদিকে বহির্বিশ্বের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের আকর্ষণ। বিভূতিভূষণের মধ্যেও আমরা এই দোলাচলবৃত্তির পরিচয় পাই। কখনও বা নাগপুরের শৈলমালা-বেষ্টিত মালভূমির উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না।'—আবার একটু পরেই বলতে শুনি, 'বাংলার সে কমনীয় আপন-ভোলানো রূপ এদের কই? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ।'—শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের সেই একটি মাত্র

গ্রাম, ইছামতী নদীর কূলে অবস্থিত সেই গ্রামখানি—সেই বারাকপুর!—'এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন?'

কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরের কোলে সমর্পণ করে বিভূতিভূষণ অপুর সমস্যার একটা শিল্পসঙ্গত সমাধান করতে পেরেছিলেন। নিজের সমস্যার সমাধান তিনি আংশিকভাবে করতে পেরেছিলেন কবিদৃষ্টির সাহায্যে—universal acceptance-নীতির সাহায্যে। তবু মনে হয়, কলকাতার সমস্ত কোলাহলপূর্ণ উত্তেজনাকে ছাপিয়ে, মধ্যপ্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমস্ত ব্যাপ্তি ও বিরাটত্বকে ছাপিয়ে তাঁর মনের মধ্যে বারাকপুরের নিভৃত-কোমল মাধুর্যই জয়ী হয়ে আছে। 'তৃণাঙ্কুর'-এর সর্বত্রই তাই গ্রাম-জননীর সেই মমতাময় হস্তাবলেপের স্পর্শ অনুভূত হয়—এবং সেই জন্যই গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগে না।

'তৃণাঙ্কুর' দিনপঞ্জী-গ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রণকালে যে কারণেই হোক স্থানকালের সমস্ত উল্লেখ অপসারিত করে দেওয়া হয়েছে। এর ফল সর্বত্র ভাল হয় নি। আকস্মিক ভাবে পাঠকের মন স্থান থেকে স্থানান্তরে, দিন থেকে দিনান্তরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অধ্যয়নের continuity ব্যাহত হয় এবং আরও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দিনপঞ্জীকে অকারণ অন্তবিধ সাহিত্যের ছদ্মবেশ না পরালেই ভাল হত। কিন্তু এখন এতদিন পরে এ নালিশ নিরর্থক।

(৩)

'মৌরীফুল'-এর অধিকাংশ গল্পই বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে রচিত। তখনও তিনি সুনির্দিষ্ট কোন শিল্পপন্থা খুঁজে পান নি, নানাবিধ টেক্‌নিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সাহিত্যজীবনের পরিণততম স্তরে পৌছবার পর বিভূতিভূষণ কাহিনী-ভিত্তিক ছোটগল্প লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে তিনি যে জাতীয় গল্প-রচনায় অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও গভীরানুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে—জীবনধারা-ভিত্তিক, চরিত্র-ভিত্তিক ও অপোচ্ছ্বাস-ভিত্তিক।—এই শেষোক্ত শিল্প-পদ্ধতিটিকে প্রায় বিভূতিভূষণের নিজস্ব টেক্‌নিক বলে অভিহিত করা চলে। সামান্য ছুটি মুহূর্ত, তুচ্ছ একটা ঘটনা, হঠাৎ-শোনা এক টুকরো সংলাপ, জীবন-তরঙ্গিনীর ক্ষুদ্র একটি লহরী বা অতি অস্পষ্ট একটু মর্মর-ধ্বনি—হঠাৎ তার ওপর লেখকের দৃষ্টিপ্রদীপের শাণোজ্জ্বল আলোক-রশ্মি এসে পড়ল, তারপর কি হতে যেন কি হয়ে গেল, পাঠক ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই সমস্ত দৃশ্যটা যেন এক অপার্থিব দীপ্তিতে ঝলমল্ করে উঠল; যা ছিল সামান্য ও সাধারণ, তা হঠাৎ অসামান্য ও অসাধারণ হয়ে উঠল; যা ছিল ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, তা হঠাৎ তাৎপর্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় পাঠককে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। 'Sting in the

tail' নামধের শিল্প-কৌশলের সঙ্গে এ পদ্ধতির কোন সাদৃশ্য নেই, কারণ সেটা সত্যই একটা কৌশল ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ঘটনা-নির্ভর কাহিনীর উপসংহারে একটা অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমদানি করে—তারই সংঘাতে গল্পের রসরূপের আমূল পরিবর্তন সাধন ও পাঠকের মনে বিস্ময় বা পুলকের একটা আকস্মিক চমক সৃষ্টিই এ জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে এ জাতীয় গল্প যে কি অত্যাশ্চর্য শিল্পমহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে Ambrose Bierce-এর An Incident at Owl Creek Bridge গল্পটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তা জানেন। সাধারণতঃ কিন্তু এই টেক্‌নিক প্রয়োগের ফল বিশেষ শুভ হয় না—উপসংহারের যান্ত্রিক সম্পূর্ণতা বোদ্ধা পাঠককে উল্লসিত না করে বরং ঈষৎ উৎপীড়িতই করে তোলে। এর প্রমাণ O Henry'র অধিকাংশ গল্পেই পাওয়া যাবে।

বিভূতিভূষণের গল্পের উল্লাস-মুহূর্তগুলি কিন্তু ঘটনা-সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হয় না, সৃষ্ট হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থেকে, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি থেকে। এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়ে থাকে একটা সূক্ষ্ম, অতি অন্তরঙ্গ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। যাঁরা 'তুচ্ছ', 'নদীর ধারের বাড়ী', 'গল্প নয়', 'আহ্বান', 'কিন্নরদল', প্রভৃতি গল্প পড়েছেন তাঁরা আমার বক্তব্য সহজেই বুঝতে পারবেন। এগুলির উদ্দেশ্য রোমাঞ্চ সৃষ্টি নয়, পাঠককে চমক লাগিয়ে দেওয়াও নয়—পাঠকের দৃষ্টিকে অতি সহজে জীবনের বহিরঙ্গ থেকে জীবনের অন্তর্লোকে পৌঁছে দেওয়া। এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ রসোত্তীর্ণ গল্প বিভূতিভূষণ সংখ্যায় খুব বেশি লেখেন নি—কারও পক্ষেই তা লেখা সম্ভব নয়, কিন্তু যে কটি লিখেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন গল্প বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ আর কেউ কখনও লিখেছেন বলে মনে পড়ে না। (রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' অনেকটা এই জাতীয় রচনা, যদিও আমার মনে হয় তার কাব্যমহিমা তার গল্পমহিমাকে অনেকটা খর্ব করে দিয়েছে।)

আলোচ্য গ্রন্থের 'জলসত্র' গল্পটিতে এই ক্ষণোল্লাস টেক্‌নিকের সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। পরিবেশ-বর্ণনা ও সংলাপ এখানে একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ। অনেকের ধারণা যে বিভূতিভূষণের শিল্পদৃষ্টি অতি-রোম্যান্টিক, বাস্তবতা-বিরোধী ও জীবন-পলাতক। কি করে যে এ ধারণার সৃষ্টি হল তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে—কারণ কথাটা আদৌ সত্য নয়। বিভূতিভূষণ নিজে তথাকথিত বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের খণ্ড-জীবনের কারবারী বলে মনে করতেন। তার মতে বস্তুজীবন ও অবস্তুজীবন দুই-এ মিলিয়ে জীবনের সমগ্রতা। তিনি এই সমগ্রজীবনের উপাসক—জীবন-পলাতক নন, সত্যকার জীবন-রসিক। তাঁর গল্পোপন্যাসের ফলশ্রুতি-বর্ণনে তিনি ভাববাদী, কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গ-বর্ণনায় ও সংলাপ-রচনায় তাঁর মত গুরিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ সাহিত্যিক আধুনিকতর যুগেও বিরল। বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে romanticism ও realism-এর একটা বিচিত্র সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। 'জলসত্র' গল্পেও এই সুনিপুণ সমন্বয় গল্পরসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। মিতবাক্ ও বলিষ্ঠ বর্ণনা এবং অতি স্বাভাবিক সংলাপ যখন সমগ্র পরিবেশ-চিত্রটিকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্তবৎ ফুটিয়ে তুলেছে সেই সময়ে হঠাৎ গল্পের উপাখ্যা-অনুচ্ছেদে উল্লাস মুহূর্তটি এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সমগ্র রসরূপটি

বদলে গেল—কোন্ অদৃশ্য স্পর্শমণির ছোঁয়ায় কাচ কাঞ্চনে পরিণত হয়ে গেল। চেনা বস্তুজগৎ ছেড়ে আমরা ক্ষণেকের জন্য সুক্ষ্মানুভূতির অমর্ত্যলোকে পৌঁছে গেলাম। তারপর আবার চে... জগৎ ফিরে এল—গল্পবৃত্ত সম্পূর্ণ হল। 'জলসত্র' একটি নিখুঁত নিটোল রসোত্তীর্ণ গল্প—এবং আমার মতে আলো...্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প।

'রাক্ষস-গণ' গল্পের উপসংহারেও লেখক এই টেক্‌নিক প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে নি—কারণ গল্পটি মূলতঃ কাহিনী-ভিত্তিক এবং ঈষৎ sentimentalism-দোষদুষ্টও বটে।

চরিত্র-ভিত্তিক গল্পই বোধ হয় বিভূতিভূষণ সবচেয়ে বেশী লিখেছেন। কিন্তু তাঁর গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলির কোনটিই প্রচলিত অর্থে নায়কোচিত গুণবিশিষ্ট নয়। কেউ কেউ বা একটু ছিট্‌গ্রস্ত বা খ্যাপাটে ধরনের মানুষ; কারও কারও মধ্যে হয়তো একটা অস্পষ্ট আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশই অতি সাধারণ মানুষ—চাষী, ক্ষেতমজুর, দোকানদার, ভিক্ষুক, পাড়াগেঁয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা বৃত্তিহীন ভবঘুরে; পল্লীবাসীসুলভ সরলতা ও সহজ মানবতা ছাড়া এদের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। বিভূতিভূষণের বহু শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মধ্যে এরা যে মর্যাদার আসন পেয়েছে—একমাত্র Wordsworth-এর কাব্যে ব্যতীত আর কোথাও তার তুলনা মেলে না। রূপো বাঙাল, সিঁদুরচরণ, কবি কুণ্ডু মহাশয়, থনটন কাকা, ভণ্ডুল মামা বা 'মুক্তি' গল্পের নিস্তারিণীর মত চরিত্রকে উপজীব্য করে এবং আকস্মিক চমক সৃষ্টির কোন চেষ্টা না করে আমাদের দেশের কজন লেখক গল্প লিখতে সাহস করেছেন? বিদেশী সাহিত্যেই বা কটি এ জাতীয় গল্প রচিত হয়েছে জানতে ইচ্ছা করে।

'মৌরীফুল' এ গ্রন্থের একমাত্র চরিত্র-ভিত্তিক গল্প। গল্পের নায়িকা সুশীলা অতি সাধারণ গ্রাম্য বধূ। শিক্ষিতা নয়, বিশেষ বুদ্ধিমতীও নয়—শ্বশুর-শাশুড়ী তার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেন তার প্রতিবাদে নিজে অন্যায় কাজ করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। সে মুখরা—গালির পরিবর্তে গালি দেওয়াই তার স্বভাব। অর্থাৎ নামে সুশীলা হলেও আচরণে সে আদৌ সুশীলা নয়। কিন্তু সে নেহাৎ ছেলেমানুষ, স্বভাবতঃই স্নেহের কাঙাল। বাপের বাড়ীতে স্নেহ সে পেয়েছে কিন্তু এখানে শুধু 'শাসন করে সবে, করে না স্নেহ'। তার এই অপরিতৃপ্ত স্নেহবুভুক্ষু মনের বিদ্রোহই তাকে দুঃশীলা করে তুলেছে। কলকাতা থেকে দুদিনের জন্য আসা একটি সমবয়সী বধূর সাহচর্য ও প্রীতিস্পর্শ তাই তার মনকে এত গভীর-ভাবে নাড়া দিয়েছিল। কলকাতার বৌ কলকাতায় ফিরে গেল, রেখে গেল শুধু প্রীতি-স্নিগ্ধ মৌরীফুলের সুরভি। স্নেহের ক্ষুধা তার মিটল না।—আহা! তার স্বামীও যদি তাকে একটু ভালোবাসত! তাহলে বোধ হয় সে অন্য সব দুঃখই অনায়াসে সহ্য করতে পারত। তাই সে 'তুক্' করে স্বামীর মন পাবার চেষ্টা করল—এবং তারই ফলে এল শোচনীয় মৃত্যু।

গল্পটি করুণ রসাত্মক, কিন্তু কোথাও ছিঁচকাঁদুনে মনোভাবের বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। কঠোর শিল্পসংযমের বাঁধন গল্পরসের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটতে দেয়নি। বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের রচনা, তাই একেবারে কাহিনী-বর্জিত নয়—কিন্তু গল্পের রসোত্তরণ ঘটেছে কাহিনীর মাধ্যমে

নয়, চরিত্রের মাধ্যমে। গল্পটির আঙ্গিক বাস্তবধর্মী, কিন্তু পরিণতির রস আন্তরিক সহানুভূতি ও মমতার স্পর্শে পুরোপুরি মধুর।—'মৌরীফুল' বিভূতিভূষণের একটি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ছোটগল্প।

'গ্রহের ফের' গল্পটি ঠিক চরিত্র-ভিত্তিক নয়; রচনা-শৈলীতেও কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। কাহিনী ও চরিত্র পরস্পরের সঙ্গে একটু অপরিচ্ছন্ন ভাবে জড়িয়ে গেছে। অন্য গল্পকারদের তুলনায় নয়, বিভূতিভূষণের নিজের অন্যান্য গল্পের তুলনায় এ গল্পটিকে অসার্থকই বলা চলে। শহরে গ্রন্থকীট পণ্ডিত অধ্যাপকের চরিত্রটিও খুব সুপরিস্ফুট হয় নি।

জীবনধারা-ভিত্তিক গল্প 'মৌরীফুল'-এ একটিও নেই, কারণ গল্প-রচনার এই পদ্ধতিটি বিভূতিভূষণ অনেক পরে আবিষ্কার করেন। এই গল্পগুলিতে কাহিনীর স্পর্শমাত্র নেই, অথচ এগুলি চিত্রজাতীয় রচনাও নয়, ডায়েরি বা ভ্রমণকাহিনীর ছেঁড়া পাতাও নয়। এদের একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে—আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে; রসপরিণতিও সুপরিকল্পিত। 'কাশচিতি', 'মাকাল-লতার কাহিনী' 'দিবাবসান' বা 'হাট'-এর মত গল্প বিদেশী সাহিত্যে দুই একটি থাকলেও বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ।

কাহিনী-ভিত্তিক গল্প সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতেই যা বলেছি তা থেকে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে বিভূতিভূষণ এ জাতীয় গল্প কম লিখেছেন অথবা এ জাতীয় গল্পে কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি পরবর্তীকালে স্বেচ্ছায় এ পন্থা ছেড়ে দিয়েছিলেন—এইমাত্র। ঘটনা-সংস্থানে, পরিবেশ-রচনায়, সংলাপ-সন্নিবেশে ও গল্পের বিষয়বস্তু ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথাযোগ্য ভাষা ব্যবহারে তাঁর একটা সহজ নৈপুণ্য ছিল—এবং সেই নৈপুণ্যের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা তাঁর কাছ থেকে বহু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের কাহিনী-ভিত্তিক ছোটগল্প পেয়েছি। মধুর রসের গল্প 'বাক্স-বদল', ভয়ঙ্কর রসের গল্প 'অভিশপ্ত', বিদ্রূপাত্মক গল্প 'আইনষ্টাইন ও ইন্দুবালা' করুণ রসের গল্প 'পুঁইমাচা', irony-কেন্দ্রিক 'দুই দিন', রোমান্স-কেন্দ্রিক 'স্বপ্ন-বাসুদেব'—ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই, কিন্তু এদের প্রত্যেকটি গল্পই কাহিনী-ভিত্তিক এবং প্রত্যেকটিই প্রথম শ্রেণীর রচনা।

'মৌরীফুল'-এ কাহিনী-ভিত্তিক গল্প আছে চারটি।—'রোমান্স', 'দাতার স্বর্গ', 'গ্রহের ফের' ও 'মরীচিকা'। 'গ্রহের ফের' পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'রোমান্স'-এর মধ্যে কোন অসাধারণত্ব নেই, তবে করুণ ও মধুর রসের সংমিশ্রণের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। 'দাতার স্বর্গ' moral fable জাতীয় রচনা—নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টা একটু বেশী পরিমাণে সুস্পষ্ট। 'মরীচিকা' গল্পটি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। প্রারম্ভের গ্রাম্য উৎসবের চিত্রটি শুধু যে লেখকের জীবন-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তা নয়, তার ভিতর দিয়ে তিনি যে ভাবে একটা আনন্দময় আশার দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই অননুকরণীয়। উপসংহারের ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদটির মধ্যে সেই আশার আলো নিভে যাওয়ার চাপা বেদনাটুকু এমন সংযমের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে যে অসতর্ক পাঠকের হয়তো তা দৃষ্টি এড়িয়েও যেতে পারে। সার্থকনামা গল্প—অসাধারণ সংবেদনশীল মনের সৃষ্টি। তবে একেবারে নিখুঁত নয়। সুরেনের আকস্মিক মৃত্যু শিল্পসঙ্গতির দিক দিয়ে অনেকটা non-sequitur জাতীয়—গল্পের মূল রসের সঙ্গে তার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই।

বিভূতিভূষণের মধ্যে একটা রোম্যান্টিক কবি-মন ছিল। তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর ভাষা-প্রয়োগের সুমধুর সাবলীলতায় এবং তাঁর অতীতচারিতা-প্রবণতায়। 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পটি এই প্রবণতার ফসল, কিন্তু খুব সুপরিণত ফসল নয়। সুলিখিত, সুখপাঠ্য, কিন্তু সুগঠিত নয়। পরিণততর রচনা 'স্বপ্ন-বাসুদেব'-এর সঙ্গে তুলনা করলেই গল্পটির দুর্বলতা ধরা পড়বে। অতীতচারিতার সঙ্গে অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটানোর যে মৃদু চেষ্টা করা হয়েছে গল্পটিতে তাও খুব সার্থক হয় নি। এই সংমিশ্রণ-প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য আমরা দেখতে পাই 'মেঘ-মল্লার'-এর মত গল্পে।

'হাসি' অলৌকিক রসের গল্প। বিভূতিবাবু নিজে অতিলৌকিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন—ভূত-প্রেত সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও অবিশ্বাসী ছিলেন না। আধুনিক সমালোচকদের মতে অবিশ্বাসী না হলে ভাল ভূতের গল্প নাকি লেখা যায় না। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' প্রভৃতি অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভৌতিক কাহিনী রচনা করে বিভূতিভূষণ এই মতের যাথার্থ্য অপ্রমাণ করে দিয়েছেন। ক্ষীণ কথাবস্তু ও পরিবেশ-বিস্তারের অভাব—এই দুই কারণে 'হাসি' শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

'খুঁটি-দেবতা' গল্পটি বাংলা কথাসাহিত্যের একটি অপূর্ব সম্পদ। শুধু অলৌকিক রসের কাহিনী বলে বর্ণনা করলে গল্পটির প্রতি অবিচার করা হবে। এর শিল্পরস আরও ব্যাপক, আরও গভীর। পল্লী-অঞ্চলের লোক-বিশ্বাসের ভিত্তির উপর এত সহজে এমন অপরূপ শিল্পসৌধ নির্মাণ একমাত্র বিভূতিভূষণের দ্বারাই সম্ভব। একদিকে যেমন জনশ্রুতির সারল্যটুকু পুরোপুরি বজায় আছে, অপরদিকে তেমনি লেখকের আধুনিক মন ঘটনাগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সন্ধান করেছে এবং যা ব্যাখ্যার অতীত তাকে দ্বিধা-সঙ্কুচিত চিত্তে মেনে নিয়েছে। ফলে যে অপূর্ব মিশ্ররসের উদ্ভব হয়েছে তা বিশ্লেষণের বস্তু নয়, উপভোগের বস্তু।

ভবিষ্যতের সর্বাঙ্গীণ শিল্পসাফল্যের দিগ্দর্শনী হিসাবে 'মৌরীফুল' গ্রন্থের তাৎপর্য অপরিসীম।

(৪)

'অভিযাত্রিক' ভ্রমণবৃত্তান্ত—একটি মাত্র দীর্ঘ পর্যটনের বিস্তারিত বর্ণনা নয়, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনীর মালিকা। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, কিন্তু তার ফলে কোন রস-বৈষম্যদোষের সৃষ্টি হয় নি; পর্যটক বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোধর্ম খণ্ড-কাহিনীগুলিকে একটা স্থানকালনিরপেক্ষ ঐক্যসূত্রে গেঁথে রেখেছে।—এর ব্যতিক্রম যে কোথাও ঘটে নি তা নয়, কিন্তু সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

কাহিনীগুলিকে মোটামুটিভাবে চার পর্বে ভাগ করা যেতে পারে।—তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপাত-তুচ্ছ ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে রচিত হয়েছে প্রারম্ভের উপক্রমণিকাপর্ব। কলকাতা থেকে

বেরিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে হেঁটে নিমৃতে গ্রামে যাওয়া, হাওড়া ময়দানের ছোট রেলগাড়িতে চেপে জাঙ্গিপাড়া যাওয়া, অথবা নিজের গ্রাম থেকে মেঠো পথ ধরে পিসিমার বাড়ি বাগানগাঁ-এ যাওয়া—এ সব সত্যই অতি সামান্ত ঘটনা। কিন্তু বিভূতিভূষণ নিজে এগুলিকে সামান্ত বলে ভাবতেন না। তাঁর মতে 'অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে জীবন সম্বন্ধে—পাড়াগাঁয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো উচিত কিছুদিন, আমার এই রকম ধারণা। দশদিন কাশ্মীরে ঘূর্ণীঝড়ের মতো ঘুরে আসার চেয়ে তা কম শিক্ষাপ্রদ নয়, আনন্দও তা থেকে কম পাওয়া যায় না।'—নিমৃতে ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিও তাৎপর্যপূর্ণ: 'কাজেই আমার সেদিনকার ভ্রমণটা···তুচ্ছ তো নয়ই—বরং আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সেদিনটির আনন্দ।'

বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস, বিভূতিভূষণ ইচ্ছা করেই গ্রন্থারম্ভে এই তিনটি বস্তুভারহীন পদ-পর্যটনের কাহিনী সন্নিবিষ্ট করেছেন। সমগ্র গ্রন্থের স্থায়ী সুরটি তিনি অতি সংক্ষেপে এখানেই বেঁধে দিয়েছেন—যে বিশিষ্ট ধরনের ভ্রমণ-রস তিনি সৃষ্টি করতে চান তার আভাসও আমাদের দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্বটি গ্রন্থের মধ্যে দীর্ঘতম। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের অধীনে সামান্ত বেতনে চাকুরি গ্রহণ করে কর্মোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান—কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, চাটগাঁ, চন্দ্রনাথ পাহাড়, কক্স্‌বাজার, আগরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি, ঢাকা, এমন কি বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে আরাকানের মংডু শহর ও ইয়োমা পর্বতমালার আরণ্য অঞ্চল পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসেন। এই পর্বের পর্যটন-পরিধি নেহাৎ অবিস্তীর্ণ নয়—প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট।

তৃতীয় পর্বটি ভাগলপুর-কেন্দ্রিক। তিনটি ভ্রমণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই পর্বে—কাজরা উপত্যকায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ভ্রমণ, গৈবীনাথ ভ্রমণ এবং পদব্রজে ভাগলপুর থেকে বৈদ্যনাথ-ধাম যাত্রা।

উপসংহার পর্বে দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী আছে—মধ্যপ্রদেশের অরণ্য-পর্বতের মধ্যে অবস্থিত দারকেশা ভ্রমণ ও সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে অমর-কণ্টক রোড স্টেশন পর্যন্ত পদব্রজে যাত্রা এবং কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে উড়িষ্যার বিক্রমখোল নামক গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান।

এই শেষ দুটি কাহিনীর সঙ্গে গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের কালগত ব্যবধান অনেকখানি। তথাপি মধ্যপ্রদেশ-ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে পূর্ববর্তী কাহিনীগুলির রস-সঙ্গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ বিভূতিভূষণ একা এবং তাঁর মন। কাজেই তাঁর নিজস্ব মানসিকতাই এখানে সক্রিয়—কোন অবান্তর বিঘ্ন তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে নি।

কিন্তু বিক্রমখোল অভিযান সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। শহরে শিক্ষিত sophisticated বন্ধুদের সাহচর্য, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা; গ্রামবাসীদের সশঙ্ক আতিথ্যের আড়ম্বর—সব কিছু

মিলিয়ে এমন একটা কৃত্রিম ও ছদ্ম-মজলিসি আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, যার সঙ্গে গ্রন্থের অন্যান্য অংশের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ জাতীয় রসাভাস-দোষদুষ্ট একটা কাহিনী দিয়ে গ্রন্থ শেষ করার ফলে 'অভিযাত্রিক'-এর সামগ্রিক মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।—আলোচনার অবশিষ্টাংশের মন্তব্যাদি এই কাহিনীটি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় বলে ধরে নিতে হবে।

মানুষ নানা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করতে বেরিয়ে থাকে। কেউ কেউ অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত ভূভাগ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়েন, কেউ কেউ বা ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েন। কেউ বা শুধু দেখতে চান, কেউ আবার কিছু শিখতেও চান। ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশভ্রমণ করেন কেউ কেউ, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের টানেও অনেকে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—সব কিছুই দেশভ্রমণের প্রেরণা যোগাতে পারে। পুণ্যের সন্ধানে অথবা মুনাফার সন্ধানে অথবা শিকারের সন্ধানেও অনেকে দেশভ্রমণ করে থাকেন। তা ছাড়া কে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশি জায়গায় হাজিরা দিয়ে আসতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় যাঁরা পৃথিবীময় টহল দিয়ে বেড়ান তাঁরাও এক জাতীয় ভ্রমণকারী বটেন।

সকল শ্রেণীর ভ্রমণকারীরাই ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে থাকেন। কাজেই ভ্রমণকাহিনী নানা জাতীয় হতে পারে, নানা রসের হতে পারে।

'অভিযাত্রিক' কোন্ জাতীয় ভ্রমণকাহিনী? তার মৌল রসটি কি? কিসের সন্ধানে বিভূতিভূষণ ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলেন?

বিভূতিভূষণের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় অত্যন্ত ভাসা ভাসা ধরনের তাঁরাও জানেন যে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন। সুতরাং এই জাতীয় পাঠকেরা অত্যন্ত সহজেই একটা ধারণা গড়ে তুলেছেন যে বিভূতিভূষণের রচিত সমস্ত ভ্রমণকাহিনীই প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সন্ধানের কাহিনী—ভ্রাম্যমাণ বিভূতিভূষণের একমাত্র উদ্দিষ্ট রস নিসর্গরস।

'অভিযাত্রিক'-এর ক্ষেত্রে কথাটা আদৌ সত্য নয়।—অবশ্য প্রকৃতি-বর্ণনার অভাব নেই এ গ্রন্থে, বরং সীতাকুণ্ড-চন্দ্রনাথ ভ্রমণ, আরাকান-ইয়োমা ভ্রমণ, মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি কাহিনীতে প্রকৃতি, বিশেষ করে আরণ্য ও পার্বত্য প্রকৃতি, অনেকখানি স্থানই জুড়ে আছে। তবু একথা সত্য যে 'অভিযাত্রিক'-এর বিভূতিভূষণ প্রকৃতিসর্বস্ব নন—মূলতঃ প্রকৃতি-সন্ধানীও নন। তাঁর ভ্রাম্যমাণ মন নিসর্গশোভা-সন্দর্শনের মধ্যেই চরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় নি। তাঁর চেতন বা অবচেতন উদ্দেশ্য অন্যতর।

তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে 'অভিযাত্রিক'-এর প্রকৃতি-বর্ণনা 'আরণ্যক'-এর অথবা 'হে অরণ্য কথা কও'-এর অথবা 'তৃণাঙ্কুর'-এর প্রকৃতি বর্ণনার মতো কাব্য-রসসমৃদ্ধ নয়। এ গ্রন্থের প্রকৃতি-চিত্রণ সত্যই চিত্রাঙ্কন মাত্র—তার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, কিন্তু বেধ নেই; রেখা আছে, রঙ্ আছে, কিন্তু অনুভূতিজাত গভীরতা নেই। বনভূমির গাছপালা ফুল লতাপাতা

সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের উৎসাহ সর্বজন-বিদিত—কেউ কেউ এজন্য তাঁকে Botany-বাতিকগ্রস্ত বলে বিদ্রূপও করে থাকেন। সেই উৎসাহ বা বাতিক এখানেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। গোরাই নদীর তীরের স্যাওড়াগাছই হোক কিংবা আরাকান-ইয়োমায় রবার গাছই হোক কিংবা কাজরা উপত্যকায় বুদ্ধ-নারিকেলই হোক—গাছ চিনবার, গাছের নাম জানবার, গাছের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবার আগ্রহ তাঁর এখানেও যথেষ্ট আছে।—তথাপি এই প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে একটা অভাব অনুভব না করে পারা যায় না। সেটা হল exaltation-এর অভাব, চিত্ত-সমুন্নতির অভাব—যে অভাব আমরা 'আরণ্যক'-এর মত গ্রন্থে মুহূর্তের জন্যও অনুভব করি না।

এই অভাবের কারণ খুঁজতেও আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না।—'তৃণাঙ্কুর'-এর আলোচনায় আমি যে ত্রিতত্ত্বের উল্লেখ করেছি তার পরম ও চরম তত্ত্বটিই 'অভিযাত্রিক'-এ অনুপস্থিত। এ গ্রন্থের কুত্রাপি ঈশ্বরের আবির্ভাব নেই—উল্লেখ পর্যন্ত নেই; কারণ এই সময়ে, অর্থাৎ প্রথম যৌবনে, বিভূতিভূষণের বিশ্বাস ছিল যে তিনি agnostic. বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমানসের ও শিল্পীমানসের সঙ্গে যাঁর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে তাঁর এই বিশ্বাস এক ধরনের সাময়িক আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু এরই ফলে প্রকৃতি তাঁর কাছে এই সময়ে এমন একটা যান্ত্রিক রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল যা শুধু দেখবার, জানবার ও বুঝবার বস্তু, যার মধ্যে কোন mystic ব্যঞ্জনা নেই, কোন রকম ঊর্ধ্বায়নের বা চিত্ত-সমুন্নতির অবকাশ নেই। তাই তাঁর কবিমন এখানে নীরব।

'অপরাজিত'-র আস্তিক্যবোধসম্পন্ন অপু মধ্যপ্রদেশের আরণ্য অঞ্চলে প্রবাসজীবন যাপন করেছিল; 'অভিযাত্রিক'-এর agnostic বিভূতিভূষণও সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। দুই গ্রন্থের এই দুটি অংশের প্রকৃতি-বর্ণনা তুলনা করে দেখলে আমি যা বলতে চাই তা সহজেই বোঝা যাবে।

না—প্রকৃতি নয়, মানুষ। 'অভিযাত্রিক'-এর বিভূতিভূষণ মানব-তীর্থের তীর্থযাত্রী; 'অভিযাত্রিক'-এর মূল রস মানবরস।

কথাটা বিভূতিভূষণ নিজে বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন একাধিক স্থানে: 'দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি?...মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি।... মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান উত্তর দক্ষিণমেরু অভিযানের মতই কষ্ট- ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।'

'অভিযাত্রিক'-এর প্রত্যেকটি ভ্রমণকাহিনীই তাই মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান-

কাহিনী। এর বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে শৈল্পিক ঐক্যসূত্রে গেঁথে তুলেছে এই মানব-সন্ধানের প্রেরণা—এই একটিমাত্র কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যকে ঘিরেই বিভূতিভূষণের পথিক-জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা আবর্তিত হয়েছে।

তাই এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় এত মানুষের ভিড়। কত বৈচিত্র্য তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়। জাজিপাড়া গ্রামের সেই দরিদ্র গুরুমহাশয়, বাগান-গাঁ থেকে ফিরবার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই কাঠ-কুড়ানী বুড়ী, বরিশালের কুঞ্জবাবু, আরাকান-ইয়োমার পথের সহযাত্রী প্রণয়-পাগল ডাক-পিয়াদা, বাড়বাকুণ্ডের পাণ্ডাঠাকুর, আওরেংজেবপুরের অতিথিবৎসল মুসলমান গৃহস্থেরা ও বৃদ্ধ খালাসী আবদুল, আগরতলার ছন্নছাড়া কপর্দকহীন ভূতাত্ত্বিক, নোয়াখালির সদানন্দ উদারহৃদয় উকিলবাবু, নরসিংদি স্কুলের 'ধনগাঁয়ে শিয়াল-রাজা' হেডমাস্টার মহাশয় ও দারিদ্র্যপীড়িত ড্রয়িং মাস্টার, শুশুক আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মাজী, রামজীর মন্দিরের বৃদ্ধ মোহান্ত, মহিষারডি গ্রামের হরবংশ গোপ, দায়কেশার সমাজ-সংস্কারক মাধোলাল—ছোট বড় কত চরিত্রের আনাগোনা 'অভিযাত্রিক'-এর পাতায় পাতায়। দোষে গুণে এরা প্রত্যেকেই এক একটি গোটা মানুষ—এক একটি অনাবিষ্কৃত জগৎ।—'অভিযাত্রিক'-এ প্রকৃতি বারংবার আবির্ভূত হয়েছে—অনেক সময় রূপে বর্ণে গন্ধে সুসমৃদ্ধ হয়েই আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু তবু আমার মনে হয় এ গ্রন্থে প্রকৃতির চেয়ে মানবের মহিমা অনেক বেশি। প্রকৃতিবর্ণনা বর্জন করলে এর অনেকখানি যাবে সত্য, কিন্তু মানুষের কথা বাদ দিলে কিছুই থাকবে না।

এই সব মানুষকে বিভূতিভূষণ দেখেছেন প্রীতির দৃষ্টিতে, সহানুভূতির দৃষ্টিতে, কখনও কখনও ঈষৎ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। এদের মনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার চেষ্টা করেছেন তিনি, গোপন চিন্তা ও অনুভূতির চোরাকুঠুরির চাবিকাঠি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন; কখনও বা তা করতে পেরেছেন, কখনও পারেন নি। কিন্তু এদের সবার কাছ থেকেই তিনি কিছু না কিছু পেয়েছেন—তাঁর জীবনবোধের পরিপুষ্টি সাধনে এরা সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করেছে।—'মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয় নি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো।'

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মনোধর্মের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনোধর্মের সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য বর্তমান। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মত বিভূতিভূষণেরও মানবদৃষ্টি আংশিক—কিছু পরিমাণে পক্ষপাতদুষ্টও বটে। সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত, বিত্তবান শহুরে মানুষের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ছিল। ভ্রাম্যমাণ জীবনে এদের সংস্পর্শ তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ, দরিদ্র বা স্বল্পবিত্ত মানুষ, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ, নিরীহ ধর্মভীরু সরলপ্রাণ মানুষ—'অভিযাত্রিক'-এর চরিত্রচিত্রশালায় এদেরই ভিড় বেশি। যে দুই একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়—যেমন বরিশালের সেই শেক্সপীয়র-পাগল ভদ্রলোকটি অথবা নোয়াখালির উকিলবাবুটি—তাঁরাও তাঁদের সহজ সারল্যের গুণেই শুধু এদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন।

এর কৈফিয়ৎ বিভূতিভূষণ নিজেই দিয়েছেন। ছাঁচে-ফেলা মানুষ তিনি পছন্দ করতেন না। 'মানুষের মনকে বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা একটি কলের ছাঁচে গড়েচে। সব এক ছাঁচ, রামও যা ভাবে, শ্যামও তাই ভাবে, যদু মধুও তাই ভাবে। যে আর একজনের মত না ভাবে—তাকে লোকে মূর্খ বলে, অশিক্ষিতও বলে······অনেক খুঁজেও খাঁটি ওরিজিন্যাল টাইপ বার করা যায় না।'—এই ওরিজিন্যাল টাইপের সন্ধানই ভ্রাম্যমাণ বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্ধান—এবং এইজন্যই তিনি সভ্য, শিক্ষিত, বিদগ্ধ মানুষের প্রতি এত উদাসীন। মনের মত মানুষের যখন তিনি দেখা পান তখন তাঁর মন অনুভূতির গভীরতায় ও অন্তরঙ্গতায় রসার্দ্র হয়ে ওঠে। তাই এদের প্রতিটি চরিত্র তাঁর তুলির টানে এমন জীবনরসে ভরপুর হয়ে ফুটে ওঠে; তাই 'অভিযাত্রিক'-পাঠকের পক্ষে এদের কাউকে ভোলা অসম্ভব।

গ্রন্থের একমাত্র অপ্রীতিকর চরিত্র নরসিংদি স্কুলের সেই হেড্‌মাস্টার মশাই—ইনি এম্-এ পাশ এবং কলকাতার ছেলে। এই ছাঁচে-ঢালা, স্টাইলবাজ, বিতর্কবাগীশ, প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে সমান উদাসীন চরিত্রটির তুলনায় আঠারো টাকা বেতনের দরিদ্র ড্রইং মাস্টার বিভূতি-ভূষণের কাছে মানুষ হিসাবে অনেক বেশি মূল্যবান। এই জাতীয় মানুষের নিরীহ সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করে, এদের সাহচর্য তাঁকে আনন্দ দান করে।

এদের কাহিনীই 'অভিযাত্রিক'-এর মুখ্য কাহিনী। প্রকৃতি পটভূমিকা মাত্র।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অপরাজিত

(প্রথম খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদার শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারী-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বামুনী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটুও কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বামুনী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সাম্‌নাসাম্‌নি পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরণেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বামুনী কী পরূচের দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস করি? ব'লে দেয় যেন বড় বৌরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—তুমিও দেখে নিও ব'লে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে ব'লে ওকে এ বাড়ি থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওই রকম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ ক'রে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু'মাস দশ মাস তো নয়,

তোমার দেখচি আজ তিন বছর—বল্‌লেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কৈ তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী!

সদু বলিল, না, তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম, যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বামনীকে, একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বৈ-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভাল-মানুষটি, বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্ বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে!

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না দুটোখানি? ডাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুন-ভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্। ক্ষিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্ এখন।

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বস্‌চি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্বর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গার একটা চাকরির কথা বলেচে মা একজন। ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সর্বজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে ঘাটে গাড়িঘোড়া—কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়।

সর্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে—দু'টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ি তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অমনি চলে যাবো ইস্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি ক'রে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়-বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা, বুঝলে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি ব'সে ব'সে ঘুড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা ক'রে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরী ক'রে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে। এই স্বর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরি। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস্ না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরানী যে শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুনছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাকবেন দিন-কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-তুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়ির সবাই আস্‌চে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে —ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে, দেখাচ্চি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে!

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস!—সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়-একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া, ঠাকুর-দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়ে ছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেছেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেছেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমিঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শীগ্‌গির। স্থাখ্ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখেনে একদণ্ড ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকো, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রায় কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দু'জনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ ক'রে দেয় না, দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্‌কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে, হয়ত আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে।

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সামনে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা, এত সকালে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়? মেজবাবুরা কি আজকে আসবেন?

নিস্তারিণী বলিল, তাই তো শুনছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌরানী আসবেন, লীলা দিদিমণি এখন আসবে না—ইস্কুলের এগ্‌জামিন। সেই বড়দিনের সময় তবে আসবে। গিন্নীমা বলছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা একমুহূর্তে দমিয়া গেল। লীলা আসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে। কতদিন সে আসে নাই।

তাহার মা বলিল, বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে? আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজে নি কাল।

অপু বলিল, রাত বেশী হয়ে গেল, ফটক বন্ধ ক'রে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়িতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে ছিল, তার উপর শুয়ে—

সর্বজয়া বলিল ওমা, আমার কি হবে! এই সারারাত ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষীছাড়া ছেলে, যেও তুমি ফের কোনদিন সন্দ্যের পর কোথাও—তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি ক'রে ঢুকবো বলো না? ফটক ভেঙে ঢুকবো?

রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্বজয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা আবার আসবেন। বললেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ি থাকবেন। এদের বাড়ি থাকবার অসুবিধে—পরশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বল না মা, কি সব কথা হ'ল?

আগ্রহে অপু মায়ের পাশে চৌকির ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। দু'জনের অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেরই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা টুকটাক গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। একটা বড় টিনের তৈমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জ্বালবো—কত বড় লম্পটা দেখেচিস? দু'পয়সার তেল ধরে।

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ, আগের চেয়ে মাথাতে কতবড় হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু'জনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি ক'রে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি। নিস্তারিণী মাসী বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বড়দিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে খাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছু জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ আমার ভাই! জানো না?···এই এক বছরের হলো।

লীলার জন্য অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড় বছর আসো নি—না? পড়চ কোন ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভাল আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব-পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দু'টি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে। ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো ব'লে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আরও দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকীটা কোনো রকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইয়াছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল —সে ধরণের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরণের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে সেই ধরণের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানাতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত— কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল —সেই তোমায় একবার ফুলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা কোন্ স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে। সে কথা কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো?

—এবার মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস্ স্কুল—আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখেনে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস্ এন্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল— মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভাল।— তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোন নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

—আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেচেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে!

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি ইস্কুল আছে? পড়বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাকতে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখেনে রেখে থাকতে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপূর্ব আমাদের বাড়িতে থাকবে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেকৃট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিন্‌ও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হ'ল ইলেকৃট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু'জনের কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতেই মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস্ ট্রেন-খানা দেরিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটীর গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটীতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলীরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিস-পত্র নামাইয়াছে।

গোরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটীতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ, সোজা খোঁজটা করেচি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই। এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েচে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে। গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই, —আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম ক'রে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুর—

সর্বজয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি ?

—তা কি ক'রে শুনবো ? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হ'ল কাশী চলে গিয়েচে। তখন কাশী যাই। কাশী আমি আছি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল, নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আছে, দাদামশায় ?

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ! পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এলে ভাল হ'ল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পুজোটুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে—

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুল ফলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশিরসিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবশুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেক দিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ

উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র; মিনমিনে ধরণের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরণের নয়। অপুর মন সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল অবদানকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পে দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট্ট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু'খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মা'কে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নী খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দু'টি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে দু'খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নী পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নী হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুণ একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কি-না। মেজ বৌমার মেয়েটা স্তাওটো, মা দেখতে ফুরসৎ পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুংড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি কৈজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জ্বাল করো, তা ঢিমে আঁচে চড়াও। হাঁরে হাজরী, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেছে কি-না জানিস্?

আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্বেই তেলি-গিন্নী তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ওইটি আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুরে বিয়ে দিয়েচি। জামাই বড়বাজারে এদের দোকানে কাজকর্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েচে কালনা—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হলে হবে কি মাঁ—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো

শোনে নি। দুই ছেলে, নাতি নাতনী, বোয়ান মারা গেলেন ভাদ্দর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে ক'রে আনলে। এখন ছেলেদের সব দিয়েচে ভেন্ন করে। জামাইয়ের মুখকিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেচেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখো শোনো শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হুড্ বার্নিস নয়, বেশ টক্‌টকে রং। বোধ হয় শহর-অঞ্চলের মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সে-ই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এঁরা এসেচেন সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েছে, এঁরা আবার রান্না করবেন।

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলি-গিন্নী বলিল—কে মা-ঠাকরুণ? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েচে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নী ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা! আমায় ছলতে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো-ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোন দিন।

ছোটবৌ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই···তাই উনি বললেন—আমি বললাম আসুন তাঁরা—চক্কত্তি মশায় পুজো-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়েজামাই মারা যাওয়ার পর থেকে বড় থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাকলে ভালো! বীরভূম না বাঁকুড়ো জেলা থেকে সেবার এল কি চাটুয্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ি থেকে চালডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তিন মাস রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আন্‌ব—কাল ছেলেপিলে আন্‌ব—ও মা এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন-ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেছে, ওঁরও কাজটা করে দিস। ঘেন্নার কথা শোনো মা, আর বছর শিবরাত্রির দিন—তাকে নিয়ে—

বউ-দু'টি ও মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্বজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, পালালো নাকি?

—পালালো কি এমন তেমন পালালো মা? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্ত বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজের ঘর থেকে···বলি আহা বামুন এসেচে—সরুক, আছে বাড়তি। তা সেই বাসন সবশুদ্ধ নিয়ে ছুঁড়নে নিউদ্দিশ। যাক্ সে সব কথা মা, উঠি তাহলে আজ। রান্নার কি আছে না-আছে বলো মা, সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আট দশ দিন কাটিয়া গেল; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশী কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল—তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটি পূজা না করিলে সংসার ভাল রূপ চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল করিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্বজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া, তোর ছেলেকে বল কাজকর্ম সব দেখে নিতে। আমার মেয়াদ আর কত দিন? ওদের বাড়ির কাজটা দিক না আরম্ভ ক'রে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে।

সর্বজয়া তাহাতে খুব খুশী।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দু'টি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজার মাকাল পূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুং' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দঃ কূর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোন রকমে গোঁজা-মিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়ীপনা-টুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কি জন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো করতে পারবে? কি নাম

তোমার ? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন ? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি ? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে ? —অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উঁহু, তাড়াতাড়ি ক'রো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্র কুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি ? তুলসীপাতা উপুড় ক'রে পরাতে হয় বুঝি ? চিৎ ক'রে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোন রকমে পূজা সাজ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

অপুর যেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশী, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশী। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মত গাছপালা, অত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব ? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা ?

সরকার বাড়ি হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্তস্বভাব ও সুন্দর চেহারার গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ির পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ি আনে। সর্বজয়া হাসি-মুখে বলে, ওঃ, আজ চাল তো অনেক হয়েচে!—দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিদ্যিতে দিলে রে!

অপু খুশীর সহিত দেখাইয়া বলে, কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা ?

সর্বজয়া বলে, এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন, এদের ঘরে থাকা যাক্, গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিস সর্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব সচ্ছলতার ছবি

আপন মনে ভাঙিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলে দীর্ঘছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে! একটা খাতা বাঁধিয়াছে, তাহাতে সর্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেবদেবীর স্তবের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ায় পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল-বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁতভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন্ ইস্কুলে রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখেন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখানে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্ব্বজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়বো! ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক্ দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ-পাড়ার কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিসপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ির দিকে আসিতেছিল; খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ির সামনে নারিকেল গাছে কাঠঠোকরা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বউল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ির পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না

পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে,—পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল যে, উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা, তার পরের উঁচুটা স্কুলের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে শহরে-শেখা একটা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে ইছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্নের, কত জ্যোৎস্না-রাতের সে সব স্বপ্ন। এই ছোট্ট চাষাগাঁয়ের চিরকালই এ রকম ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ির চাকায় চাকায় যেমন শব্দ হয়—ছোট্‌ঠাকুরপো—বট্‌ঠাকুর-পো—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—

•

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল: আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি!

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।…নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত।—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।…

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরণের

লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড় ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ, হাঁা কাকা? চলো আমি মনসা-পোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিকৃড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ, হ্যাঁ কাকা?···

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলেমেয়ে, তারা কি করে?···

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লীগৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন্ গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগ্‌দীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপুর সঙ্গীটি এইমাত্র তাকে শামুকপোতার বিলে গুগ্‌লি তুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরণে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে গহনা নাই, ডাঙার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে?

হ্যাঁ, চিনিতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুরোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হর্তেলের মত গায়ের রঙ—যেন ঠাকুরুণের পিত্তিমে!

দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুকপোতার বিলে হাঁটুজল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল।

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত! মাস্টারেরা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকা একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাশের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে, যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাস্টার

ফণীবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে ব'লে ব'লে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই ক'রে ক্লাসে গেলেই হ'ত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর-আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর স্কুল ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' ক্লাসে আমিই অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাঙলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মত গলা।' রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে ক'রে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন

বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু'দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক, ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য দু'দিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই যোগাইতেছে। সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলে জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছে ঠোক্‌রাইতেছে কি না।

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো-মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরণের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা ও সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো? পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড় বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার যোগাড়ে শুক্‌নো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হড়িয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!—

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেঁজী, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।···তাহার পর সে ভুঁতগাছতলায় শুক্‌না পাতালতায় আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!···

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাইতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পুজো—আজ স্কুলে যাবি কি ক'রে? ···ওরা বলে গিয়েচে ওদের পুজোটা 'সেরে দেওয়ার জন্যে—পুজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আমি পুজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পুজোটুজো আমি আর করবো কি ক'রে, রোজই তো পুজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনছিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পুজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়াসুদ্ধ পুজো হবে। চাল পাওনা যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার, কথা শোনো, শুনতে হয়।

অপু কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্টমাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওকে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করচি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ! হীরের টুক্‌রো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন ? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি ?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে ?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই ক'রে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ, ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যার ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়া ছিল।

বাড়িতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে ? কুলুইচণ্ডীর ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিরে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন কল্পনা ; সে পরীক্ষার বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল!...সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে! ঐ মাঠের পারে রক্ত আকাশটার মত রহস্যস্বপ্নভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহা-সমুদ্র!...পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের-বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্তদিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখ করলে আজ। সরকার-বাড়ি থেকে বলে গেল তুই পূজো করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

—আজ না গিয়ে ভাল করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বলেচে আমি এগ্‌জামিনে

স্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার ডেকে বললে—

সর্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় স্কুলে।

—তা তুই কি বল্লি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না। ওতে মাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজয়া আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে স্কলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন্ দণ্ডী তার নির্মম অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার দুর্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐদিকে ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াসার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু; অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রার আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্ট ছেলে তো আচে, অমনি মাস্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে। এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার-খেলা নাই, যেন পান্‌সে-পান্‌সে।

তবুও আজিকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা ভাসানোর আসর, এই নতুন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ-ভরা নৈশ বাতাস জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।···

রাত্রে সে আরও দু-একটা জিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা বড় পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার সুর এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবার সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-বিভূঁই-এর সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল —বাড়ি আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপূজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপূজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডু-বাড়ির দো-ফলা আম গাছের মাথায় ঝলমল করিতেছে—বাড়ির সামনে বাঁশবনের তলায় চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনো আদার রঙীন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের মত সকালের বুকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল ইন্‌স্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আনিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তা নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং-বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চোদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ?—বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে।

সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল,—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়ত বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া শুনিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়ত একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।···

একটু বেলা হইলে সে স্কুল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!···কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে

বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরণের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল, একসঙ্গে থাকলে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হ'ল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে!...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমে একজন কোট-প্যাণ্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্ মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধ-ভরা পুরোনো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরণের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোটখাটো স্কুলে পাওয়া যায়?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি।—কি গম্ভীর আওয়াজটা!...

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহার উপর কেমন এক ধরণের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইঁহার মুখের ইংরিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরণের খেলা শুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া

দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট্ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপুর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য!

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠ্‌চি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! সেকেণ্ড মাস্টার তো—না?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে লিখে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার? জিওমেট্রি নেই? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে—না?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে? আর কেউ না? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই?

—বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে

আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা?

নৃপেন বলিল, হেডমাস্টার আসবে না তো?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্তিরে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্বও তাস খেলিতে বসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, মায়ের ও দিদির সঙ্গে কত কাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল; অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দোব, ধরো দিকি তাস।

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোশকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমার হাতের খেলা শিশির।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমনি হয় নাকি? কেউ টের পায় না? আচ্ছা, চুপ ক'রে বসেছিল, ও ছেলেটা কে?

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়া ছিল। বয়স তেরোচৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্তা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডিং-এর বেশীর ভাগ ছেলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া যাতায়াতে খরচ-পত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে একবার মাকে দেখিয়া আসিলে মন্দ হইত না,—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি-খালি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুণকাম-করা ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনও তাহার হয় নাই, সে

খুশী হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সমীরের মত একটা টেবিল আমার হয় ? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিজ্ঞাসা করবো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিনে লেখা আছে—সোমবার পাটীগণিতের দিন। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি। অপু বলিল—এসো, এসো, ব'সো।

ছেলেটি বলিল, আপনি বাড়ি যান নি ?

অপু বলিল, না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার সোমবারে আসা যাবে না।

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিং-এ যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয় ? তুমি বাড়ি যাও নি কেন ? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না কি ইচ্ছে ক'রে ? সেকেন্ মাস্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি ? হবে না, যাও।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেনে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্তার ধরণে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাস্টার না দেয় হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলবো।

অপু এ ধরণের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল, আপনি দেখেন নি বুঝি ? জানেন না ? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে।

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দু'টি গরাদে তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘন্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো ?

এক খণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড় কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিজ্ঞেস করবো।

মণিমোহন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র. দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে ?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরীর কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন ক'রে উড়ে এসেছে বোধ হয়। কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধটা!

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ—অনেকটা যাত্রার দলের মুনির মত। ভারী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজী করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো ? ক্লাস—নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

—কে বলতে পারো—তুমি—তুমি ?

ক্লাসে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী' গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে। তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো ; বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটোখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ

আনিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ভাল ক'রে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু'-একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না।

মাস দুই-তিনের মধ্যে বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়ত তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির ছেলের পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল। তাহাকে কে খুশী করিতে পারে—ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিং-এর ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেরই ইচ্ছা—অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোন রকমে খাওয়া সারিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্স্টক্লাসের রমাপতি পর্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে মনে মনে খুশী তো হইলই, একটু গর্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড়, ইংরেজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পর্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীরপ্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই শ্যামলালের মত? রমাপতিদা পর্যন্ত সেধে লেবু দিল! দেয় ওদের? কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাঁঠালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূর্বদা, একটা টাস্ক একটু ব'লে দেবেন?

পরে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাবো। শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না, অপূর্বদা?

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরে রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুকনা পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাসখানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী; যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী,

সেগুলা সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পা[illegible] । হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিসঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যর!

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যর—

ভদ্রলোকটি পনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাকে বলে?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরণের গাড়ি, কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিকল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোনটা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস্ হ্যাভ নো হুইল্‌স্—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, অরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইণ্ড অব্ এ্যাটমোস্‌ফেরিক ইলেক্‌ট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্‌ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন?. এ স্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম বয়—বেশ বেশ!

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড় ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সীট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের দোয়াতদানি, নতুন নিব পরানো

কলমগুলি সাফ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বিছানাটি ধবধবে, বালিশের ওপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়া শুনার কথাবার্তা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পূজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হ'তে হবে, আর তো বেশী দেরিও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মত এই রকম একটা দোয়াতদানি হয় আমার? চমৎকার ফুলকাটা? লিখে আরাম আছে। হ্যাঁ, চাঁদা চাইতে যাবো বৈ কি? ওসব হবে না আমার দিয়ে।—আসল কথা সে বেজায় মুখচোরা, কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু, বাড়ি যাও নি আজ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন্ মাস্টারের, ছুটি দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্বদা! বললে, তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও, তোমার ছুটি হবে না—

দেবব্রতর জন্য অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ির জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের যত কড়াকড়ি। থাকতে পারে না, ছেলেমানুষ,—আচ্ছা লোক!

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্য নিখে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলালেবু আনালেন, কপি আনালেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে, সে দুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই।

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি ক'রে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেক্‌টিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে, আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ো নি 'নিহিলিস্ট রহস্য'? চমৎকার বই—ওঃ কি সে কাণ্ড? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধূলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল, আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়িতে যাচ্ছো, আমি বার ক'রে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার ক'রে গুলি করতে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নূতন ধরণের যুদ্ধ-জাহাজের নক্সাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে

বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে রুশীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিং-এর পিছে দেওয়ানী আদালতের কম্পাউণ্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে ক'টা বেজেচে দেখুন না একবার? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা, আমি এখুনি বাড়ি যাবো।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন যাবে কিসে? এই যে বললে ট্রেন নেই?

দেবব্রত স্বর নিচু করিয়া বলিল—এগারো মাইল তো রাস্তা মোটে, হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হ'য়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে, বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না ব'লে যাওয়া—যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ি সে যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল, তা হ'লে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন-চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিং-এর কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তুরমত অবাক হইয়া গেল। সমীর বাহিরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদেটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাত্রের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের রোয়াকে পৌছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কত দিন সে দেখে নাই। ইহার মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেলগাড়ি, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাঁহার একমাসের জলখাবার। কোথায়

পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে? জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর একটা টাকা হইলেই— বাড়ি। হয়ত এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন স্কুলে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবার রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদে খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, ও ছেলেমানুষ, থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলে না সেকেন্ মাস্টার, ওর কি দোষ?

উপর-ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে হলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ! bend this way, bend! মার দেখিয়া বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে পড়িল, লীলাদের বাড়ি এই রকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়বাবুর কাছে, সেও বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-রকম কাঁদছিস্ কেন অপূর্ব? থাম্ না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা-তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসচি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝেসুঝে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও-রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, যাঃ বকিস নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করবো কি?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস্?

—হ্যাঁ বলে বৈকি!

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ? সেদিন মণিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল; ওই বদমায়েস রাসবেহারীটা বলছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব কলার লজেঞ্চুস কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে!

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইহার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা-পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্কলারশিপের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর খরচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড় টাকা দু'টাকাকে সে টাকার হিসাবে না দেখিয়া পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডারের সমান অসীম মনে হয়। মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দরাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দু'চারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহার খুব প্রশংসা করে, পড়াশুনার তারিফ করে। অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজা ভাল ছেলে আমি! সবাই কি খাতির করে! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসিচি!

মহা খুশীর সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়। ইহার উপর আবার কেহ কেহ ধার করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষে উড়িয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানা-টানির সীমা থাকে না। দু'দশটা পয়সা যে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই? পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা-ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে-জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর ক'টা লজেঞ্চুস্ আছে?—পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়।—ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরণের ফলের আস্বাদযুক্ত লজেঞ্চুস্ সে আর কখনও খায় নাই!

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরাণী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল···সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল···লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের কটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্কভাবে বইখানা সে উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠার সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা···তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌছাইয়া দিও, ভুলিও না।···

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine!···

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস!—সে আর থাকিতে পারে না···বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না স্কুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্ণগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।···

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটায় বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলা উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্‌গির আয় রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে! পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মারতে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে—চল, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধ-ঝলসানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, হরি ঠাকুর ওর গতি করবেন, দেখিস্! আহা কি ক'রেই ঘাড়টা থেঁতলে দিয়েছিলি? কখ্‌খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ!—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল।···

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেবব্রত বলিল, অপূর্বদা এখানে ব'সে আছেন? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এস ব'সো। কি? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূর্বদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন? আপনার নামে লাগিয়েচে, ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে এই সব। যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকি না রাখতে। বলছিল, ও আর দেবে না—তিন বারের পয়সা নাকি বাকি আছে?

অপু বলিল, বা রে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সামনের মাসে প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে! আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইস্ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা তামাসা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব?

অপূর্ব বলিল, এসব কথা আমি জানি নে, আমি লিখছিলাম নবীমাধব এসে বলে—ওটা কি? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা আবোল-তাবোল শুধু তাতেই ভর্তি? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ ক'রে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেছে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হ'ত সেদিন! দেখতে চাইলে তাই তো দেখালাম, নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এসব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মত পানকলস শেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন... এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশীদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরণের ভূমিশ্রীর জন্যে মনটা তৃষিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাইয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল-বিকালের রোদ...ফুল! ফুলের সংখ্যা থাকে না। বোর্ডিং-এর ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা অজানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইয়া আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে!

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর কখ্খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হ'য়ে গেল। দেবো আবার কখনো ক্লাসের ট্রানস্লেসন বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতেই স্কুল-কম্পাউণ্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা গজাইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড় বাদাম গাছটার রক্তাভ-কচি সবুজ পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকার, শীত একেবারে নাই বলিলেই হয়।

বোর্ডিং-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মামুদোয়ানে দোলের মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। মামুদোয়ানের মেলা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা।

অপু খুশির সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মামুদোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন

হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনও দেখা ঘটে নাই।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু দু'দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেকদিন পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পথ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমারেরা চাক ঘুরাইয়া কলসা গড়িতেছে। পথের ধারের ছোট দোকানে দোকানদার রেড়ির ফলের বীজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফুলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে।...ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুই পাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে-সুখে আকাশ-বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এই জীবনধারার সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাহারা শুকনো খেজুর ডালের আগুনে রস জ্বাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল—সে তাহাদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্তা বলিতেছে।

ননী বলিল, তোকে পাগল বলি কি আর সাধে? দূর, দূর,—আর কি দেখবি ওখানে?

অপু অপ্রতিভ মুখে বলিল, আর না ওরা কি বলছে শুনি? ওরা কত গল্প জানে, জানিস? আয় না—

রাজু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথাবার্তার প্রতি তাহার প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়—রাসবিহারীর দল অগত্যা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া মুচিরা খুব খাতির করিল। খেজুর-রস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাটের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘণ্টাখানেকের উপর সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড় জ্বাল দেওয়া দেখিল।

মামজোয়ানের মেলায় পৌঁছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা, ভয়ানক ভিড়; রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পাইয়াছে, ভাল খাবার খাইবার পয়সা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পাখীর খেলার তাঁবুর ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত ক'রে নেবে খেলা দেখতে?...দুপয়সা দেব—দেখাবে?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আধঘণ্টা পরে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা কবে বসবে জানো?

বৈকালে লোকের ভিড় খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ করিয়া পানের

দোকানগুলিতে খুব ভিড়। খেলা ও ম্যাজিকের তাঁবুগুলির সামনে খুব ঘণ্টা ও জয়ঢাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—একটা বড় তাঁবুর বাহিরে আলকাতরা-মাখা জন দুই লোক বাঁশের মাচার উপর দাঁড়াইয়া কৌতূহলী জনতার সম্মুখে খেলার অত্যাশ্চর্যতা ও অভিনবত্বের নমুনা স্বরূপ একটা লম্বা লাল-নীল কাগজের মালা নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে।

সে পাশের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'পয়সা জানো?

নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'রহস্য লহরী'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া, কাটামুণ্ডুকে কথা-বলানো, এক ঘণ্টার মধ্যে আম-চারায় ফল-ধরানো প্রভৃতি নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু নানা বিলাতী ঔষধের ফর্দ ও উপকরণের তালিকা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া "নিশাদল" দ্রব্যটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওরা শেখে! বাবার সেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল!—নিশ্চিন্দিপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা!

চারিধারে বাজনার শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, পেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসবের নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে কৌতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তাঁবুর জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাক্সের উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পয়সার দাও তো? এই যে এইদিকে—এক পয়সার সিগারেট—ভাল দেখে দিও—যা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের দোকান দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। চটের থলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বুড়া, চোখে সুতা-বাঁধা চশমা। একখানা ছবিওয়ালা চটি আরব্য উপন্যাস অপুর পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই—কিন্তু দোকানী দাম বলিল আট আনা! হাতে পয়সা থাকিলে সে কিনিত।

বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়াতে সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে—পটু! তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যসঙ্গী পটু!

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, অপুদা?… এখানে কি ক'রে, কোথা থেকে অপুদা?…

অপু বলিল, তুই কোথা থেকে ?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েচে এই লাউথালি। এইখেন থেকে দু-কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি ক'রে এলি কাশী থেকে ?—

অপু সব বলিল। বাবার মৃত্যু, বড়লোকের বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল। জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মামজোয়ানের কাছে ? বেশ তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদির ভয়ে ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরীব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু স্থান, নম্র ও ভীরু চোখ দু'টি সর্বদাই নামানো, অল্পেই সন্তুষ্ট।

দু'জনেই খুব খুশী হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড্ড ভিড় ভাই, চল্ কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের একটা গাছতলায় দু'জনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কিভাবে আছে ?… রাণুদি কেমন ?…নেড়া, পটল, নীলু, সতুদা ইহারা ?…ইছামতী নদীটা ? পটু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না, পটুও আজ অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া। পটুর আপন মা নাই, সৎমা। অপুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির বিবাহের পরে বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেষ্টায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদির বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টায় আছে। অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে না। তবে শুনিয়া আসিয়াছিল—শীঘ্রই রাণুদির বিবাহ হইবে, সে তিন বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে অপুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্রের মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদার।…কি সুন্দর মুখ!… অপুদার কাপড়চোপড়ের ধরণও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়াইল, বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি ? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে আনিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই ? আয় তোকে দেখাই—পরে সে আট পয়সার দুইখানা টিকিট কাটিয়া উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।

ম্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে, আমরা চলে এলে রাণুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা ? না:—

খুব বলিত। পটুর কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোনো পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি ? পটু বলিতে পারে নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোত্তম বাবাজী তোর কথা ভারী বলতো!

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোষ্টমদাদু এখনও বাঁচিয়া আছে ?—এখনও তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই ? মধুর প্রভাতের পদ্মফুলের মত ছিল দিনগুলা—আকাশ

ছিল নির্মল, বাতাস কি শান্ত, নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ! মধুর নিশ্চিন্দিপুর! মধুর ইছামতীর কলমর্মর!...মধুর তাহার দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি!...কতদূর, ক—ত দূর চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে সোনা-পাতার পান বিক্রী, সেই সতুদার মাকাল ফল চুরি করিয়া দৌড় দেওয়া!...

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক স্নানের সময় জলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহারা সব মানুষ হইল, কতক বা মরিয়া গেল, বাকীগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে বৃদ্ধ হইয়া গেল—হঠাৎ জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, কোথায় বা ছেলেমেয়ে!...

গল্পটা পড়িয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না? এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়ত বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু না—স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশে, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!...বেশ মজা হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজি কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা গ্রেভ্‌স্ অফ এ হাউস্‌হোল্ড। নির্জনে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা একসঙ্গে মানুষ, এক মায়ের কোলেপিঠে, এক ছেঁড়া কাঁথার তলে। বড় হইয়া জীবনের ডাকে কে কোথায় গেল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন্ গ্রাম্য বনের ধারে।

আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়। কত কথা যেন মনে ওঠে! যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দিপুরের জানালার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা—সেই বিপন্ন কর্ণ, নির্বাসিতা সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না—অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পদ্য ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য—তার কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।—প্রথম উচ্চারিত ঋকমন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।

রাগরক্ত সন্ধ্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারা।

কে জানে ওর মনের সে-সব গহন গভীর গোপন রহস্য ? কে বোঝে ?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দু'জনে মেলার মধ্যে ঢুকিল। বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা। বলিল—চল্ পটু, দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যাস্ নে যেন।

পটু বলিল, অপুদা কোন্ ক্লাসে পড়িস্ তুই ?···

অপু অন্যমনস্কভাবে বলিল, ঐ যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল, তাতে সব লেখা ছিল, কি ক'রে করা যায়—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন্ ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে। একদিন আমাদের স্কুলে চল্, দেখে আসবি—দেখবি কত বড় স্কুল—রাত্রে [illegible]'র কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত জায়গায় তো গেলাম, নিশ্চিন্দিপুরের মত আর কিছু লাগে না—কোথাও ভাল লাগে না—

—তোরা যাবি নে আর সেখানে ? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখু করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোর কাপড় পরবার ধরণ পর্যন্ত বদলে গেছে, তুই আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশী হইল। গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না ? ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতিদার গায়ে আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি—দেড় টাকা দাম।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরের দেখা-দেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত তাগাদা সত্ত্বেও এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আল্‌কাৎরা-মাখা জীবন্ত বিজ্ঞাপনটি বিকট চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপুর সহিত এতকাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশী হইয়াছে। কোথা হইতে অপুদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! তবুও স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে অপুদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরকাল সে-ও তো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে এক রকম, তাহার কি কোন উপায় হইবে না ?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌঁছিল। তাহার দিদি বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, খানদুই-তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটায় পুরানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাততঃ খড়ের ছাউনি একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাৎভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা ?··· সে এখন

আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলার স্বর শুধু বদলাইয়া গিয়াছে।

পটু হাসিমুখে বলিল, আজ কি হয়েচে জানিস দিদি, অপুর সঙ্গে দেখা হয়েচে—মেলায়।

বিনি বিস্ময়ের সুরে বলিল, অপু! সে কি ক'রে—কোথা থেকে—

পরে পটুর মুখে সব শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নে কেন?···দেখতে বড় হয়েচে? ..

—সে অপুই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না। আরও সুন্দর হয়েচে দেখতে—তবে সেই রকম পাগলা আছে এখনো—ভারী সুন্দর লাগে—এমন হয়েচে!...এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলায় যাওয়াই আজ সার্থক হয়েচে। ও নাকি মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এখান থেকে কত দূর?..

—সে অনেক, রেলে যেতে হয়। মামুজোয়ান থেকে ন'-দশ কোশ হবে।

বিনি বলিল, আহা একদিন নিয়ে আসিস না অপুকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্না-বাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্কত্তি মশায়কে একবার বলে দেখিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে দাও, তার পর নিজের চেষ্টা নিজে করবো—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব?...অপুদা বাড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তাও পড়ি নি, তুমি একবার চক্কত্তি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলবো এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট্ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে ওঠে—বট্‌ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিস্?—আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভাল পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজবর, বয়সও বেশি। ও-পক্ষের গুটিকতক ছেলেমেয়েও আছে, দুই বিধবা ননদ বর্তমান, ইহারা সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভুত্ব চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া ব্যক্তিগত ফরমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক রাত্রে বিনির স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিরল। মামুজোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলার সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহার করিতে আসে মাত্র। খাইয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও কেনা-বেচা হয়। লোকটি ভারি কৃপণ; বিনি রোজই আশা করে—ছোট ভাইটা এখানে কয়দিন হইল আসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রসগোল্লাও তাহার জন্য হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ রকম লোকের কাছে ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে!

তবুও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, ননদেরা কেহ রান্নাঘরে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটিবে না। অর্জুন চক্রবর্তী বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটল? এখানে থাকবে?...

বিনি মরীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূর্ব ব'লে ছেলে—আমাদের গাঁয়ের, সেও পড়ছে। এখেনে যদি থাকে তবে এই মামুজোয়ান ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারে—একটা হিল্লে হয়—

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভাল নয়, দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে দুনো, অথচ দোকানে আয় নেই। মামুজোয়ানে খটি খুলে চার আনা সের ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনায়, তা লাভ করবো, না খাজনা দোবো, না মহাজন মেটাবো? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক্—ও সব ঝক্কি এখন নেওয়া বললেই নেওয়া—!

বিনি একটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেখ মাসের দিকে আসতে বলবো?

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসের বাকীটা আর কি—আর মাসদেড়েক বৈ তো নয়!...ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্ ক'রো না—ভাল লাগে না, সারাদিন খাটুনির পর—বলে নিজের জ্বালায় বাই বাঁচি নে তা আবার—হুঁ—

বিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে মনে কষ্ট হইল—ভাইটা আশা করিয়া আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিয়া পড়িতে পারিবে! বলিল—আচ্ছা, অপু কেমন ক'রে পড়চে রে?

পটু বলিল—সে যে এস্কলারশিপ পেয়েচে—তাতেই খরচ চলে যায়।

বিনি বলিল—তুই তা পাস নে? তাহলে তোরও তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এস্কলারশিপ পাবো—বা তো—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভাল ছেলে—ও কি আর আমার হবে?...

বিনি বলিল—তুই অপুকে একথা ব'লে দেখ্‌দি? ও ঠিক একটা কিছু তোকে জোগাড় ক'রে দিতে পারে।

দু'জনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সর্বজয়া পিছু পিছু উঠিয়া বড়ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সম্মুখের উঠানে নামিয়া বলিল—মাঝে মাঝে এস বৌমা, বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা এক একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেড়িয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ায় চুরি হ'য়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নে।

তেলি বাড়ির বড় বধু বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সর্বজয়া বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল, গল্পগুজবে সময়টা তবুও

একরকম কাটিল। কিন্তু একা একা সে তো আর থাকিতে পারে না। শুধুই, সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপুর কথা মনে পড়ে। অপুর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহার মনে স্থান পায় না।

আজ সে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটির দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচমাসের মধ্যে! সর্বজয়া সকালে উঠিয়া ভা্‌িয়াছে—আজ দুপুরে আসিবে! দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকালে আসিবে। অপু ্াসে নাই!

অপুর কত জিনিস ঘরে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে!···শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজয়া হাঁপায়, অপুর মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার তাহার মনে হয় অপুর মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়··· অপুর মুখের আদলটা মনে আনিলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না, চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না···সর্বজয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া ওঠে—অপুর, তাহার অপুর মুখ সে ভুলিয়া যাইতেছে!

কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে···নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁটালের বড় প্রভু, না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, শেষে বুঝিয়াছিল, 'দিদি কাঁঠালের বড় ভক্ত' এ কথাটি বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার করিয়াছে। তখন অপুর বয়স নয় বৎসরের কম নয়, অথচ তখনও সে কাজে—কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পরণের কাপড় কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো ছিল না, অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে-ছোট-হইয়া-যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে!

আর একদিনের কথা সে কখনো ভুলিবে না। অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সম্মুখের উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহারই মধ্যে কোথায় গেল!···পাড়ার কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না। সে কেমন কাঠের মত হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল-ফেলা দেখিতে লাগিল। পাড়াশুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবার পাড়ে অক্রূর জেলে টানাজালের বাঁধন

খুলিতেছিল, সর্বজয়া ভাবিল অক্রূর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভাল মানুষের মত কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্রূর মাঝি নয়, সবাই যেন যমদূত, ও অন্য লোকেরা, যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সর্বজয়ার মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও—

হরিহর বলিল—কেন?...তা ও-রকম হয়, ছেলেমানুষে গিয়েই থাকে—

সর্বজয়া বলিল—তুমি পাগল হয়েছ।...তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে, বাঁশবন, মাঠ ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সোনাডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরবার নাম নেই—হন্ হন্ ক'রে হেঁটেই চলেছে।—কখ্খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে ব'লে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে।

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভাল লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসমধুর বৈকাল বহিয়া যায়, অলস অস্ত-আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালার পাখি ডাকে। এ রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু ভালমন্দ জিনিস পাইলেই সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল। পৌষপার্বণের সময় হয়ত অপু বাড়ি আসিবে, পিঠা খাইতে ভালবাসে, নিশ্চয় আসিবে। সর্বজয়া চাল কুটিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—কোথায় অপু?

এক সময় তাহার মনে হয়, অপু আর সে অপু নাই। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো সে মাকে হুঁ-উ-উ করিয়া ভয় দেখায় নাই, অকারণে আসিয়া তাহাকে

জড়াইয়া ধরে নাই, একোণে ওকোণে লুকাইয়া দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে উঁকি মারে নাই, যাহা তাহা বলিয়া কথা ঢাকিতে যায় নাই! ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—এসব সর্বজয়া পছন্দ করে না। অপুর ছেলেমানুষির জন্য সর্বজয়ার মন তৃষিত হইয়া থাকে, অপু না বাড়ুক, সে সব সময়ে তাহার উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট্ট খোকাটি হইয়া থাকুক—সর্বজয়া যেন মনে মনে ইহাই চায়। কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে!···

অপুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—তাহার মা কি রকম ছটফট করিতেছে বাড়িতে! একবারটি কি এতদিনের মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতে হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইষ্টচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধ্বজা তুলিবে কি না!

কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া আবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অপুর সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন ফাঁকা, অর্থহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অপু ছাড়া!··

এক একদিন নির্জন দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে।

সে দিন বৈকালে সে ঘরে বসিয়া কাপাস তুলার বীজ ছাড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখের ছোট ঘুলঘুলি জানালার ফাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। পথ দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাথার চুল ঠিক যেন অপুর মত, ঘন কালো, বড় বড় ঢেউখেলানো, সর্বজয়ার মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঞ্চলের মধ্যে এ রকম চুল তো কখনও কারও দেখি নি কোনদিন—সেই শশুরের মত চুল অবিকল! ·

তাহার মনটা কেমন উদাস অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা দিল। তখনি আবার মৃদু টোকা। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অপু দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রণাম করিবার আগেই সর্বজয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

অপু হাসিয়া বলিল—টের পাও নি তুমি, না মা? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে উঠে দরজায় টোকা দেবো।

সে মামজোয়ানের মেলা দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। এত নিকটে আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা হইবে না! পুলিনের নিকট রেলভাড়া ধার লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল, তোমার জন্যে ছুঁচ আর গুলিসুতো এনেচি—আর এই ছাখো কেমন কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে!

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরণের জামা গায়ে—কি সুন্দর মানাইয়াছে! সর্বজয়া বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেচিস ?

মা'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অপু খুব খুশী। জামাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া বলিল —সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েচে—চাঁপাফুলের মত হবে ধুয়ে এলে—এই তো ঘোটে কোরা।

বোর্ডিং-এ গিয়া অপু এই কয় মাস মাস্টার ও ছাত্রদের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই হাবভাব, কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকের মাস্টারের! সর্বজয়ার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এ রকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না ? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না ?

সন্ধ্যার সময় মায়ের রাঁধিবার স্থানটিতে অপু পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সর্বজয়া আজ অনেকদিন পরে রাত্রে রাঁধিতে বসিয়াছে।—সেখানে কত ছেলে একসঙ্গে থাকে ? এক ঘরে ক'জন ? দু'বেলাই মাছ দেয় ? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো ? কি খাবার খায় সে বৈকালে ? কাপড় নিজে কাচিতে হয় ? সে তাহা পারে তো!—পড়াশুনার কথা সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়ার কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপুর হাসিতে, ঘাড় দুলুনিতে, হাত-পা নাড়াতে, ঠোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সর্বজয়া আবার পুরানো অপু, চিরপরিচিত অপুকে ফিরিয়া পায়। বুকে চাপিতে ইচ্ছা করে। সে অপুর গল্প শোনে না, শুধু মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা, এক এক সময় মনে হ'ত—অপু ব'লে কেউ ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মুখের তিল—স্বপ্ন নয়, সত্যিই তো—রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখেই চেয়ে চেয়ে দেখি—

অপু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করিয়াছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না ? কতকগুলো ধার আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে ?

সর্বজয়ার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিরা ও কুণ্ডুরা জিনিস-পত্রটা, কাপড়খানা, সিধাটা—এই রকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না। তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিন্নির নিকট হইতে একটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যার আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশন, সন্ধ্যার পরেই ট্রেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজেঞ্চুস্ ভুলিয়া গেল।

পরদিনই আবার বোর্ডিং-এর ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে। অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু' আনা ধার দিবি সমীর, হালুয়া খাবো?—দু' আনা ক'রে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে করছে—কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল ক'রে করচে—

সমীরের কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবার বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি অর্জুন চক্রবর্তী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয় না। বিনিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনার আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। দু'-তিন মাস হয়ত দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে করিয়া পটু আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পারে হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায় না—তাহার বাবা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়িতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিলে অপুর ভারি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল করিবার তাহার হাতে আর কি ক্ষমতা আছে?

একদিন রাসবিহারী আসিয়া দু'আনা পয়সা ধার চাহিল। রাসবিহারী গরীবের ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনায় ভাল নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ খাতিরও পায় না। অপুকে সবাই দলে নেয়, পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু তাহাকে পোঁছেও না। অপু এ সব জানিত বলিয়াই তাহার উপর কেমন একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে রাসবিহারীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা?—আমি কি টাকার গাছ?—দিতে পারবো না যাও।—রাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু করিল। কিন্তু অপু একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল, কক্ষনো দেবো না তোমায়—যা পারো করো।

যত্নাপত্তির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ'

সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কখনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশ রাত্রে মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জলজলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রে ভরা! .

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!...

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটীবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেডপণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দু'টি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই-তিনদিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিং-এ অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিটেণ্ডেণ্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানা-পত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে, সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনি ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি ··ভাই বোন ক'টি তোমরা?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত-আট বছর হ'ল মারা গিয়েচে।—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে?

পরদিন সকালে অপু বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল—সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল, এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনা আপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইনস্ট্রুমেণ্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেটস্কোয়ার, কম্পাসগুলাকে

বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলা বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখানো হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না, অপুও কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন।

আসন পাতা—পরোটা, বেগুন ভাজা, আলু চচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত জিনিস নাই, কেন ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায় ?…

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—মাকে বলব আর দিতে ?

—না ; তোমরা চিনি খাও কেন ?…গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না ?

—ভালবাসি নে—রুগীর খাবার—খেজুরে গুড়ের মত কি আর খেতে ভাল ?—মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লজ্জা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা ব'লে ডাকবি নির্মলা, কাছে ব'সে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে-রকম লাজুক, এ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা-কথাও বললে না—না দেখলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে!

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায় ? এমনি খামকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাসখানেক ইঁহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোশাকপরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধরণটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী, তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটা অপু কখনও জানিত না, বড়লোকের বাড়ি থাকিবার সময়ও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে-সমাজ, যে-আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরণের সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে ; সে আজকাল বুঝিতে পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের গৃহস্থালী ছিল দরিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী। শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য নয়, শুধু খাওয়া আর থাকা।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রার শক্ত আঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজের বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজিটা একটু ব'লে দেবেন দাদা ? অপু বলিল—এসে জুটলে ? এখন ওসব হবে না, ভারী মুশকিল, একটা আঁকও সকাল থেকে মিললো না!

নির্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে।

একটু পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কষা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুর কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও! আমি জানি নে, ওই তো তোমার দোষ নির্মলা, আঁক মিলচে না, এখন তোমার পদ্য মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কষা ছাড়িয়া বলিল—মিলবে না? আচ্ছা দ্যাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নেই বল—হ'ল না?

নির্মলা লাইন দু'টি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথায়ও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুষ্টুমি কর কেন? আমি আঁকগুলো কষে নিই, তারপর যত ইচ্ছা পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয়, যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে ব'লে আসবো, নির্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার ব'য়ে আনে বাইরের ঘরে দেখবো—

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না। বেশ লাগে নির্মলাকে।

পূজার পর নির্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাত-ফেরৎ—নির্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাতফেরৎ!

বাল্যে নদীর ধারে ছায়াময় বৈকালে পুরাতন 'বঙ্গবাসী'তে পড়া সেই বিলাতযাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর স্বপ্নমাখা পথ-যাত্রা।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল? এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মানুষটা—যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে!

দু'এক দিনেই নির্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছপালা? আমাদের দেশের পরিচিত কোন গাছ সেখানে আছে? প্যারিস খুব বড় শহর? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন? ডোভারের খড়ির পাহাড়? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি কি? আর ভেনিস?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া অমরবাবু

বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিস সেখানে কি আর আছে! একঘেয়ে—ধোঁয়া—বৃষ্টি—শীত। তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান-প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না।

নির্মলাকে অপুর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ি বলিয়াই হউক, বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্তভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই উদাসীনতা নির্মলার বড় বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্মলা চায় অপূর্ব-দাদা তাহাকে ফাই ফরমাশ করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনোদিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে-সেবা অযাচিতভাবে পাওয়া যাইত তাই। নইলে অপু কখনও হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটিবাবুরা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব। নির্মলা ডেপুটিবাবুর বড় মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুম-জারি করিবে? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব-দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে অযথা ফাই-ফরমাস করে না? তাহা হইলে সে খুশী হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচ্‌কাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটীবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণার রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্মলার মা'র স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্মলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি, বেশ হয়েছে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারী খুশী হয়েছি আমি—

নির্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক্ না, আর কখনও যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল—পায়ের ব্যথা-ট্যথা

আনি নে, গরম জল আনতে ব'লে দিয়ে এলাম, এমন ক'রে সেঁক দেবো—লাগে তো লাগ্‌বে —দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা?—না, তাও না?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক দিল; নির্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না। অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে।

নির্মলা বলিল—হাঁ, দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বললে চলবে কেন? চুপ ক'রে ব'সে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দোব।

পরদিন সকালটা নির্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শুনাইল। বাড়ির ভিতর হইতে থালায় করিয়া আখ ও শাঁখ-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্যমেলানোর আর অন্ত নাই! নির্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্মলাও অল্প কয়েক মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটা প্রশ্ন করে। কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটীবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা দু'ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটীবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে যে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সামনাসামনি অপু কখনো তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটীবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটীবাবুর বাসায় থাকিবার কথা এবার সে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্বজয়া ভারী খুশী হইয়াছিল। ডেপুটীবাবুর বাড়ি! কম কথা নয়! সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—ডেপুটীবাবুর বউকে মা ব'লে ডাকবি—আর ডেপুটী-বাবুকে বাবা ব'লে ডাকবি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হাঁ, আমি ওসব পারবো না—

সর্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি?—বলিস, তাঁরা খুশী হবেন—কম একটা বড়-লোকের আশ্রয় তো নয়!—তাহার কাছে সবাই বড় মানুষ।

অপু তখন মায়ের নিকট রাজী হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল, ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশী নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যই হউক খুব স্ফূর্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনও হুকুমের সুরে অপূর্বদা বলে না। সে হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশীদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তারপর চলে যাচ্চি—

নির্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন।

—তিনি মাস পরেই এগ্‌জামিন—দিয়েই চলে যাবো, কলকাতায় পড়বো পাশ হলে—

নির্মলা এতদিন সম্ভবত এটা ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল—আর এখানে থাকবেন না?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি তো বাঁচো, যে খাটুনি—তোমার তো ভাল—ওকি? বা রে—কি হলো—শোন নির্মলা—

হঠাৎ নির্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্ষ্যাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙে পড়ে ছিলাম পনেরো দিন ধরে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটীবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধুলা, রুক্ষ চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেক দিন পর সে রাণুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমত সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু করিয়াছে। বাপের বাড়ির লোক, অনেকের হয়ত বা খেলার সঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কয়টা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দু-চার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবেই একদিন রাণুদির শ্বশুরবাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প করিল। রাণুদির শ্বশুরবাড়ি রাণাঘাটের কাছে—তাঁহারা পশ্চিমে কোথায় চাকুরী উপলক্ষে থাকেন—পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহূতভাবে পটু গিয়া হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রাণুদির যত্ন কি! তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল, আসিবার সময় নতুন ধুতি চাদর, এক পুঁটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বল্‌লে না?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা। তারা আবার

একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাণুদি বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—ছ'বচ্ছর দেখা হয় নি—তা আমার আবার জর হ'ল—দিদির বাড়ি এসে দশ-বারোদিন প'ড়ে রইলাম—তোর ওখানে আর যাওয়া হ'ল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

—ভাড়ার টাকা দেয় নি?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব ক'রে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষুধ—সব হ'ল। রাণুদির মতন অমন মেয়ে আর দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভান করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাণুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নীদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দু'জনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবারে যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যর।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খ্রীষ্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—

কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেব্‌ল্‌'-খানা তুমি খুব ভালবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখচোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।—ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন। হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে অপূর্বদা, এবার পড়া ছেড়ে দেবো।

নির্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব অদ্ভুত দিনগুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু স্নিগ্ধ, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে-সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়াছে বইখানা। কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্নাভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!—ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে যায় না—তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড় কথা তাহার কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়,—অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙীন—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা? হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না! পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেকাউ-রা-গ্রানাইট পাথরের সমাধি-সিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বেকার জনহীন আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু

সিহোর নদী লিবীয়া মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর! অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি! তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসে দমকা ধূলাবালি উড়াইয়া আনিতেছিল বলিয়া অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এস এস, আজ সকালে তো তোমাদের স্কুলে প্রাইজ হ'ল—কে প্রাইজ দিলেন, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, না? ঐ মোটা-মত যিনি গাড়ি থেকে নামলেন, উনিই তো?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন? মাগো, কি মোটা?—আমি তো কখনো—পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িল এইভাবে বলিল, তারপর আপ'নি তো যাবেন আজ, না দাদা?

—হাঁ, দুটোর গাড়িতে যাবো—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এস তো—জিনিস-পত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার চিরকাল ক'রে দিয়ে এসেছে নাকি? কই, কি জিনিস আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধূলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল। নির্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো! কি ক'রে রেখেছেন বাক্সটা! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হাতুল পাতুল—আচ্ছা এত বাজে কাগজ কি হবে দাদা? ফেলে দেবো?...

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা-কথা-লেখা কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা,—বাসাটা সে আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি।

নির্মলা বলিল—এ কি? আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে তা জামা! নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওই রংটাতে—

নির্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এই রইল চাবি, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখুনি লুচি ভেজে আনবে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার গাড়ির কত দেরি?

—এখনও ঘণ্টা দুই! মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, আবার হয়ত কত দিন পরে আসবো তার ঠিক কি?

—আসবেনই না। আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন?—কখ্খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি! এই

দু'বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুঝতে বাকী নেই, আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।

—কম ?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করছে—তাড়া না দিলে সে কি আর—

নির্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু নির্মলা বাড়ির মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না। অপু স্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্মলা আচ্ছা তো! একবার বার হ'ল না—যাবার সময়টা দেখা হ'ত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাড়িতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার একটা অপূর্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানাটার মোট লইয়া জান'লার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল! এখন সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি একদিন হয়ত নীল নদের তীরে, ক্লিওপেট্রার দেশে—এক জ্যোৎস্না রাতে শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা!

স্টেশনে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার, কোন্ ফুলের। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা-রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মত জ্বলিতেছে। অপুর মন যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে···কখনো শুধুই নির্মলা, কখনো শুধুই দেবব্রত—তাহার স্কুলজীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিলম্বিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বউলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখির ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না-বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্ত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব-পুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত কিছু আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব গন্ধে-ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে, অস্তসূর্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—না-ই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম ক'রে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?…কলিকাতায়! কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে, সে শুনিয়াছে বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেশোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখের

বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক্ হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্টস্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস নুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?... বায়োস্কোপ দেখিবে.. এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া লোক হাসাইতেছে—এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর মেসে থাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁষিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরণের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ হইতে

একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া লইয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশীর সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক এক ঘরের মেজেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসীগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে—অফিসে চাকরি করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছ'টার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া যে যাঁর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্পগুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস সংক্রান্ত; তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়া শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে, ভাল ঘুম হয় না। অন্য কোথাও কোন রকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায়? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলিতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা, একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয়

আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশটাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নূতন মটরশুঁটি লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিস্ট্রি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকতা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত। —গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে

সঙ্গেই ছেলে কষিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টার পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপ-কর কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই প: .তছে হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে ওখানা লজিকের বই?

অপু বলিল—না স্যর, প্যালগ্রেভের গোল্‌ডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেন্টেজ না দিই? পড়া শোনো না কেন?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—হ'ল তো? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পালাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচে আসিলে লাইব্রেরীয়ান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের পার্বণীটা কি পাব না?

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড় কলিকাতা শহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে! হাসিয়া বলে—কাল এনে দোব ঠিক সত্যবাবু, আজ ভুলে গিইচি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন্ বাড়ি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউশনিটি হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায়? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আরও বেশী দিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই

গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতের লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চায় না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করে, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিত। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখে নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছে, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববে, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার মনি-অর্ডার—জিজ্ঞেস করবে, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবে। মাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো—ভারী মজা হবে, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবে দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টাফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হ'ল। আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী হবে। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে একসঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনেভ, ব্রেস্টেড্—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন্ শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনায় কোনও বাঁধাবাঁধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়—সে বলিল—ওতে কিছু হবে না ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনার শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরীঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই-ই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের! সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinct Animals—ই. রে. ল্যান্‌কাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us—প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ আণুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস—সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়! লুপ্ত প্রাণীকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of Science—বড় বড় নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভাল বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না যোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রুমাখানো কল্পলোক!

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ীপনার জন্য। এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না!

খুব বড়লোকের বাড়ি; দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর স্টুডেন্টদের খেতে দেওয়া হয়? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন আর খালি নেই। আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও

নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল। অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুব খুশী হইলেন। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না! এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা…!

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে, লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে,

তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয়-সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়! দূর, তা কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে-সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুরে কোন্ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে ঠাকুরবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন! অপু রাজী আছে?

রাজী? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে!…

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়, অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পায়সও পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু'বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে—পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারী বলিল—সি. সি. বি.-র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন, কি করেছে, সি. সি. বি.?

মুরারী হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া জিজ্ঞেস করবে বলেছে রোমের হিস্ট্রির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল! রোমের হিস্ট্রির বই-ই যে আমি কিনি নি!

মন্মথ আগে সেন্ট্ জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পার্সেন্টেজ যাবে যে!

প্রতুল বলিল—ভারী একদিনের পার্সেণ্টেজ। তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেণ্ট ক'রেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না?

অপু বলিল—খুব পারি! পারবো না কেন?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি. সি. বি.-র চোখে ভারী ইয়ে—আমরা বলে তাই এক একদিন সরবেফুল দেখি, তা তুমি! পারো পালিয়ে আসতে?

—এথ্খুনি। ছাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে ব'লে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস্?

—শেখাচ্ছি মানে? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু!

মুরারী বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারী pure spirit! সেদিন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদেরও কত সার্টিফিকেট আসতো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন?

—কি বাজে বক্‌ছিস প্রতুল? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্‌ছিস কিন্তু—

প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা পাইল সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেণ্ট করিয়াই আজ অপু পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁ দিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ ভালমানুষের মত নিরীহ-মুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্য দিকেই চোখ পড়িলেই হয়! হঠাৎ প্রোফেসার তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Marius justified in his action?

সর্বনাশ! মেরিয়াস কে! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেক্‌চার শোনে নাই!

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিপন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল্ মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সুল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার। মণিলালের দুর্গতিতে অপু খুব খুশী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—Rightly served! ভারী হাসি হচ্ছিল—

—চুপ চুপ—এখুনি আবার এদিকে চাইবে সি. সি. বি., কথা শুনলে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এইবার আমায় জিজ্ঞেস্ করবে—ডেটটা ভাই দে না শীগ্‌গির ব'লে—শীগ্‌গির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাদা—মেরিভেল পুলারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ো না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি একমনে লক্ষ্য করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকী। এই সুবর্ণসুযোগ। বিলম্ব করিলে···।

দু' একবার উসখুস করিয়া, একবার এদিক ওদিকে চাহিয়া অপু সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।···

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট-দুই দেরি—কাল হয়েছে কি বুঝলে ?—

অপু বলিল—যাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে গোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়েছে দরজায়—কমনরুমে বরং এস—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. সি. বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন ?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল! কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।—কোন্ সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও এক পয়সার ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে —পেট যেন দাউ দাউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত। ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো ? বললে খাওয়াবো, তাই তো আমি পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিক সরে পড়েছে কোন্ কালে।··· এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেতো—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ খিদে যা পেয়েছে।—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ ধরণের কষ্ট করিতে অপু কখনও অভ্যস্ত নয়। বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। শহরে বড়লোকের বাড়িতে অন্ত কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না। তাছাড়া সেখানে মাথার উপর ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছু আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় বালক-বুদ্ধিতে যথেষ্ট শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়াছে,—তখন সে সব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চ'ড়িয়াছে যে, কাপড় আর কেনা যায় না! ভাল কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটি টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, দু-তিনদিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তবে তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায় যে, মাত্র দু'পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মত হালকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভর্তি ঔষধ-বোঝাই প্যাকবাক্সে। রাশিকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলির পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপড়চোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল শার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে! রাত্রে ঘরময় আরসোলার উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাশির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশিকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। এক টুকরা রবারের ফিতার মতই ঘরের নোংরামিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে এতটুকু দেরি হয় না। খাওয়া-পরা-থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই, বিশেষ করিয়া একলা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-উঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই

মনে হইল—চেনা-চেনা মুখ! একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুইজনে চোখাচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা যা কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ সবল দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ-সুরেই বলিল—আরে, অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি শহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জ্যেঠিমা কোথায়?

—এখানেই, শ্যামবাজারে। আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারী খুশী হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতিমধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা ছাড়া দশ রাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, যাই তা'হ'লে, আমার ট্রাম আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে কথা বলিতেছিল, যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুইবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে সুরেশের কথাবার্তার সে-দিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

—আপনি কি করেন সুরেশদা?

—মেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাব সুরেশদা—জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আমি আসি এখন—

এতদিন পরে সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল, যে ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদার বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই!

সে চলন্ত ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা—ও সুরেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাড়াইয়া বলিল—চব্বিশ-এর দুই সি, বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টুইল শার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা ঢাকিবার জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরি হইল না। ছোট-খাটো দোতলা বাড়ি, আধুনিক ধরণে তৈয়ারী। ইলেকট্রিক লাইট আছে, বাহিরে বৈঠকখানা, পাশেই দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ি ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে লইয়া বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার, একটা পুরনো রোল-টপ ডেস্ক, খানককত চেয়ার! ভারী সুন্দর বাড়ি তো! এত আপনার জনের কলিকাতায় এরকম বাড়ি আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়া ছিল, উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল।

অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব, কখন এলে?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়িটা তো আপনাদের!—

—এটা আমার বড়মামা—যিনি পাটনার উকিল, তিনি কিনেছেন; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি? বসো, আমি আসি বাড়ির মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুরেশদা বাড়ির ভেতর গিয়ে বললেই জ্যেঠিমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল না! সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তসুরে বলিল, তারপর?...বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুরেশ পান চিবাইতেছে। খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল!

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা

কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরি? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল, তখন অপুর মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহারা ভুল করিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল!

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুণ জ্যেঠিমা তাহাকে ফলারে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন! ইঁহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সে কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই! এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন্ কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নূতন ছবি, নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসঙ্গতি মাত্র।

তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল, মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক্—

অপু মনে মনে সুরেশদাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই তো।···

সে বলিল—আমি আর মাঠে যাবো না সুরেশদা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরী করি নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জ্যেঠিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হতো—

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এসো না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়া-ছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এ সেই অপূর্ব মা—নিশ্চিন্দিপুরের হরিকাকার ছেলে – তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অপূর্ব পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথার ভাবে তাহার মনে হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সে কথা সুরেশদা বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জ্যেঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এস—এস—থাক্, থাক্—কলকাতায় কি করো?

অপু ইতিপূর্বে কখনো জ্যেঠিমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জ্যেঠিমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ী ও অগোছালো সুরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি।

জ্যেঠিমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড়? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছ?

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি—

—তোমার বাবা কোথায়?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই…

তারপর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি বাইশ তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসীদি না?…

অতসী অনেক বড় হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলিল, অপূর্ব কখন এলে?

আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইবে, বেশ সুশ্রী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে সেদিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল, মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি, কুর্শিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বড়দি দেখলাম না তো?

জ্যেঠিমা অল্প দুই চারিটা কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?…ক্ষুধা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?…

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি, আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—চা খেয়েছেন?

অপু বলিল—চা তা—থাক্, বরং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বসুন, বসুন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান।

কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহার সামনে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গো-গ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এখানেই—আর একটু হালুয়া আন্‌ব?

—হালুয়া?…নাঃ—ইয়ে তেমন ক্ষিদে নেই—হ্যাঁ, সুরেশদার বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট লইয়া চলিয়া গেল।

জ্যেঠিমা আর আসিলেন না। অপু অতসীর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরবাড়িতে খাইয়া অনেক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আজও একজন লোক সেখানে রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরকম আসে, কারখানার লোকের দু-একজন আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু-চার দিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। লোকটার পরণের কাপড় এমন ময়লা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ-ধরণের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না, জীবনে কখনো সে তা করে নাই—ইহা তাহার অসহ্য। কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না, ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়বাজারের আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে—হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল —কোথায় যান ও মশায়? আবার বেরোন না-কি?

অপু বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে—বেজায় গরম আজ…

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিছানাটা কি মহাশয়ের? আসুন, আসুন, সরিয়ে ন্যান্ একটু—এঃ—হুঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর—না—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে এখানে। মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্যদিন হয়তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদাদের কেমন চমৎকার বাড়ি কলিকাতায়। ইলেক্‌ট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরণে। চারিটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারি-

দিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় যা আছে একটেরে পড়িয়া, কলিকাতা শহরে এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরণে নাই কাপড়।···

দিন তিনেক পরে জগদ্ধাত্রী পূজা। কলিকাতায় এত উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজার, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না—অন্য কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সর্বত্র উৎসবের নহবৎ বাজিতেছে, কত দুয়ারের পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদারুর পাতার মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশের গলিটার মধ্যে একজন বড়লোকের বাড়িতে পূজা। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সারি বাঁধিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে—অপু ভাবিল, সেও যদি যায়।···কতকাল নিমন্ত্রণ খায় নাই। কে তাহাকে চিনিবে?···খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজীতে লেখা, বিষয়—'আমাদের সামাজিক সমস্যা'; বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার স্বপক্ষেই মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গি খুব ভাল, যুক্তির ওজন অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেণ্ট জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না, পাছে ইংরেজীর ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চাল-চলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন রেস্তোরাঁতে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে সকলের সামনে মন্মথর টিট্‌কারি সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজী আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবী ধরণের। কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া

সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে ; ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'Shame, shame',—Withdraw, withdraw', রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া পড়িল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে কি বলিল সভার কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন্ স্পর্ধায় বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল, তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাটিন-ভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের সত্যতা লইয়াও দু'একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। (লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)।—একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, —প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরণের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন– 'Come, come, Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the goodness to come to the point.'

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরণের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এসব ছিল না, যদিও হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল! ওসব মামুলি কথা মামুলিভাবে বলিয়া লাভ কি ? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে—ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—'নূতনের আহ্বান'। সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ,পথের যে-ছেলেটি অসহায় ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কবে এক অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রাণুদি, নির্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না রাত্রি—নানা কল্পনার টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্ধমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে—ছায়ান্ধকার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো

অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দে জীবনমায়ায়।—সে একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিস—মনে মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?...সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরণ যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যে মন গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রস-ভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ-ভরা পিপাসার্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট পালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিন কতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরণে গর্ব করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা-প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারী, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব'লে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not পুরাতনের বাণী—? অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড় খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলাও খুব কাঁপিল, কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ-বয়সে যাহা কিছু দোষ থাকে—উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজ্‌ম্, ভালমন্দ নির্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়ত সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিসটা কি পরিষ্কার হয় নাই? এত বড় সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,—টিটকারি গালাগালির অংশের জন্ত মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু'চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের

পথ ধরিল। সকলকে সংকীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ ছেলে তাহাকে যা-তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধ যে অন্য কিছুই নহে, ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছিল। সে শেষের দিকে এমার্সনের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year.'

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও-কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না বা মিথ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন? কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইণ্ডলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্স?—ও!

পরদিন কলেজ বসিবার সময় ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক-ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উল্টাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া:—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায়

করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি,
বাঁচাবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখ হীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পুরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাসিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আনিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ জননীর।

গুণমুগ্ধ

শ্রী—

ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেক্‌সন বি।

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চায় তো আরে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদরিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,—এই! সি. সি. বি. এখুনি বকে উঠবে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই!…

আঃ—কতক্ষণে সি. সি. বি.-র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে!…বাহিরে গিয়া সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে!—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায়

দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মধ্যে এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে-ই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ! তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পত্রটার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলিল,—চলুন কোথাও বেড়াতে যাই, কলকাতার বাইরে কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় এক বৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ সেকশনের ট্রেনে গোটাচারেক স্টেশন পরে তাহারা নামিল। অপু কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগলা বন। সরু মেঠো পথ ধরিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপরে দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটার নাম বড়বনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছু দূরে দারুকেশ্বর নদী! নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা।···পড়ন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরে রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশবনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝর্ণার জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি! সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা যোগায় না। স্বর্গ যেন দূরের নৈশ-কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরস-ক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক-আধদিন নয়, শৈশবের দশ দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে,—কোথাও আর ভাল লাগে না! অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া ওঠে—খাঁচার পাখির মত ছটফট করে। বাল্যের সে অপূর্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরণের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার

প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল। একবার মাঘমাসের শেষে পথে কোন গাছের গায়ে আলোকলতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতিদা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব যার মাথায় ঢুকেছে তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

পরকালটা কি জন্য যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতিদা স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এ পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতেই সে ইহার সায় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মত লোকও আছে!···সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!···

অনিল বলিল—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull, unimaginative mind; পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জানবার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই। তাছাড়া, এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop ক'রে ক'রে বেড়ায়! প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, এই একজন অন্য ধরণের, এ দলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এসব সে-ও নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে!—কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না—অপরেও যে নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায়—নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভালমন্দ লাগা, নিজের পড়াশুনা। নিজের কোন দুঃখদুর্দশার কথা বলে না, কোন ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না—জলের উপরকার দাগের মত সে-সব কথা তাহার মনে মোটে স্থান পায় না—আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে, সম্মুখের বহুদূর দিক্‌চক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুরনো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে অনিলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল। আমায় যে ভাল বলে, সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনও লুকানো রত্নকে দিনের আলোর মুখ দেখাইতে সাহস দেয়!

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের

অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে; কাঁচরাপাড়া লোকো অফিসে চাকরি করে, বেশী লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা-তা ইংরেজী বলে, হরদম সিগারেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তাহার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প, অমুক অ্যাক্ট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায় যে-রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মত গান—বিশেষ ক'রে 'হীরার ফুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায়, 'নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি' নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে?—তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভাল লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনও কৌতূহল হয় না। এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভাল। সে পাড়াগাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না; অন্তত তাহার সঙ্গে তো নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে—বেশ একা একটি ঘর হয়, একা বসে পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি। এ ঘরটায় না আছে জানলা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এই রকম নোংরা করবে—মা ওয়াড় ক'রে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে, কি বিশ্রী তেল-চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—! এবার হাতে পয়সা হ'লে একটা ওয়াড় করবো।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল: কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজ্জু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরণের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'শেনানডোয়া', অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ,—জাপানের পথে আমেরিকায় যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোশাক-পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী! কত দেশবিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এই রকম রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল, উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিয়ামা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নিবিষ্ট মনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে? হয়ত জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়ত কালিফোর্ণিয়ার শহরবন্দর হইতে দূরে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় বড়

একখণ্ড পাথরের উপর আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে?

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো— যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না; আর সে যে শৈশব হইতে শত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে, তাহা৹ কি কিছুই হইবে না?…কবে যে সে যাইবে!..কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া উঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব! কে জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয়!

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল!

Ship ahoy!…কোথাকার জাহাজ?…

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্সবি, অস্ট্রেলেশিয়া,

ওটা কি উঁচু-মত দূরে?

প্রবালের বড় বাঁধ—The Great Barrier Reef—

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাস্‌ম্যান ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তুল ভাঙা পালছেঁড়া ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান— সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিমেন্‌স্‌-ল্যাণ্ড, বর্তমানে টাস্‌মেনিয়া।..কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা!…উড়ন্ত সিন্ধুশকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড় বড় ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়ত জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ ধূ নির্জন মরুর মধ্যে…শুধুই বালি আর শুকনা বাবুল গাছের বন,… শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি…এই খর, জ্বলন্ত, মরুরৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ক্রমে সাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে?…

অপু সমুদ্র-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে লইয়া পড়িয়া ফেলিয়াছে। কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা, সিবাস্টিয়ান ক্যাবট, এরিক্‌সন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পালাইয়া দু'জনে দুপুরবেলা ক্লাইভ রোডের সমস্ত স্টীমার কোম্পানীর অফিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে, 'পি-এণ্ড-ও'। টিফিনের সময় কেরানীবাবুরা নীচের

জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজ্ছি, এখানে খালি আছে জানেন ?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন,—চাকরি ?—জাহাজে···কোন্ জাহাজে ?

—যে কোন জাহাজে —

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতূহলে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।

বাবুটি বলিলেন, জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা,—ভাখো, একবার ওপরে মেরিন্ মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। 'বি-আই-এস্-এন্' তথৈবচ। 'নিপন্-ইউশেন-কাইশা'ও তাই। টার্ণার মরিসনের অফিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড় বড় বাড়ি, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে চারতলায় উঠিয়া মেরিন্ মাস্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ, অত বড় গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি ? এসো, এসো, বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা ? বাড়ি থেকে রাগ ক'রে পালাচ্ছ ?

অনিল বলিল,—না, রাগ ক'রে কেন পালাব ?

—রাগ ক'রে পালাচ্ছ না তো এ মতি হ'ল কেন ? জাহাজে চাকরি খুঁজছো—, কোন্ চাকরি হবে জানো ? খালাসীর চাকরি···এক বছরের এগ্রিমেণ্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না···কষ্টের একশেষ হবে, গোরা লস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে প্রাণ হয়রান হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ ?

—এখন কোনও জাহাজ ছাড়ছে নাকি ?

—জাহাজ তো ছাড়ছে 'গোলকুণ্ডা'—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ডারবান যাবে—

দু'জনেই মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। তাহাদের কোনও কষ্ট হইবে না, কষ্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন। অপু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি জোগাড় ক'রে—ওসব কিছু কষ্ট না—দিন আপনি—গোরা লস্করে কি করবে আমাদের ? কয়লা খুব দিতে পারবো—

কেরানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—একি ছেলেখেলা হে ছোক্রা! কয়লা দেবে তোমরা!

বুঝতে তো পারছো না সেখানকার কাণ্ডকারখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে—চার শভেল্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিরা দড়ির মত ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট্ হাত—হাঁপ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দশ হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের স্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম কার্ণেসের মুখে! সে তোমাদের কাজ?...

তবুও দু'জনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দেখি তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটির গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিক চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশেই বাড়ি—তাহার ঘরটা হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি! অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপুর মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানালাটার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দু'বার তিনবার, চারবার কাপড় বদলাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ঘোরাফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এ-রকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো! কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল, সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার

করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিনমাসের টাকা বাকী, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাইবে?...সুন্দর ঠাকুরের কথার তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ার এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল!—আচ্ছা তো মেয়েটা? ত্থাখো কি লিখে রেখেছে—ওদের—হো-হো—আচ্ছা—হি-হি—

সেদিন আর মেয়েটিকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে! কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড় শাড়ি পরণে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য—

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য! সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-রকম যে ঘটে তাহা তো জানা ছিল না!...নানা হাসি তামাশা চলিল, সকলেই যে-ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে'। জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কব্জাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মালবোঝাই মোটর লরীগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের 'শিফ্ট'-এ মিস্ত্রীদের প্যাক্‌বাক্সের গায়ে লোহার বেড় পরাইবার দুমদাম আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দু'জনের চোখোচোখি হইল! মেয়েটি অন্য অন্য দিনের মত আজও হাসিয়া ফেলিল। অপুর মাথায় দুষ্টুমি চাপিয়া গেল। সেও আগাইয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল—তারপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা—পরে সেও আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল! অপু কৌতুকের সুরে বলিল,—কিগো হেমলতা, আমার বিয়ে করবে?"

মেয়েটি বলিল—করবো। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,—কি জাত তোমরা—বামুন?—আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—আমরাও বামুন।—পরে হাসিয়া বলিল—আমার নাম তো জেনেছেন, আপনার নাম কি?

অপু বলিল, ভাল নাম অপূর্ব, আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক—শহরের মেয়ে তোমরা—আমাদের তো দু'চোখে দেখতেই পারো না—তাই না? তোমায় একটা কথা বলি শোন। …ওরকম লিখো না জানালার গায়ে—যদি কেউ টের পায়?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, কে টের পাবে? কেউ দেখতে পায় না ওদিক থেকে—আমি যাই, কাকীমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে রোজ থাকেন?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপুর হাসি পাইল। পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই··· মেয়েটি পাগল! মেয়েটির চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেরানী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়ত মেয়েটির বাবাই, নয়ত কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এ-রকম তো হয়!

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দু'টা মিষ্ট কথা, দু'টা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাইবাবু টের পায়?—পায় পাইবে।

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে সেখানে। দোতলা বড় বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কিন্তু সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কন্‌সাল্‌টিং রুম দোতলার কোণের কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল, নিচের ঘরটাতে অন্যূন জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ঐ বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকালে, অত ছোট ছোট অক্ষরে এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সে ভাবিয়াছিল—উঃ…এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল!

কাহাকে পড়াইতে হইবে; কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোক্‌রার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমওপ্যাথিক পড়ে, টিউশনির নিতান্ত দরকার,

না হইলেই চলিবে না, সে না-কি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়। পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে ?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অপুও ভাবিল সে উপরে যাইতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত।—তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব। লোকে কি করিয়া যে করে। প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল, কত বড়লোকের বাড়ি আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাহাদের কত দিকে যায় ? কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এ-সব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরী করিবার, মিথ্যা গর্ব করিয়া বেড়াইবার একটা কু-অভ্যাস। তাহার মায়ের নির্বুদ্ধিতা এইদিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবিকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক-আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও কিছু বলে না। পাছে ভাবে গরীব।

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাহে আপ্‌লোক উপরমে যাতে হেঁ বাত্ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া মুশ্‌কিল—। অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন। সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা, টিউশনি তাহার চাই-ই। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, 'ম্যাট্রিকুলেশন-ফেল টিউটার দিয়া তিনি কি করিবেন ? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সসঙ্কোচে বলিল,—আপনাদের কি একজন পড়াবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না। আসলে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালমানুষ সাজে নাই—অপরিচিত

স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা স্থাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ ?—ও, আই-এ পড়ছেন,—দেশ কোথায় ?…ও।… এখানে থাকেন কোথায় ?—হুঁ !

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে —অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন্ তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো—বল্‌গে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী, সুন্দরী, বড় বড় চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর, রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথার চুল এত ঘন যে, দু'ধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে—জাপানী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা !

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এইবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ, এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলেমানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি বসো মা—

টিউশনি জোটার আনন্দে যত হোক-না-হোক, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাইল, ও ক্লাসে, পথে, বাসায়, হোটেলে—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্বোধের মত খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল, ইত্যাদি।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুরের নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত ! কথাবার্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল ক'রে আনবেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি ! একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ৎ তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্ দিন পড়ানোর কোন্ ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকুরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল !

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া

দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই একটু চোরাবাজারে, একটা ভাল অপেরাগ্লাস কাল দর ক'রে রেখে এসেছি—নিয়ে আসি।

চোরাবাজারের নামও কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক্ হইয়া গেল। নানা ধরণের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান, বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল ছ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় রেকর্ড! এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত শৌখিন জিনিসের এত কম দাম।

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাকবো, ওরকম গোয়ালঘরে আর থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। প্রথমেই সে কালকার ফুলদানিজোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আয়না, ঝুটা পাথর-বসানো ছোট একটা আংটি। ছেলেমানুষের মত আনন্দে শুধু জিনিসগুলিকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু'একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিলল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস এ-রকম আলোর দাম পনেরো-ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ি থাকিবার সময় সে এই ধরণের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশীর সহিত কিনিয়া ফেলিল! মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাড়িয়া, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙাইল, সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্-ঝকে করিয়া রাখিল। টেবিল ল্যাম্পটা পরিষ্কার করিয়া, বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল-ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারিদিকে খুশীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়লোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পর্দা, ফুলদানি, টেবিল-ল্যাম্প সব!—এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মত বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল এমন কি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুর্‌রে!—আরে আমাদের অপূর্ব এসব করেছে কি! কোথেকে বাজে রাবিশ এক পুরনো পর্দা জুটিয়েছে খ্যাখো। এত খাবার কে খাবে?

অপু নীচের কারখানার হেড্ মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড় লোহার চায়ের কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার স্টোভ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলালেবু; সিঙ্গাড়া, কচুরী, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ির কথা তুলিল—মস্ত দোতলা বাড়ি নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক্ লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান্ শুইয়া পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো!—হাঁ ক'রে আছি—

সতীশ বলিল,—হাঁ হে ভাল কথা মনে পড়েছে! তোমার সেই জানালা কাব্যের নায়িকা কোন্ দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?—

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত স্বরে বলিল—না না ভাই, ওদিক যেও না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্যন্ত তাঁহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া ওঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড় বিঁধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে-নতুন-কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশীর সহিত বলিল,—এটা খ্যাখো তো কেমন হয়েছে? কত দাম হবে! মন্মথ দেখিয়া বলিল,—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি···দূর!

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না! মন্মথ ইতিপূর্বে অপুর পর্দাটা দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরী নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরী হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

—শুধু এমারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বৈ তো নয়? এটা কর্নেলিয়ান—চেনো কর্নেলিয়ান? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালই জানে অপুর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান্ নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্মথর কথার প্রতিবাদ করিয়া মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্তার অপুর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান্ ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুশী, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পরে অন্য সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পরে অনিল ভর্ৎসনার সুরে বলিল—আচ্ছা, এসব আপনার কি কাণ্ড? (সে এতদিনের আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনলেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে।

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভাল থাকতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে, আর মিথ্যে এই সব—সে যাক্, এই দামে পুরানো বইয়ের দোকানের সে গিবনের সেটটা যে হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এই ভুয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরানো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেতো! আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্নের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হ'ত, মেম বিক্রী ক'রে ফেল্‌ছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দু'জনে কিনে রাখলে ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ হ'ত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেকদিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল—এ টাকায় ইহা অপেক্ষাও সস্তায় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সত্য—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরানো বাজারের এ-সব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুশীর সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আর বেশী আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিরক্তি চাপিয়া গেল।

অপু বলিল—হুল্লোড়ে প'ড়ে তোমার খাওয়া হ'ল না অনিল, আর খানকতক কাঁচা পাঁপর ভাজবো?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল—তবে চলো, কোথাও বেরুই—গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে।

অনিলও তাই চায়, বলিল, দেখুন অপূর্ববাবু, উনিশ কুড়ি একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের লোকে পর্যন্ত কি রকম গলির মধ্যে বাড়ির সামনেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল, কোথাও বেরুনো নেই, শরীরের বা মনের কোনও অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, আসনপিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠী বুড়ি সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব,

কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিশ মাছ কিনেছে সেই সব—ওঃ হাউ আই হেট দেম্! আপনি জানেন না, এই সব র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত করতে পারি নে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই, তোমার ও-গড়ের মাঠে আমার মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফট্ ফট্ আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি—নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর না-ই বা তুললাম!

—কাল আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়! বুঝতে পারবেন একটা জিনিস—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, ফিয়ার্স লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে এমন আনন্দ হয়! এমন মন! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয়, সত্যি!

অপু এখনি যাইতে চায়! অনিল বলিল, আজ থাক্ কাল ঠিক যাব দু'জনে! দেখুন অপূর্ববাবু, কিছু যেন মনে করবেন না, আপনাকে তখন কি সব বললাম ব'লে। আপনারা কি জন্যে তৈরী হয়েছেন জানেন? ওসব চিপ ফাইনারীর খদ্দের আপনারা কেন হবেন? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এ সময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশ-সেবক—এঁরা তো কিছুদিন পরে সব কৌত হবেন, তাঁদের হাত থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না, যারা এখন উঠছে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব কিছুতে, নতুন দল যারা উঠছে, বিশেষ ক'রে যাদের মধ্যে গিফ্ট্ আছে, তাদের কি হুল্লোড় ক'রে কাটাবার সময়?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিয়া।

পরে দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটি-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসীদি'তে দেখিয়াছে!

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল। পকেটে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা

চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির! সঙ্কুচিতভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম—কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া .ার্থ-ডে গিফ্‌ট্ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো।—এখানে আর চলবে না।

কি একটা ছুটির পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, কাল যে আসেন নি?

অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসি নি।

প্রীতি ফষ্ট্ করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দু'জন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন্ ক'রে রাখলে পাঁচটা অবধি।

অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনীঠাকুর তো নই, প্রীতি! কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্য ভাবলাম আর যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমার সেই রকম মাস্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাকবেন। আমি কাল থেকে আর আসব না বলে যাচ্ছি।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে হইল—দেওয়ানপুরের নির্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়িতেও সে প্রাইভেট মাস্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ির ছেলের মত—নির্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্মলার মত মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্ সে সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড় ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া কি নাকি দেশের কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল, সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভার ভার। দু'তিন মাসের টাকা বাকী, পাওনাদার আর কত দিন শোনে? আজ সে স্পষ্ট জানাইল, দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে পাইবে না। বলিল—বাবু, অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই কুট্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি বলে আমি কিছু বলছি না—দু'মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। বাবু আর পারবো না, আপুনি আর আসবেন না—আমার জাত একজন ভদ্দনোকের ছেলে খেয়েছে ভাববো, আর কি করব?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে

অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টিউশনিটা ছাড়িয়া দেওয়ার পর আজ দুই-তিনমাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকী আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী!—মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, আর প্রীতির টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা!—দশ মাসের বেতন ছ' টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী। কোন দিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড় করিবে? হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেও ইয়ারে উঠিতে দিবে না, সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনের বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়। কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার ছুতার-মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছ'য় পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু—নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল ব'লে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল।

থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছ্‌লিকা তরকারী হম্ নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজি—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?—ও শুধু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দাও না বহু? রোজ রোজ আলুভাতে ভাল লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণে যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম্ তো হামারে লেড়কাকে বরাবর হোগে বাবুজী—ইস্‌মে ক্যা হাঁয়?—

দিনকতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছালাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে! মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না, মা আজ দু'দিন উপবাস

করিয়া আছে, এই-সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছিলেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কি ভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাব-গুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, দু'খানা ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানী পর্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিত—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল-পার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না, গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না!

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিনদশেক—তারপর কূলকিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র। ...তখন কি উপায়?

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী-বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাস-পোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন।—আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক-আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু, তোমার সাবানের বোল্ একটু

দেবে, আমি এ ছুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে দেবো—দেবে? ..

তেওয়ারী-বধূ বলিল, দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা বহু কি ভালো লোক!—যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী-বামুন আনাইয়া জায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা তেমন সাহায্য করে না, দেখে-শোনে না। মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে, এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুনভাবে সে জগৎটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা' কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আলমারীভরা লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল—নক্ষত্র জগৎ...কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্‌স্, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোন খেয়াল থাকে দু'দিন, কোনোটা আবার একমাস। তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়লোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরী গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এত দিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল একটাকা তিন আনা।

পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল—সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত! দিন সাতেক পর্দা-বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়, তারপরই যে-কে সে-ই! আর পর্দা নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে, ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে, সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু'একজন যাহারা জানে—যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোলা কি অড়হরের ডাল আছে, বহু? আজ আর ক্ষিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা ছুটোর সময়টা!···পেটে ঠিক যেন বোলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়ত বা এতদিন না খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?—গোটাকতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাততঃ

পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকেই সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড় তেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্নিসে একঝাঁক পায়রার বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুঞ্জাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাকছে—ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ; এক্সিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই—sorry—এস, এস, ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল, এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার।—অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটাকতক টাকা ধার দিতে পার ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি?—না না, বোসো, চা খাও—দাঁড়াও, আমি আসছি—

ঘিয়ে-ভাজা চিঁড়ে, নিমকি, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্ ঝিম্ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্—হাউ য়্যাব্‌সার্ড। তা' কি কখনও আমি—দূর!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জ্যেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা—সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলে নি—বললে কি আর খেতে বলত না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ!—

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ি গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড় দুর্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা

লইল, জ্যাঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্ত তিনি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্ত অতসীদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের গামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই, সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এস. রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সেখানা সুরেশের বিবাহের! সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল; জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্তমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা' এসো—থাক্, থাক্—আচ্ছা।

ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল—সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না!—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ ভাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিকদূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বলতাম, জ্যেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হি-হি—তাহলে কি হতো!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দু'বার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, দেখা পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুর চীৎকারের সুরে বলিল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন'দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষট্টি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্ছেন, আজ খাতা মহরৎ—না দিলে হবেই না ব'লে দিচ্ছি।

অপুর দোষ—লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে আট-নয় দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দুবিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনি বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুল—আপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক—দশ টাকা মাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুলঘরটার, দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল! যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা—তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথকঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছে—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!···

কিন্তু এখানে তো কোনও কিছু আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?···

পথে একটা মাড়োয়ারীর বাড়িতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়িগাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর স্টুডেন্ট—সারাদিন খাই নি—তবে খেতে দেবে না?—ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?···

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া একথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।...

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে? কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও, বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু'বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—

কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদের উপর বসিল। একখানা খাপ্‌রা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা দেখি দিকি কোন্ পিঠটা পড়ে? পরে, নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যে দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌রাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু'বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে আর তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামের ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল, সায়েন্স সেক্‌শনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারী ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান্ বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনও ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মত সব সময়ই যেন প্রশ্ন ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্ত্তা?

অপুর সহিত এইজন্যই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের। অপুর বাংলা ও ইংরেজী লেখা খুব ভাল, কবিতা-প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্ত্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন, আই. এস্‌সি.-টা পাস দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স।

—কেম্‌ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্ আছেন—এঁদের সব দু'বেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—বুঝ

থামলে জার্মানীতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গয়টে, অস্টওয়াল্ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব?

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। না-হয় দু'জনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করব দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়াভরা, সঙ্কীর্ণ, ড্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এসো একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত? এসো, আমরা কখ্‌খনো কেরানীগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনও—ব্যাস্…পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা করব জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' ব'লে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় নি, সে-সব এত দূরে—মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকো ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হ'ত মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন, সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy বুঝলে? একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে দু'জনে স্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল,

পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসীর বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনরূপে হউক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লাল রংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাক বাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এই জন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পা-খানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে, অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না।···হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল···চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথার লাগিতেই মাথাটায় একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল—হৈ হৈ, বহু লোক—কি হয়েছে মশায়?···কি হ'ল মশায়?···সরো সরো—বাতাস করো···বরফ নিয়ে এসো···এই যে আমার রুমাল নিন না···

অনিলের দু'টি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিকষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল—রি—রিপন কলেজ—অপূর্ব রায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গনেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তীক্ষ্ণ বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে—পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ধোঁয়া ধোঁয়া···

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক-পরা দু'জন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন্ হাসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার?···তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সতোন ও চার-পাঁচজন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স

গাড়ি আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া···স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া...তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।···

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়া ছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন ?

অনিলের মা বলিলেন,—তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন !

অনিল বলিল,—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন ?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিছিমিছি ? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—ব্যস্ত-সমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল—সত্যেন বলিল—ওঃ, তোমাকে দু'বার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাসপাতালে এস—জান না ?...

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মারা গিয়েছে এই সাড়ে ছটার সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেঝেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন-ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইবো না, কলের জলে সকালবেলা নাইবো। কলকাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মত লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিতেছেন ! অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগে নি তো ?···কোনও কষ্ট হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেস্‌টা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিল, সে ঘাটের ধাপের উপর

বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জলজ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুষড়াইয়া পড়িল। কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোন কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ-স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যাক।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলি দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু স্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক. সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—তুমি কি ক'রে জানলে? পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ ক'রে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!···

ভদ্রলোকটি ভারী খুশী হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন,—ত্যাখো কোথায় ব'সে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হ্যাম্পস্টেডের একটা বোর্ডিং-এ ব'সে লিখতাম, আর বাংলার এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ-বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল! মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন—দেশের যুবকদের চাসবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্য-জীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয়, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!···শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে···সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বড় বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা-ঠাক্‌রুণ ?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারে সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল,—এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু—

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়ীমা, কাল কি ?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো!

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল ; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আটদিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস ?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল,—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে ?

—মুগের বেশী, মসুরীরও করে, থাড়ি মশুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি ?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা।

প্রীতির টুইশানি কোন্‌কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিয়া—হ্যাঁরে, তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কি ব'লে ডাকিস ? খুব বড়-লোকের মেয়ে, না ?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে-শুনতে বেশ ভাল ?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না ? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হ'ল বড়লোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা !

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়।

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই ভাখ, এই দু'খানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভালো, না ?...কত বড় বাটিটা ভাখ।

অপু ভাবিল, মা যা ভাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখতো !

কলিকাতার সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক-একদিন দিদিও —সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে, কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এসো দু'জনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনো কোনো মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান সেখানে হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্টি কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক-আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না ?…দু' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে ? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি ; রাঙা ঠোঁটের দু' পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, অবদার, গলায় সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে,ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত! এক ছেলে ছিল তাই কি,শত ছেলেতে কি হয় ? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাই নে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া ক'রে দিও।

সর্বজয়ার জীবনের-পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনো কোনো দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজী বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দু'জনে নানা পরামর্শ করে ; সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার…

তারপর অপু বলিল,—ভালোকথা মা—আজকাল জ্যেঠিমারা কলকাতার বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি ?.. তোকে খুব যত্নটত্ন করলে ?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে,—আমায় একবার নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখি নি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি দুদিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন ক'রে আসি তা হ'লে ?…

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব ; সেও সেই পুজোর সময়।

সর্বজয়া বলে,—একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্ত সাধ, সামান্ত আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্তও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বং বলে,—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত রকম সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি ?

সর্বজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। বলে,—হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে ?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না—বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি ক'রে থাকব মারা গেলে ?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা-ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে। একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ। পুরানো বাড়ির দেয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কণ্টিকারীর ঝাড়। একটা জায়গার কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরণের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরণের গভীর বিষাদ···মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা,তুচ্ছ সাধ—কত নিষ্ফল।···মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে ?—কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া।···নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান···

এক ধরণের নির্জনতা···সঙ্গীহীনতার ভাব...মায়ের উপর গভীর করুণা...রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে...সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচ্‌-মিচ্‌ ও ঝটাপটি করিতেছে।···

অপুর চোখে জল আসিল···কি অদ্ভুত নির্জনতা-মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড় বোয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে—বলো না—বললে না তো সেদিন ?···

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের

ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—মা ! ..

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে,—তুই !—যাওয়া হ'ল না ?

অপু হাসিমুখে বলে,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্বে কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দু'জনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিতসুরে বলে,—হাাঁ, আমার আবার গল্প !···সে সব ছেলেবয়েসের গল্প—তা বুঝি এখন শুনে তোর ভাল লাগবে ? অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে···এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু, এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে···অপু বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে,—তা আবার কি শুনবি —তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল—কত ভালো গল্প তো পড়িস ? ··

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে ! দু'তিনবার বেশ ভাল করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে, পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী !

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিনদিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিস-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা ! কত রোল ?···পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ছাখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু' মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো ?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়।

দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টাদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জলজল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই, ..

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত একটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকে শত শত বিকটাকার পাখী ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ ঝাপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেন কোন মতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারে কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোন কষ্ট দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি তো একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বিদ্যে চাইছি—আমার এর উপায় ভগবান ঠিক ক'রে দেবেন—। তাহার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ান-পুরের হেডমাস্টার মিঃ দত্ত। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃস্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। হয়ত বা তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এসকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তার ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেয়ারাফুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে

কলিকাতায় নূতন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলেপড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুটির ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে মেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট কি খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল। একদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও তো···

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চার পয়সার বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজ পিছু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা ধার দেয়। সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না! ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী-বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দু'টা মাত্র টাকা বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল···বস্তুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত স্বাদে, আহা কি ভালো লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে! সেখানে কাগজ-বিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়ালাদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা তো দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ, নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃতবাজার?

কলেজে যাইবার পূর্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলি এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা অনেকটা কমিল, ট্রামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই তাহার নিকট হইতে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজ লাইব্রেরীতে সে বসিয়া আছে, হঠাৎ হলে খুব হৈ-চৈ উঠিল।

গিয়া দেখে কোথাকার একজন ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই চুরি করিয়া পালাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়িতে খাইতে যাইতেছিল। ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের দত্তবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল, শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দু'জনে এক গাড়ি-বারান্দার নীচে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড় দয়া হয়। সে নাম জানিত, মেট্রোপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ি আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের শার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্যন্ত ছেঁড়া। অপুর চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক্—এসো—এই বাদামভাজা—

পূজা পর্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—ডেওয়ারী-বৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহা থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতে পারিবে না। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই তো, এত টাকা—এ তো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে। মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরিতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রফেসারদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষার ফি-এর এক পয়সাও জোগাড় হয় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দু'জনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্বকে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় কারখানার ম্যানেজারের নিকটে গেল। এই মাসতিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা

করিতে পারে। এর-ওর-তার মেসে সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে, তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পার? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টর, তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় ক'রে রাজী হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন-চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়িতে গেল, দেখা পাইল না,—বড়লোকের গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। মিঃ লাহিড়ী বাড়ি নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কামরা, অনেকগুলা বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চকমিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরণে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ি, ব্লাউজ, ঢিলে-খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে!··· নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা!

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে পেরেছেন তো দেখছি? আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পর—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পর কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও একধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হ্যাঁ তা—তো—তোমাকেও দেখলে চেনা যায় না। অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দু'দিন দেখেছি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়িতে উঠছি, দেখি কে একজন গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে ব'সে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন—আবার কালও দেখি ব'সে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানলা দিয়ে দেখি আজও ব'সে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি···তখনই ঝাকে

বলেছি, মা আসছেন—কি করছেন কলকাতায়? রিপনে?—বাঃ, তা এতদিন আছেন, একদিন এখানে আসতে নেই?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে, দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল,—কি ক'রে আসব? আমি কি ঠিকানা জানি?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি ক'রে এসে পড়লেন?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন? বেশ—আপনার বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরানী, কিন্তু বিধবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বৌরানী বলিলেন—এসো বাবা এসো, লীলা কালও একবার বলেছে, কে এক জন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই অপূর্বর মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব—তখুনি আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো, দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভাল আছ বেশ? তোমার মা কোথায়?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বৌরানীর কথায় কি আন্তরিকতার সুর! যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে—অপু বলিল—ইয়ে, তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা তো, এই তিন বছর হ'ল—এটা মামার বাড়ি—

অপু বলিল—ও! তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন।—মানে উনি—না?···মিঃ লাহিড়ী কে হন তোমার?

—দাদামশায়—উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্‌টিশ করেন না—বড় মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন আজকাল। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড় মামার মেয়ের নেম্-ডে পার্টি, সামনের বুধবারে। এখানে বিকেলে আসবেন অবিশ্যি অপূর্ববাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিন্তু ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ববাবু'!—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?··· সে লীলা কি তাহাকে 'অপূর্ববাবু' বলিয়া ডাকিত? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা!··· আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ-বৌরানী সম্পূর্ণ

পর হইয়া আজ তাহার বিষয়েতে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা করিয়াছেন ?...

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই! কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলিবে কোনও কালে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারের পার্টির জন্য সে টুইল শার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা—!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পার্টিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতা শহরে এ রকম ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুশীই যে হইবে!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্‌শন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, ও শখের ব্যাপার নয়—ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট্ মাস্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙল কিনলে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোশাক-পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একথার কোনও ভিত্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হ'লে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেশন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারী—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনও শিক্ষিত লোক কখনও ওসবে যাবে না?…কারণ ইট্ ইজ্ নট ব্রেড্ ইন্ হিজ বোন্? অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজে একজন আইরিশ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়ছে, ব'সে কি লিখছে—নয় তো ভাবছে—ডিগ্রী নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়—গবর্ণমেণ্ট হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্দ্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে টাইট্‌ল হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একর জমি, ভাবুন কতদিনে—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ওসব মর‍্যালিটী, আপনি যা বলছেন, সেকেলে হয়ে পড়েছে—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈরি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিডুয়ালকে প্রোটেক্‌শান্ দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু ব'লে কোনও কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়?…ধরুন যদি—

অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরত দলের মধ্যে এভাবে। নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। সে অতীব খুশীর সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্বেলের বড় ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী আয়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপদানী। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া টিপিয়া দেখিল। তাহা ছাড়া এ-ধরণের কথাবার্তা—এই তো সে চায়! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামুজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ-ধরণের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ-মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ-ধরণের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে সে-ও তো একটা আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাঁস-নে চশমা-পরা যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ-করা ব্যারিস্টার। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ—কি কথায় সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ স্টীম থাকে, চলে—যেই কলকব্জা বিগড়ে যায়, সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ-বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ী, কতকটা মরীয়ার মত আরক্তমুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি ?

—আমি এবার আই-এ দেবো।

পাঁস-নে চশমা-পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল,—ইউনিভার্সিটির আরও দু-ক্লাস পড়ে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না ?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া না লইত যে, সে এ-সভায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং উহারা দয়া করিয়া তাহার এখানে উপস্থিতি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্রভাবের প্রত্যুত্তরে হয়ত তাহার রাগ হইত—কিন্তু সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়!—রাগ করিবার মত ভরসা সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তার অত্যন্ত লজ্জা হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢাকিবার জন্য সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একথা বলতে পারি কোনও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনও কলেজের হিস্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমার সঙ্গে।

নিতান্ত অপটু ধরণের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধঘণ্টা থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা নিজেদের মধ্যে করমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল, বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যই অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ, না বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে ? সে জানত অনিল...

সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল,—মা, অপূর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন!

লীলা বৈঠকখানায় ব্যাপারটা না জানিতে পারে ..

একটি ছোট আট-নয় বৎসরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই?

লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না, অপূর্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান!—

খাওয়াটা ভালই হইল। তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল—আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? একটা দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের অসুখ, হস্তাক্ষর তেলি-বাড়ির বড় বৌয়ের।

সন্ধ্যার সময় অপু বাড়ি পৌঁছিল।

সর্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে, পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিরদিনের গৃহিনীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা।

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভাল আছে তো?

সর্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটা-কতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্বজয়া ভারি খুশী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট প্রথা। কমলালেবুগুলা দেখাইয়া বলে—কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় ছাখো—লেবুগুলো দশপয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবু-ক'টির দাম ছ' আনা।

সর্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সার এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু' পয়সায়—ভাখো মা—

সর্বজয়া ভাবে—এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা উঠায় না। ভাবে, মা মনে মনে দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?···দরকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সামনে বলে না, যাহা কিনা মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে।

দিন-তিনেক সে বাড়ি রহিল। রোজ দুপুরে জানালার ধারের বিছানাটিতে সর্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পলতেমাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়! ছায়া পড়িয়া যায় বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে আবার একটা বিপুল নির্জনতা ও সঙ্গহীনতার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের ছুটির দিনের মত।

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করেচি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সর্বজয়া রাখিয়া দেয়—একটা হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, একটা পাত্রে আচার। অপু চিরকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঁড় হাঁড়ি খুঁজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুরি করিয়া খায়! এ কয়দিনও খাইয়াছে। সর্বজয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, টের পায় না—সেদিন দুপুরে অপু জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—গায়ে মায়ের গামছাখানা। হঠাৎ সর্বজয়া চোখ চাহিয়া বলিল—আমার গামছাখানা আবার পিষচো কেন?—ওখানা তিলে বড়ি দেবো ব'লে রেখে দিইচি—কুণ্ডুদের বাড়ির গামছা ওখানা, ভারি টন্‌কো—আর সরে সরে তাকটার খাড়ে যাচ্চ কেন?—ছুঁসনে তাক—তুমি এমন দুষ্টু হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছুঁয়েছিলে তাকটা?

কথাটা অপুর বুকে কেমন বিঁধিল—মা সেরে উঠে তিলে বড়ি দেবে? তা দিয়েছে। মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আমসত্ত্ব চুরি করিয়াছে···মা, অসহায় মা বিছানায় জ্বরের ঘোরে পড়িয়া ছিল···একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও···

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুজলের ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া...। ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে.. বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি...দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া-বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হলেই সেদিন...

বিবাহ...মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল...তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু...কাঁচের পুতুলের মত রূপ...প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদমা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।—কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদমা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক্-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'-তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে,নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে... একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ...চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।...খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর খুট খুট্ করিতেছে। সর্বজয়া ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আনলে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল...দুর্দমনীয় ভয়...সারা শরীর যেন

ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে…পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে…না—পায়ের দিক হইতে না—হাতে আঙুলের দিক হইতে…কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না?…হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল,না—পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়—তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল…চীৎকার করিতে গেল…খুব…খুব চীৎকার, আকাশফাটা—অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না…গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে…কেউ আসিল না তো?…কিন্তু সে তো বিছানা হইতে… বিছানা হইতে উঠিল কখন?…সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড় একটা কালো মাকড়সা শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ…অসাড়…হাতও নাড়ানো যায় না…পা-ও না…সে চীৎকার করে নাই . ভুল।…

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে…একজনের কথাই মনে হয় অপু…অপু…অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না…অসম্ভব।…বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে! —এতক্ষণ তো টের পায় নাই! ..আশ্চর্য।…চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে! ‥

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না…কেমন একটা আনন্দ…আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে…টুপ…টুপ…টুপ…টাপ…। আবার কান্না পায়…জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?…সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল…বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল…অপু দাঁড়াইয়া আছে।…এ অপু নয়…সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু…এতটুকু অপু…নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িতে যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে…সেই অপু ওর ছেলে-মানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি…চুল কোঁকড়া কোঁকড়া…মুখচোরা, ভালমানুষ লাজুক বোকা, জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না…কোথায় যেন সে যায়…নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে…বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে…যায়…যায়…যায়…যায়…মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায় ‥

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে।…কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে‥ এতই সুন্দর…

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!…

পরদিন সকালে তেলি-বাড়ির বড়-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে, বড়-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকরুণের অসুখ খুব বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর সর্বজয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিল না, নড়িলও না। বড়-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস . একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস···অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই! গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে। বাড়ি পৌছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিল···ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ি ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতেই অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে···মা মারা গিয়াছে এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই···একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই···কিন্তু পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা···মা নাই! মা নাই! ···বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা, কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা-রোদভরা আকাশটা। . অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।...

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল...সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের কাঁথা, নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা, কল্কা-কাটা রাঙা সূতার কাজ।···কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড় ছেলে নাদুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি ?…

নাড়ু বলিল—কখন এলে, এখানে বসে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিস-গুলোর কি ব্যবস্থা। চাবি দিয়া নাড়ু চলিয়া গেল। বলিল,—ঘর খুলে ছাখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—শূন্য তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল—ঘরের মধ্যে কে ?—খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই ?—কৈ, কেউ তো বলে নি!…

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি ?

—কোথায় ?…পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড় বৌকে বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল…সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধ'রে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন ?…তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা ক'রে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনবো না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি ? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই। নাড়ুও তো ছিল—কৈ কোনও কথা তো বলে নাই ?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবীতে আখ ও ফলমূল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় দিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না ঘেন্না করে…কিন্তু আজ নিরুদির হাতে খাইতে তাহার দ্বিধা রহিল না…প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো!…নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যের সময় নিরুপমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ঘুঁটে পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু না—নিরুদি ?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি, ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার ঝাঁপিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই-করা খানদুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নখ কাটিবার নরুণটা, পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে ...যে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে পারে যাহা খুশী ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে মুক্তি চায় না···অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না—ফিরে এসো মা···ফিরে এসো···

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না···মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সামনে গোলদীঘি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড় মোটর-গাড়িতে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!—ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙাদি, বড়দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন! অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়, বাসা হইতে ফুটপাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোল-দীঘিতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত—যে কোনও জায়গায়, যে কোন জায়গায়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটি কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি? —কি হইবে এখানে শহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে?

কিন্তু পয়সা কৈ? তাও তো পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃ-শ্রাদ্ধের দরুণ, নিরুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড়-বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক

পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্তভাবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ!

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহূর্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত-নিরাশ্রয়ঃ?

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস, অবসাদ, শোকের পর এ মন্ত্র অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই কর, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েছে, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়ত জ্যাঠাইমা মায়ের সম্বন্ধে দু'-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন—।

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক স্ট্রীটে তাহার অফিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক স্ট্রীটে।

টেবিলে একরাশ ছাপানো ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া রিক্রুটিং অফিসারকে বলিল—কোথাকার জন্য লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্ম। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর মিস্ত্রী?

অপু বলিল সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ—কি কেরানীগিরি—

সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ-জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগন্যালার, স্টেশন মাস্টার সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন

ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, সামনে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দু-তিনটি অপরিচিতা মেয়ে। লীলার ছোট-ভাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপূর্ববাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে আর দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি? শরীর—মাথার চুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু তো হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই। ফাল্গুন মাসে মারা গিয়েছে।

কথা শেষ করিয়া অপু আর এক দফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্ত ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল ধীরে-ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোরে চাড়া দিল, এক মুহূর্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে-পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও-রকম বললে হবে না! এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না? অন্ততঃ মাকেও বলা তো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মত করবেন না, কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো কি—ভুলবেন না, কিন্তু—

গাড়ি চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতা স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায়, এই কাপড়ে, এই ভাবে। থাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর তো কাহারও পত্র সে পায় নাই। কে পত্র দিল? পত্র খুলিয়া পড়িল :—

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসতে বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক তোলাপাড়া করিল। কি লাভ গিয়া? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান, যে ওদের বাড়ি যখন-তখন যাইবে? মেজ-বৌরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজ-বৌরানী কি তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন? তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বধূ! তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-দুঃখ শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়িতে চড়িয়া কোনও ধনীবধূ—হউন তিনি স্নেহময়ী, হউন তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার কোথায়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম, বাংলাতে সকলের মধ্যে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাইতে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জ্যাঠাইমার কাছে যাইবে? গিয়া জানাইবে জ্যাঠাইমাকে? কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ার।

দশম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি. এ-র ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু'বছর মিছিমিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন। তা ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকুরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেকদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দু'বেলা—কোন মতে ইক্‌মিক্ কুকারে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী তো অনেকদিন-আগে-দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু ঘর-ভাড়া, কাপড়জামা, জলখাবার, এসব চলে কিসে? তাহা

ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ানো বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যায় কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই!

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়ার ড্রাগ স্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিন কতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড় দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড় জমিতে শুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্যে লোক চাই। খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দেড় ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতত পনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার—সে-সব আপনাদের কলেজের ছোকরার কাজ নয় মশায়—আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই!

ইহার দিনকতক পরে আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙালী ফার্ম। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল-ফাঁপানো, টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রি-করা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নিচের দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূলভাব, এমন ধরণের চেহারা ও চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপুর নিজেকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাকরি খালি দেখে আসছি!

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল, অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদের বাড়ি বর্ধমানে থাকিতে। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপ রাইটিং জান? না?—যাও যাও, এখানে হবে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা

বলিলেন— ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা ক'রে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হ'তে পারি নে ?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি ? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালি করিতে বাহির হইয়া প্রথম দিন-চার-পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল ; কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—বোল্টু আছে ? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ ? অপু বোল্টু কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোল্টু এ-দোকান ও-দোকান দিন-চারেক বৃথা খোঁজা-খুঁজির পর তাহার ধারণা পৌঁছিল যে, জিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় ক'রে আড়াই শো ফুট ? যান না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানীর অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। আফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল···মাল আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো ?···

এ কথার মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারি দিতে রাজী নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাও্ স্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানী কিন্তু গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানে ডেলিভারী দিবার কথা ছিল,তবে গাড়ি-ভাড়া কিসের ? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, না-ই বা হইল বেশী লাভ।

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা ?

—সে কি মশাই, আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি ? তা কখনও হয় !—

অপু জানে না যে,প্রথম দর দিবার সময়ই তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম,সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়ীপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার

পাইপওয়ালার গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল বলিল—হামারা ভাড়া কৌন দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু আফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেছেন—কাজ তো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ ক'রে আপনার পোষাবে না! আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন?—বড় মেশিনারির দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচ-শো সাত-শো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানি নে তাই, তা যদি জানতাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে··· নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে জুটেছে,—এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখবো।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না···একদিন দালালটি তাহাকে বলিল—ছুটোর পর আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাবু? যান কোথায়?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—ছুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেও, দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়, সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ—তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুঁটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ' হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম—রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের, যব-গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকাল সন্ধ্যায়

যাপিত হইয়াছে—তাহাদের সুখ-দুঃখ আশানিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের লেখা পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক পুত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃণ্ময়পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মানুষ, মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস!

আর একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিক্‌টা। কোথায় তাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায়-না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশী—পড়াশুনা করার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে। তা ছাড়া এ সব জায়গার আবহাওয়াই তাহার ভাল লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি,...শুধু টাকা...টাকা . টাকা সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাবে ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপু ভয় খাইয়া গেল! লাইব্রেরীর পরিচিত জগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল—হয়ত বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল, দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবদুল, তারপর খবর কি ?

—আদাব বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু!

—এসো বসো। চা খাবে ?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড় বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড় দাঁও। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা ?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেক্‌শনে যাবে না ?

—আগে আমরা দেখি. তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব ?—দেড় পার্সেণ্ট ক'রে ধরলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি ?

অপু পূর্বদিন টুইশানির টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকার দরকার ? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলো।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল—আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত-আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল ? সারা বাজার ও রাজা উডম্যাণ্ড স্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই! আবদুল তো ? মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েছেন,···টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েছে—আপনিও যেমন!···

প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে ?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাটাপেরেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—আশ্চর্য্যি কথা মশাই, সবাই জানে

আবদুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিনমাসেও? রাধে-কৃষ্ট! বেটা জুয়াচোরের ধাড়ী, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারির বাজারে। কোনও দোকানে তো আপনার একবার জিগ্যেস করাও উচিত ছিল। হার্ডওয়ারের দালালি করা কি আপনার মত ভালমানুষের কাজ মশাই? আপনার অল্প বয়স, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম্ম নয়, তবুও ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে—

আট টাকা বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হউক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুণ সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে! এখন সারা মাস চলিবে কিসে! বাড়ি ভাড়ার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায়?

দিশাহারা ভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ স্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চীৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি, থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ-চৈ, লালদীঘির পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জ্জন স্থানে একটা বড় বাদাম গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়িওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস যে করিত সে আবদুলকে!

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ। কেহ কোন দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে···দূর হইতে দূরে, সেই ছেলেবেলাকার মত—ছোট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বর্ষার লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে।..দূরে খিদিরপুরের ট্রাম যাইতেছে···গঙ্গার দিকে বড় একটা জাহাজের চোঙ—কোর্টের বেতারের মাস্তুল—এক...দুই···তিন...চার···আকাশ কি ঘন নীল ...এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য, এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খররৌদ্র...বিদ্যুৎ. সূর্য··· রাত্রির তারা...প্রেম···মা···দিদি...অনিল···মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ.. মৃত্যুপারের দেশ···চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোট, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়··· তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে দূরে দেবলোকের মেরু-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তাহারা মিট মিট করে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা···তুচ্ছ আট টাকা···এ কোন্ বিচিত্র জগৎ!···কিসের থর্নিক্রফ্‌ট্ আর নাগরমল?

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল ধুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দু'হাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্‌স্‌ম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুজনেই ভারি খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসর-খানেক হাজতভোগের পর সম্প্রতি খালাস হইয়াছে, হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গবর্ণমেন্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস্, মাইনে কত?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের অফিসে, মাইনে সত্তর টাকা!

সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা ফণ্ড বাবদ কিছু কাটিয়া লওয়ার পর হাতে পৌছায় তেত্রিশ টাকা ক'আনা। একটু গর্বের সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম বলে' লেখাটা আমার, দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্মের সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলি কি নিয়ে রে! কি জানিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। ধর্ম মানে তুই যা বলতে চাইছিস, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম আছে, যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম আমার নিজের তা যে আর কারো নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে?

—বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদীঘিতে লেকচার দিবি।

—শুন্‌বি তুই? চল্ তবে—

গোলদীঘিতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো? তা হ'লে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘন্টাটাক অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্তেই এত ভালবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল?—

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিট্‌গ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি তাই সেদিন বিনয়কে বল্‌ছিলাম যে অপূর্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দু'বেলা কলেজের সিমেন্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশী—বালকের মত খুশী। উজ্জ্বলমুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ মেট্‌দের আর কারুর দেখা পাই নে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো···

প্রণব বিস্ময়ের স্বরে বলিল—মাও মারা গিয়েছেন!

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি? সে তো প্রায় এক বছর হ'তে চল্‌ল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারি ভাল লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এরকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবি বল?···এই বেয়ারা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি ক'রে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝলি—একদিন একজন বললে, বি-এন-আর আফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখতে-পড়তে পারলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল স্ট্রাইক চল্‌ছে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—

প্রণব চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, তখুনি ছাপানো ফর্মে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেকদূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ে একটা দোকানে বসে মনের খুশীতে উপুরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাব্‌লাম এতদিন পর পয়সার কষ্টটা তো ঘুচ্‌ল? ··আর কি খাবি? এই বেয়ারা আর দুটো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দু'দিন চাকরি হয়েছে বলে বুঝি—তোর সেই পুরানো রোগ আজও—হ্যাঁ তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা

সুবিধে আদায় করবার জন্ম স্ট্রাইক করেছে, দু'মাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাব শেষকালে?—আবার ভাবি, যাই চলে, অতদূর কখনো দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাইগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফের ওদের আফিসে গেলাম—ছাপানো ফর্মখানা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধা হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry.—প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পর ছুটি। ভারি ঘুম পায়, এখনও রাত-জাগা অভ্যেস হয় নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস্ নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে শরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে।—লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেছে, তাই সাফ করছে রবিবারে-রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিত্তির মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয়ত ভাবে, আচ্ছা পাগল! রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিত্তির মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে ঝাপ্টা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা-রাঙা, জ্বালা-করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেকট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে।

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল তুই আর আমি কোনও পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতা-কাঠি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনি নি। দোয়েল কি বৌ-কথা-কও, এদের ডাক তো ভুলেই গিয়েছি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?—এখন কত ফুল ফুটবারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি দেখিস্ চিনিয়ে দেব। যাবি প্রণব, চল আজ থিয়েটার দেখি? স্টারে 'সধবার একাদশী' আছে—যাবি?

নিজেই দু'খানা গ্যালারির টিকিট কিনিল—থিয়েটার ভাঙিলে অনেক রাত্রিতে ফিরিবার

পথে অপু বলিল—কি হবে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে ; আজ বসে গল্প ক'রে রাত কাটাই। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া অপু বন্ধুর হাত ধরিয়া রেলিং টপকাইয়া স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—বলিল—আর আয়, এই বেঞ্চিটাতে বসি, আমি নিমচাঁদের পার্ট প্লে করব, দেখবি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—তোর মাথা খারাপ আছে—এত রাতে বেশী চেঁচাস্ নি—পুলিশ এসে তাড়িয়ে দেবে—কিন্তু খানিকটা পর প্রণবও মাতিয়া উঠিল। দু'জনে হাসিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া আরও ঘণ্টাখানেক কাটাইল। অপু একটা বেঞ্চির উপরে গড়াগড়ি দিতেছিল ও মুখে নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি কি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—প্রণবের ভয়সূচক স্বরে উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল ফুটপাথের উপর একজন পাহারাওয়ালা। অমনি সে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light ! Heaven's First born !—পরে দুইজনেই ডাক্ স্ট্রীটের দিকের রেলিং টপকাইয়া সোজা দৌড় দিল।

রাত্রি আর বেশী নাই। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড় লাল বাড়ির পৈঠায় অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোথায় আর যাবো—আয় বোস্ এখানে—

প্রণব বলিল—একটা গান ধর তবে—

অপু বলিল—বাড়ির লোকে দোর খুলে বেরিয়ে আসবে—কোন রকমে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—

—কেমন পাহারাওয়ালাটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail, Holy Light !—হি-হি—টেরও পায় নি ? কোথা দিয়ে পালালুম—নিমচাঁদের মত হয় নি ?—হি-হি—

প্রণব বলিল—তোর মাথায় ছিট্ আছে—যাঃ সারা রাতটা ঘুম হ'ল না তোর পাল্লায় পড়ে —গা একটা গানই গা—আস্তে আস্তে ধর—আবার হাসে, যাঃ—

ইহারই দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম —আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে স্টীমারে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও যাস নি, চল আমার সঙ্গে, দিন-চার-পাঁচের ছুটি পাবি নে ?

ছুটি মিলিল। ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলেও চড়ে নাই। সকালবেলা স্টিমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, স্টীমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত-বন, অসংখ্য নারিকেল গাছ। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম,স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দু'দিক হইতে প্রকাণ্ড দু'টা নদী আসিয়া পরস্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ এবং এই সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর-বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাট মন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আর থাকিবে প্রাচীন ধনীবংশের শান্ত মর্যাদাবোধ, মান সম্মান, উদারতা! প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসী বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জৌলুস নাই কোনটারই, কার্নিস খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলাপায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট করিয়া ছাদে উড়িয়া পলাইতেছে, একখানা ষোল-বেহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে! দেখিয়া মনে হয়—এক সময় ইহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, বর্তমানে পসারহীন ডাক্তারের দ্বারসংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেছে, পুলু এসেছে'—'এই যে পুলু'—'এটি কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ বেশ, স্টীমার কি আজ লেট? ওরে নিবারণেকে ডাক, ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা, আহা থাক্ এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন! অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আনলি পুলু? এ মুখ যেন চিনি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি ক'রে চিনবেন মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতলপাটি পাতিয়া অপু একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—কি সেটা? কে জানে, হয়ত শাঁখের রব বা আরতির বাজনায় দরুণ—কিংবা হয়ত…

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহল-মুখর ধূমধূলি-পূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার জগৎ।

নারিকেলশ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা ক'রে পাগল, দেখলি তো গাছ-পালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায়, আমার দাদু ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুনতাম, 'বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর'—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে? মেনী? শোন্—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননী-দি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেলব চিলেকোঠার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়ে-ছেলে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর তো!

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক' বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, কি সুন্দর এক ঢাল চুল! কিছুদিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do...they...breed...goddesses...at Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তর দিকে পুরাতন আমলের আবাস-বাটি ও প্রকাণ্ড সাতদুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম সরিক-রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, রামদুর্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া-কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাই রাপদ।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ির বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী কোথা হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবের মামীমা দুপুরে কাছে বসিয়া দুজনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন অপুর অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কর্পূর, ঘৃত, জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাট-মন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন আমলের বড় জাজিম ও শতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতির ডুম টাঙ্গানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। বরের গ্রাম এই নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড় গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ-চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেছে বুঝি? উঃ, রাত অনেক হয়েছে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল—একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি—কি—প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল্-ছল্ চোখে তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমায় বিয়ে করতে হবে, আর সময় বেশী নেই, রাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অপু এত অবাক্ হইত না।

প্রণব বলে কি? প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে!

এই সময়ে দুজন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয় নি, তবুও আপনার কথা সব পুলুর মুখে শুনেছি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি!

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোকজনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাঙরমুখো সেকেলে বড় পাল্‌কিতে উঠাইয়া বাজনা-বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পাল্‌কিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পাল্‌কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও!!

সে কি বেজায় চীৎকার!

একমুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চীৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বর পক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক্, প্রজারা অবাক্, গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক্! সে এক কাণ্ড! চোখে না দেখিলে, বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের ছোট বড় সকলে উপস্থিত, সকলের সাম্‌নে—বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন, গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও-কিছু নয়, ও-রকম হইয়া থাকে,…কিন্তু ব্যাপারটা অত

সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বয়ের একটু সামান্ত ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় মামীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া-শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও-পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। সকলের বহু অনুনয় বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই! অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, মা তাহার গলায় যদি সত্যই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্তভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এ সব দিকের গতিক তো জানেন না, দো-পড়া হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?…আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর, ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী! এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া আর এ অঞ্চলে ও-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি, মাতামাতি…মাথার মধ্যে যেন চৈতন্তদেবের নগর-সংকীর্তন শুরু হইয়াছে!…এ কি সঙ্কটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন! এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন…আবার এক বৎসর ঘুরিতেই—একি!

মেয়েটির মুখ মনে হইল…আজই সকালে নিচের ঘরে তাহাকে দেখিয়াছে…কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদৃষ্টে উৎসবের দিনে এই ব্যাপার।…তাহা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা…কি করে সে এখন?…

কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দু'টি তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত—কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপরে যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে…নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।…

সে বলিল, চল ভাই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে দলবলে উঠিয়া গিয়া ইঁহাদের শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন,

এ-বাড়ির ঘরে-ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরে উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দু-চারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদান-সভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনাগুলি পরবর্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিতেছিল, যতই তুচ্ছ হোক্ গভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও ন্যাড়া, কাটারির বাঁটটা বাঁশের—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

রেশমী-চেলী-পরা সালঙ্কারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মধ্যে হঠাৎ শাঁখ বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলী পরিল, নূতন উপবীত ধারণ করিল, কলের পুতুলের মত মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মত সে-ও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যেন সে সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শির্ শির্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—না—ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মামীমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ীর আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপুজোর জোর ছিল বড়বৌ, তাই এমন বর মিললো। ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেছে।

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব ব্যাপার! মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দু'টি নত করিয়া আছে, অপু কৌতুহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটির মুখ ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সুঠাম ও সুন্দর মনে হইল। প্রতিমার মত রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু-এক গাছা কানের আশে-পাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুলে আলো পড়িয়া জ্বলিতেছে। •

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন। একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর

ভাগ্যে কখনও জোটে নাই—কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনিয়া বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড় মামীমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে বোধ হয় ওই বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁহার অমন রাশ-ভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে যখন নিজে বন্ধ-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বড়বৌ, কি কর পাগলের মত, দোর খোলো, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন যেন বলছে এ আমার আপনার লোক—ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়া কারোর উপর হয়নি কখনও—ভেবে গ্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এ বাড়ি না আস্‌তো—

পূর্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি ক'রে হবে মা, ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েছেন, ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রণবের মামীমা বলিলেন—আবার যে এমন ক'রে কথা বলব তা আজ দু'ঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে—যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারো চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রুজল চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রণবের মামীমার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন···মায়ের পরই বোধ হয় এমন আর কাহারও উপর...কেবল আর একজন আছেন—মেজবৌরাণী—লীলার মা।

তা ছাড়া মায়ের উপর তাহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানে যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না···যাক্ সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নূতন জামাই খুব ভাল গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন; বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারো দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় না কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা! মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারী সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠান্‌দি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাত্‌নি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়েআসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর? ··সে আবার কার বর?...এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয়?···স্ত্রী···তাহারই স্ত্রী?

পরদিন সকালে পূর্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তর তর্ক, ঝগড়া, শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুয্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মামাকে বলিল—ওসব বড় লোকের মুখ্যু জড়-ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড় মনে করি।.. একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধ'রে, ওকে একটা সত্যিকারের মানুষ ব'লে ভাবি।

অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের চারিধার ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসরের রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী? . স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল তা যেন এ নয়···কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতিকষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে ব'স—

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামীমা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং।···কি গ্রীবার ভঙ্গি! চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে —না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারী কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন। অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া

গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ রকম তো কখনও হয় নাই ?...

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর।

অপু বলিল—রাত ছুটো বেজে, শোবে না ? ইয়ে—এখানেই তো শোবে ?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্ত কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোওয়া—সেটা কি ভাল দেখাইবে ? কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল —সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি ভেবেছিলে ?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন ?...সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে— কেন বলুন না ?...কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম ? কি অপূর্ব রোমান্স এ ! ইহার অপেক্ষা কোন্ রোমান্স আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে !...জীবনের জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয় !..তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়...ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না...বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম না ? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমায় নাই, বৌভাত কাল এখানে হইবে, নিচে তাহারই উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচুর শাক কুটিতেছে, রান্না-কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে সেখানে এত রাত্রে পানতুয়া ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে। দু'দিন যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ-সময় কোথায় ?...মায়ের যে বড় সাধ ছিল মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত

রাত্রে সে-সব কত সাধ, কত আশার গল্প…মায়ের সোনার দেহ কোদলাতীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল…যাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন্ উৎসব…

অপু আকুল চোখের জলে চারিদিকে ঝাপ্সা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

'অপরাজিত' প্রথমাংশ সমাপ্ত

তৃণাঙ্কুর

(১৯ জুন, ১৯২৩—জানুয়ারী ১৯৩২)

বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনও দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গ—তার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়? যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাই এগুলি পড়িতে পড়িতে,—ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহার একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।

লেখক

এক মাস পরে আজ আবার কলকাতায় ফিরেচি। এই এক মাস দেশে কাটিয়েচি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন একসঙ্গে দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব আনন্দের অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্মকোলাহলে ও লোকের ভীড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাব্‌লা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করার। সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠির মাঠের অন্ধকার, ঘন নির্জ্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ি ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব আকাশের রং লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে, যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্ত্তে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্য্যই এই বিদ্যুৎ,—আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্য্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমুলগাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্ব্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন-পারের বেলাভূমি! আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটু চোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনার আশা, দুঃখসুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠত—এই সব বনের প্রতি গাছপালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখদুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর এক শত বৎসর পরে তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে?

কোথায় লেখা থাকবে এক মুণ্ডিতমুণ্ড আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান করতে নেমে নতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব কথা বেশী করে মনে জাগছিল। গোপালনগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব এই সৃষ্টির আনন্দ। নির্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিদু ও তার বোন রাণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিদুকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরনো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতার বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি। আকাশের কি নীল রং, ইছামতীর কি কালো জল! নৌকাতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জন কাশবনের ও জলের ধারের বক্সেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দে দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেককাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হোলে আপনা-আপনি গভীর চিন্তার মুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া

থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্বের জ্ঞান মনের মধ্যে এসে পৌঁছলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেন জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পারিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরেজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্ত্বটি মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যে আরও অনেক বেশী সম্ভাব্যতা, অনেক বেশী আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশী জটিলতা, আরও বেশী রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত দুর্বল জীব মনে করার মধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এঁরা মেনে নিতে পারেন না।

নীরদদের বাড়ি কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরেজী পত্রিকাতে। এই কথাই শুধু মনে হোল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েছি, যা আমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে—অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্তে সংসারের রং বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটির যে অংশটুকু আমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই, পরিপূর্ণ ভাবে জীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য, পদার্থতত্ত্ব, ফুলফল, গাছপালা, অপরাহ্ন, জ্যোৎস্না, ছোট ছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসারে চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথার প্রকৃত অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে" এখানে আনন্দের কোনো বর্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হোল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসী অফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলুম সায়েন্স কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মিটিংএ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলার রোড্ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ আকাশের রংটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুর মদ্দাকলগুলোর ওপরকার আকাশটা জুড়ে রং-এর, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্যের রং কোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হোল—তাঁর মত

ভারী পাকা ও যুক্তিপূর্ণ। সকালে সকালে ফিরলাম, তিনি আবার বৌবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিনলেন। আমায় বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্যে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সে এই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকার মহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকক্ষণ কথাবার্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে *বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালিঘাটে। সুরেশানন্দের ছোট একবছরের খোকাটি কি সুন্দর হয়েচে! ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হোল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিস্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় অনল জ্বলতে দেখেচি, পূর্ব দিক্‌পালের আগুন অক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটত্বার পিছনে এই সব সুকুমার শিল্প কোথায় লুকানো থাকে? কি হাসি দেখলুম ওর মুখে! কি তুলতুলে গাল!···

একটা উপমা মনে আসচে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' ওই গানটি আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য প্রমাণ পেয়েচে, তা কে বুঝচে? কিন্তু হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতা বুঝচেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাসচে, বুক দুলে উঠচে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য, এই বিরাট শিল্প-কৌশল, এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য—ক'জন বুঝবে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্চে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মন দিয়েচে ওদিকে—কে ভাবচে এই অপূর্ব, অবাচ্য, অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা!···মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে: Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের নাম করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের ফাৎনাতে ঠোক্‌রাচ্চে"।

আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে"

•

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে

* পথের পাঁচালী।

ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশী।

এবার বাড়ি গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাকুল—বর্ষাসরস লতাপাতার ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিন্ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটি কাটলো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইস্মাইলপুরের সেই কীর্তনের গানটা মনে পড়ল "...যাত রহি" শেষ দুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নাই, অথচ গানের ভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হোল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থক হয়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটা বড় চোখে পড়ে যায়, আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরনের শুভদিন। কলকাতার শহরে এ দিন আসে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দুমাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে-সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত শুক্ল অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে! জীবনে কখনও বোধহয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বই-এর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা হাত-পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—

ভুলিনি। ভুলিনি. যেখানেই থাকি ভুলিনি···তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সক ়র ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে র ত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হোত, তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক্, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম বারাকপুরে। সইমার বড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপালনগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা। নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখলুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারি নে—ঝোপে ঝোপে নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটাকাঁটার ফুল, লেজ-ঝোলা হলুদডানা পাখীটা—অস্তসূর্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশী।

আজ এখন সুট্‌কেশ গোছাচ্চি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুম, আজ রাত্রের ট্রেনে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

সেই "রাতের ঘুম ফেলনু মুছে" গানটা মনে পড়ে। সেই অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের "মাধবী কঙ্কন" বইখানা এনেচি। সেই কতকাল আগেকার সৌন্দর্য, সেই পূজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রথম বাড়ি যাওয়া,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি! জীবনটা যে কি অদ্ভুত, অপূর্ব—তা যারা না ভেবে দেখে তারা কি করে বুঝবে।...কি করে তারা বুঝবে কি মহৎ দান এটা ভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু। ঝরনার কি সুমিষ্ট জল।...একটু একটু বৃষ্টি হোল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরনা, বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলী মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকূটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানে বাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখলুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হোল বলে—সকলে উপরে উঠতে চাইলেন না। "অগ্নি

কুহকিনী নীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরী রাখলুম। আবার মনে পড়ে—বাড়ির কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলে মোটরে বা'র হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখানে আজ ওবেলা কীর্তন হবে, পূর্ণবাবু আসবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ি। আমি ও করুণাবাবু মোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাগে ফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভীড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙীন কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল দেখলুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ি হয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে অমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নাই। তারপরে বাঙ্গালীদের পূজামণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বললে। কিন্তু আমি তখন স্নান করি নাই। কাজেই আমার হোল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নাই, বন্য আতাগাছই বেশী। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশের তলে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরে শাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু-নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে। অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এত সুন্দর হাওয়া!—একথায় মনে হোল বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্যের দিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল। উপেনবাবুর ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্ত বকুনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হোল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজ এসময়টিতে কত নদীতে কত বাচ্‌ খেলার উৎসব, কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চলচে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলেভাজা জিলিপি বিক্রী করচে—সবাই নতুন কাপড় পরে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দেখবার জন্তে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ্‌ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে একদিনের সেই বন্ধুর কাছে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আসতে আসতে মনে হোল এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারে প্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট্‌-শেওড়ার বনে অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এসেচে, সেই কটুতিক্ত অপূর্ব সুঘ্রাণ উঠচে—সেই পাখীর ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচ পাথুরে জমি ও

শাল মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকার করি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়? মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে এই সময়েই শৈশবের সেই "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটির আঁটি ও ছিরে-পুকুর। বইখানা সেদিন শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্ব মধুর স্মৃতি—সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন—এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভ করবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে ৺বিজয়ার সম্মিলনী বসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হোল। একটু পরে ফকিরবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যিক আলোচনা চলল। আমি ও বিমানবাবুর জামাতা রবিবাবু অনেকক্ষণ ধরে টলষ্টয় ও রুশীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। রবিবাবু আমার 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসা করছিলেন। বললেন, অনেকে বলেচেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হোলে বিচিত্রা ছেড়ে দেবো। আমি ও করুণাবাবু ঘরের মধ্যে এসে বসে সিগারেট খেলুম ও ফকিরবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের ঝাল ঝাড়তে শুরু করলুম। তারপরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সেটা একটু কমে গেল—বিমানবাবু ও রবিবাবু চলে গেলেন—আমরাও পূর্ণবাবুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে গেলুম। দক্ষিণা ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন—আমার বেশ লাগলো। খুব জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে অনেক রাত্রে বাংলাতে ফেরা গেল। বেশ লাগছিল।

কাল সকালে সম্ভবতঃ গিরিডি হয়ে ঐ পথে মোটর-বাসে হাজারীবাগ ও সেখান থেকে রাঁচী হয়ে কলকাতায় ফিরবো। দেখি কি হয়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও যাবো না।

অমরবাবুর দৌহিত্র অমিতের কথাগুলি ভারী মিষ্টি। তিন বৎসরের শিশু! বেশ লাগে ওকে।

এইমাত্র সন্ধ্যা ছ'টার দিল্লী এক্সপ্রেসে দেওঘর থেকে ফিরে এলুম। সারা দিনটা কাটল বেশ। বড় রোদ ছিল। করুণাবাবু সারা পথ কেবল গানের বই বা'র করেন আর আমাকে এটা ওটা গাইতে বলেন—করুণাবাবু সম্পূর্ণ বেসুরে গাইতে থাকেন। মধুপুরে আমার নেমে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু উপেনবাবু নামলেন না বলে আমিও আর নামলুম না। তাতে আমার মন খারাপ ছিল, সেটা দূর করে দেওয়ার জন্যে আমার মুখের সামনে একটা সিগারেট ধরলেন।

তারপরে আবার চললো তাঁর সেই বেসুরে গজল গাওয়া। শিশিরকুমার ঘোষের বড়

ছেলেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—বেশ লোক। হুগলী ব্রিজ থেকে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো—আমার মনে হোল সেই এক ফাল্গুন দিনে চুঁচুঁড়ায় শখের থিয়েটার ও গোলাপ ফুলের কথা। সেই দুপুরের ঝম্-ঝম্ রোদে ফাল্গুনের অলস অবশ হাওয়ায় এই স্টেশনের সে প্ল্যাটফর্মে পায়চারীর কথা কি কখনো ভুলবো!

মধ্যে আবার খুব বৃষ্টি এল। কলকাতায় কিন্তু বৃষ্টি একটু একটু মাত্র। উপেনবাবু বললেন, আমার অনুচরগণ হেরে গিয়েচে।

এইমাত্র মেসের বারান্দাতে নির্জনে জ্যোৎস্নার আলোতে বসে আছি। বেশ লাগচে। মন মুক্ত, কারণ সম্মুখে প্রচুর অবসর।

এরই মধ্যে দেওঘর যেন দূর হয়ে পড়েচে। আজই সকালে উঠে যে সূর্যোদয়ের পূর্বে আমি দেওঘরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েচি, তা কি স্বপ্ন? আজই তো ভোরে পশ্চিম আকাশে ধূসর ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের রহস্য-ভরা মূর্তি ও ত্রিকূটের পিছনের আকাশের অরুণচ্ছটারক্ত সৌন্দর্য দেখেচি, তা যেন মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

করুণাবাবুকে বড় ভাল লাগলো। কি শান্ত, সরল হাস্যপ্রিয়, সরস স্বভাবের যুবক!··· গান গলায় নেই, তবু অনবরত গান গাইতে গাইতে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন—সকলে মুচকি হাসচে—গোপনে চোখ ইশারা করচে পরস্পরে, তাঁর দৃক্‌পাতও নেই। তিনি তা বুঝতেও পারচেন না। আপন মনে গান গেয়েই চলেচেন আর আমাকে ডেকে ডেকে বলচেন—আসুন বিভূতিবাবু, এইটে ধরা যাক্ আসুন—আমার সুরও তাঁর গলার বেসুরাতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দৃক্‌পাতও নেই, সুর-বেসুর সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। শিশুর মত সরল ভদ্রলোক।

'Men such as these are the salt of the Earth.'

পরশু থেকে কি বিশ্রী বাদলা যে চলচে! কাল গেল কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার দিনটা—কিন্তু সারাদিন কি ভয়ানক বর্ষা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো! আজও সকাল থেকে শুরু হয়েচে—কাল সারারাতের মধ্যে তো একদণ্ড বিরাম ছিল না বৃষ্টির! কার্তিক মাসে এরকম বাদলা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এসব সময়ের সঙ্গে তো বাদলার association মনে নেই—তাই অদ্ভুত মনে হয়। অন্ধকার হয়ে এসেচে—টেবিলে বসে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে, মনে হচ্চে আলো জ্বালতে হবে। কাল যখন গিরিজাবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম তখন কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু ধরেছিল। রেঙ্গুন যাওয়ার কথা উমেশবাবু যা লিখে রেখে গিয়েচেন, তা এ বৃষ্টিতে কি করে হয়? আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও গিয়ে সুখ নেই।

কাল রাত্রে গিয়েছিলুম শিমুলতলা। সেখানে থেকে আজ সকালের ট্রেনে বা'র হয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় পৌঁছান গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটি পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট স্টেশন,

সেই কেওটা, সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ির সে শান্ত অপরাহ্ণ। যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেই কাঠের গুঁড়োগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—এসব ভাবলে সে এক অপূর্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর-প্রভাত-দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন ; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ি ঠিক মনে করে রেখেচে। সেই দিনটি থেকে জীবন আরম্ভ হয় না ?......

এসেই ওদের বাড়ি গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা করলে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটি। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন্ গার্ডেনে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ধারে ধারে বেড়াতে বেড়াতে খালের জলের রক্ত-মৃণালগুলি দেখছিলুম। দুটি রাঙা ফ্রক পরা ফিরিঙ্গি বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে *"আলোক-সারথি"র ছক্ কাটলুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়ি ফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথম গেলুম প্রবাসী অফিসে। কেদারবাবু মোটরে ঢুকচেন, গেটের কাছে নমস্কার বিনিময় হোল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটু পরে নীহারবাবুও এলেন। খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীর বাড়ি। উষাদেবী চলে গিয়েচেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুনলুম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ি রেকর্ড শুনলাম। চা পানের পরে ডাঃ দে বাড়ি চলে গেলেন ; আমরা তিনজনে গেলুম বায়োস্কোপে। পথে বার বার চেয়ে দেখছিলুম—আজ পূর্ণিমা, মানিকতলা স্পারের পিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়িটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম উঠচে হয়ত। সেই সময়টা সেই "আমার অপূর্ব ভ্রমণ," "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সেকি অপূর্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ,—কি অপূর্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি।

Sunrise filmটা মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হোল। —বাবু B. P. C. C. থেকে returned হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাশের সঙ্গে দেখা। প্রবাসী অফিসে মানিকবাবু জানালে, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবার প্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা অফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুব শীঘ্র লেখা চান। Sub Editor-এর declarationটা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখি

* পরে 'অপরাজিত' নামে প্রকাশিত।

বৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্চে। বিভূতি বসতে বললে। তারপর দেবেন ও ষীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাস পূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিকৃশা করে জ্যোৎস্নায় ও ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্তন।

কে জানত উপরে ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাসপূর্ণিমার বায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ির সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হু-হু করে উড়ে চলেচেন ওপরে—ওপরে—সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটি রইল পড়ে—।

বহুদূর আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে—সেখানে।

বন্ধুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করে হয়। সেদিন বন্ধুর অত্যাচারের কথা কত শুনলুম। তার স্ত্রীর, বোন ও শাশুড়ীঠাকরুন বললেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নরাত্রে আমাদের বাড়িটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ির সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েছে। শ্যামাচরণ-দাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ করতে হবে।

এই অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়। যেন তার বিশাল চরভূমি, কালো জঙ্গল, নির্জন বালিয়াড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's return গল্পটা কি অপূর্ব emotion নিয়েই পড়তুম। বাল্যের সে সব অপূর্ব emotion মনে পড়লেই মনে হয় কি অপূর্ব, এক বিচিত্র এ জীবনধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠির বাড়ি মনে পড়ে।

কি সুন্দর!

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র creative আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসে পর্যন্ত এক-বছরের মধ্যে তা হয়নি কোন দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হলো আমার, অকারণে আনন্দে মনের পাত্র উপচে পড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল।···সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য আজ আমার মনে ভিড় করেচে···স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকম কিন্তু খুব বেশী দিন আসে না।···

ইন্‌স্টিট্যুটে সেই মহিলা পর্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরু প্রদেশের বরফ জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্যভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রাম করতেন, দূরে মেরুপ্রদেশীয় Northern Light জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"amidst a waste of frozen river, and dark forests"—সেখানকার নৈশ নীরবতা·· নির্জনতা ··গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায়···নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র···আশেপাশে শুভ্রতুষারাবৃত পাইন অরণ্যের অড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূত করে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল এই সব শীতের রাত্রে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকতো গভীর রাত্রে···সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য···অদ্ভুত, অপূর্ব···।

আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, weird beauty··· সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ ··স্বপ্নে যেন দেখি···

সেই কুমোরদের বাড়ি চাক ঘোরাচ্ছে দাসু·· পঞ্চাননতলায় কালীপুজো ··

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুলচো—তা কে দেখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ...হে সৌন্দর্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কি বলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না.

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখচি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যের কথা ভাবি নি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলিনি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাই নি···

দূর-দূরান্তের কথা তুলি নি ··

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চালকী থেকে খুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বন্ধুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলা ঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেক করে রাজী করানো গেল। সিমলাতে গিয়ে কালাকে ডাকতে পাঠানো গেল, সে নাকি ভাত রাঁধচে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বালতিতে করে। খাবার খেয়ে নিয়ে আমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগছিল। আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রঙটা যে!

রাত আটটার সময় পৌঁছে গেলুম কলকাতা, ঠিক চারটার সময় সিমলে থেকে ছেড়ে।

এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। Sense of space মানুষের ক্রমেই কেমন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।...এক শত বৎসর পূর্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুর গাড়িতে চার দিনের পথ ছিল।···কে জানে আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের Sense of space আরও কত পরিবর্তিত হবে।—

আজ অনেকক্ষণ কার্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল, —আমার শুধু মনে যুগ যুগের কল্পনা জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওইখানে উঠেছে, ওতেও কত অপূর্ব জীবনলীলা···। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকতো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন সুনিপুণ শিল্প-স্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকেই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, আকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি—এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে ?

মুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—Lief Ericsson was space-hungry: So am I.

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফট করচে। কি ভাবের মুক্তি ? আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে ?—তা নয়। কিন্তু কলকাতার এই নিতান্ত মিনমিনে, একঘেয়ে, ঘরোয়া জীবনযাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যে জীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহুবার দৃষ্ট, গতানুগতিক, একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর ঘণ্টায় চুপি চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম। আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিক চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল, কি অপূর্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায় ? মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরি হয় নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতে পারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি এরই জন্যে মনটা হাঁপাচ্চে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনের প্রান্তে একটি বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা অভ্রের খনি, বালু-মিশ্রিত পাথুরে মাটির গায়ে অভ্রকণা চিক্-চিক্ করচে, নয়তো উচ্চাবচ পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুই বন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাকতে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায় আরও অনেক বড়

—জায়গা—অনেকখানি বড়—অচেনা, অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রী হলেও তা-ই চাইবো, এ একঘেয়ে পোষমানা শৌখীনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখতে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবের সঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Lief the Viking' গ্রীনল্যাণ্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বার করতে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়ে চলে গেল—নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সন্ধ-ফোটা মরসুমী ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাবছিলুম।…

ভাবতে ভাবতে মনে হল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগৎ থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেচি—ও মরসুমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও যেন দেখি নি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর একঘেয়েমিটা আমার মনে বসতে পারে নি এখনও। তার কারণ আমার গতি—স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এইমাত্র যেন ইচ্ছা মত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নির্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্-মিট্ করে জ্বলচে—ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মত কোন এক জগতে অপরূপের বিবর্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরাল থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আবার অবাক হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেমন অবশ হয়ে গেল।…

কোন্ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?…কি অতলস্পর্শ, মহিমময় রহস্য!… রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব।…

জীবনকে যে চিনতে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্যের তুলনা নেই—যার কল্পনার পঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের ঊর্ধ্বে তাকে উঠতে প্রাণপণে বাধাদান করেচে, সে শাশ্বত-ভিখারীর দৈন্য কে দূর করবে?…

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখবার পরে এই আজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হল, কিন্তু আমি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে প্রথম যৌবনের সে অপূর্ব উন্মাদনা, নবীন, টাটকা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকু পেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলিছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব উৎসাহ পাই—একটা অজ

ধরনের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশী যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাবলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কলকাতার একঘেয়েমি যাকে বলচি—এ-ও চলে যাবে। সে যাত্রার বাঁশি যেন বেজেছে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরের পারে।

নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আসচে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক—আর কিছু লিখবো না।

ক'দিন বেশ কাটচে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বলবাবু, ননী, নান্টু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে চললুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হল, ভারী আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমি ও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কি গল্প আবার পুরনো দিনের মতই হল। একদিন আমি অবশ্য একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতে খেতে এল—বাবা বর্ধমান থেকে এলেন—তারও অনেক আগে যখন বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম—সে-সব টাটকা—তাজা, আনকোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ি আসছিলুম—যেদিন চড়ক তৈরি করলুম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলার আমোদ, পুবমুখো যাওয়া, মরাগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটিতে বাড়ি আসার আনন্দ—কত লিখবো। কে জীবনের এসব মহনীয় অবদান-পরম্পরার কথা লিখতে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কেই বা বুঝবে? তা তো সম্ভব নয়—অন্য সকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডার লুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে তা জানবে?…

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটচে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীর ধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকে, এত পাখী ডাকে!… চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল—কত কি!…বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নামি। ওপারের চরের শিমুলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য ওঠে, দু'পারে কত শ্যামল গাছপালা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দুলতে দেখলেই আমার মনে কেমন অপূর্ব আনন্দ ভরে ওঠে!…প্রভাতে পাখীরা যে কত সুরে ডাকে,' জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্যে, সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা চিংলাছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে, একটা হয়তো খেজুর গাছ শ্যাওড়াতলার বাঁকে অন্য সব গাছপালার থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব, সুন্দর, হে শ্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য সব জগতও যে দেখতে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে; মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলা বাজতে না বাজতে মেঘ উঠবে, ঝড়ও উঠবে। আর সমস্ত আমবাগানের তলাগুলো ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরে যায়—সলতে-খাগীতলা*, তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানে যাতায়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘনমেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ও-ই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিস।···একটা ছেলে বলচে—ভাই—ওই সোম্‌কাটার মুই যদি না আসতাম, তবে এত আম পেতাম না!···

কাল সাতবেড়ে যেয়ে দেখতে যাবো।···

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ!···অশ্বত্থতলায়, যেখানে সেখানে এত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুযো মহাশয়ের বাড়ি খুব আহার হল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলোকের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটির-ঘরগুলো সেকেলে ধরনের, কোনো নতুন আলো এখনও ঢোকে নি বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ও আমি দুজনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালের দিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানে কামারবুড়ি কি ফলমূল ও কাঁকুড় নিয়ে আসচে দেখলাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্ছেন।

আজকাল রোজ বৈকালেই মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুন কুঠির মাঠে একদিনও বেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজতে না বাজতেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটা করা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখীর কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিত সূর্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেকক্ষণ চেয়ার পেতে ওদের বেলতলাটায়, বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হল। বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলাটায়, ফিরচি একজন লোক জটেমারীর কুঠি খুঁজচে, আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলেডাঙার পুলটায়। একখানা

*'পথের পাঁচালী'তে এই আমগাছটির উল্লেখ আছে।

যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটা দেখলাম—এ রকম অপূর্ব গ্রাম্যদৃশ্য কচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙা গ্রামের বাঁশবনের সারি নদীর হওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে। দুপারে সবুজ আউসের ক্ষেত, মজুরেরা টোকা মাথায় ক্ষেতে ক্ষেতে ছাটার কাজ করচে, ছোট ডোঙ্গা চেপে কেউবা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্ব ভূমিশ্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোঁতা থেকে ফিরচে—গোঁসাইবাড়ির কাছে বাসা করেচে বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হল—একা ভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বললে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়িতে এক ছোট ছেলে আছে, ও দুটি মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবনধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েচে তাদের কথাগুলো বড় বেশী করে মনে হল। ভরতের মা দিন-রাত দুঃখ করচেন, তাঁর দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ-ধারার এক কণাও এরা পাচ্ছে না—হয়তো শুধু দেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটি আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোনো দিন লাগে না—ডাঁশা খেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখীর গানও এদেশে আছে!...কুঠির মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্ততঃ প্রবর্দ্ধমান গাছপালা বনঝোপের সৌন্দর্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়—ফুল-ভরা সোঁদালি দোলায়িত। আকাশের রঙটা হয়েচে অদ্ভুত—অপূর্ব নির্জনতা শুধু পাখীদের কল-কাকলীতে ভগ্ন হচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই— ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যে কেবল আমি ও মুক্ত উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায় থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!...

তারপর ওপাড়ার ঘাটটিতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি উঠেচে, ঐদিকে চেয়ে কত শত নক্ষত্রমণ্ডলী, বিভঙ্গমুখী নক্ষত্রস্রোত, অজ্ঞ অজ্ঞ নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হল। বৃহৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ। এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য—তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত!...

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান্, বিরাট অর্থ, একটা সুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?...

...সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, ন'দি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকার রাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুন বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে

লোকেরা ও ছেলেদের দল আমাদের বাড়ির পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলোতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটি।

কি সুন্দর বৈকালটি কাল কাটালো যে! কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসে; পরে নদীজলে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব ভাব এল মনে, ঠাণ্ডা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতার ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলোর দিকে চোখ রেখে শুধু এদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাই বার বার মনে আসছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়ল। নদী জলের আর্দ্র, সুগন্ধ উঠচে—ওপারে মাধবপুরের পটোলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদাম গাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেচে। সারাদিনের গুমটের পর শরীর কি স্নিগ্ধই হল।···

শেষ রাত্রে বেজায় গুমোট গরমে আইঢাই করচি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এল। ন'দি, জেলি, বুড়ি-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়ুতে ছুটল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জেলে সব ছুটল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার এল ফিরে।···

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটিতে এই রকমই সিঁদুরে-মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারি নি, গোপালনগরের হাটে গিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখি নি। কাঁচিকাটার পুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখচে। সামনে অপূর্ব রঙের আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রঙের, পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখীর ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্বতা কি চমৎকার ভাবেই···সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল!···

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে, কুঠির মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছগুলো, নীচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্তি ধরেচে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগ্‌ডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে ঢাকা

আকাশের পটভূমিতে কোনো দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করে ওঠে।

তারপরই সাঁ-সাঁ রবে ওপারের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠলো—দৌড়, দৌড়, দৌড়—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েচি—আমাদের গ্রামের কোলে—তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগে ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায় নি।...

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি!...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুল-গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরে-নি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের উর্ধ্বে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে হালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো, ডাঁসা

খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখন চা কের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুমাদের বেলতলাটায় গিয়ে ব নকক্ষণ বসেছিলাম, তখন—তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সবচেয়ে বেশী গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্চি শুধু এই এখানে—কোনো Cosmic thoughts আটকায় না, বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান্ করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন Land of Lotus-eaters, কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর, আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, অপরূপ, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখি নি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী, কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব সৃষ্টি, এতদিন তত লক্ষ্য করি নি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখি নি তো। দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখী, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না।

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটা হারাতে বসেচে—

কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলে নি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষা সইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলা False Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়ো বয়সেও ভাল করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান, ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্বল জড়মতির মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরা শোনেও নি কোনোদিন।

সারা পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না) মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ লাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল। ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ওইটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আর ঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদের বাড়িতে আসার সময় ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায় অনেক লোক বসতো। হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ছিলেন, তাঁর দেওর গোঁসাই-বাড়ি ঠাকুর পুজো করে দু-পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাই দিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেতো।

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম, মোল্লাহাটির দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাও বাবলা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দুধারে ঘাস-ভরা নির্জন মাঠ, ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ্ শালিকের দল কিচ্-কিচ্ করচে, বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ—মাঝে-মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেচে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্চে, ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু

চলেছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্র ীমার শিমুল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্বত—মেঘের গিরি গর্ত্তের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বক নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্‌ শালিকের গর্ত, নীল মাছরাঙা পাখী শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে—খেজুরগাছ, গাবভেরাণ্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্তি সাঁই-বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া, নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমুল গাছ, শালিক পাখী, থেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমূলোর ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাসা, উলুঘাস, টোপাপানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দুখানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব হীরাকসের রঙ ধরেচে—গাঢ়, নীল।

আবার দুপাড় নির্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের এত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না, ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাবলা গাছ, শিমুলগাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখীর দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাতার মত পড়ে আছে—দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর, অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ এক সঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে—অনেকখানি দূর পর্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথার মাথার যেন সে আগুনের আভা, খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলচে আর মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দুধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দুখানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌঁছুবে বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ী বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখী বাসায় ফিরচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো—কি অপরূপ শোভা, সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনে আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব শ্যাম-লতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নলে কাস্তে

হাতে ঘাস কাটচে—কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্চে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখীর দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা?···কেউ না। এই যে সৌন্দর্যে দিশাহারা হয়ে পড়চি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচি—এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়? ··আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।···

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্চে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর-বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবনযাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুলচে, জ্যোৎস্না পড়ে দুপাশের নদীজল চিক্-চিক্ করচে। ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখে নি, কেউ তো ভোগ করে নি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরি হয়েচে।

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায় কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান ক'রে, দিনরাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখী, ফুলফল, সূর্য—এদের,—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম—তারপর গেলুম কুটৌমারির প্লটটাতে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে

উঠল—সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাই নি।

আজ চলে যাবো, তাই বিদায় নিলুম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েচি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্যে এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু, বিদায়, বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো ?…

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্চে, হয়তো দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নলখাগ্ড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার বাটটি বছরের জন্যে এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে ? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরেচে, তার জগতে যেতে পারি—বহু বছরের Globular cluster-দের জগতে যেতে পারি—কে বলবে এসব শুধুই কল্পনা-বিলাস ? এ যে হয় না তা কে জানে ? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জায়মান হউক—তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গুন্‌গুন্ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :—

'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—'

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল—ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলেডাঙার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুলচে, আউশধানের ক্ষেতের আইল-পথ বেয়ে

কৃষক-বধূ মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসচে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ির মাথায় শুক্রতারা উঠেচে—মনে হল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্ম-জন্মান্তরের পথিক-আত্মা। দূর থেকে কোন সুদূরে নিত্য নূতন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলায় পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক।

মনে হল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতায় লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revealation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না, দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল না—অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্চে মনে পড়ে।

'চরণ বৈ মধু বিন্দতি' চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশে থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকালগুলির জন্যে মন কেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে, কণিকাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশ থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলে এমনটি হত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কলকাতাটা যেন নতুন নতুন লাগছিল—যেন এ কোন্ শহর—এর কর্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার ওই গলিটি, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটচে, বাস্ থেকে নামচে—দেশের মানুষদের সে মৃতের মত জড়তা, অলস ও কর্মকুণ্ঠতার পরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটি কাটল বেশ ভালোই। সকালে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখান থেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কলকাতার এত কাছে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়া মাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা'গঞ্জ গিয়েছেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহর খেয়াঘাটে। এই ঘাটে অনেক[illegible] আগে দিদিমা থাকতে একবার সর্বপ্রথম এসেছিলুম, কেওটা হালিসহরে থাকতে।

[redacted]বাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হল, অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করে বর্তমান

তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখলুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করে রসগোল্লা খেতে লাগল—তখন সে কি দৃশ্যই হল!

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় খুঁজতে খুঁজতে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকে আছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হৃষ্টপুষ্ট লম্বা, কালো গোঁপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বললুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে?···

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরের রোয়াক দিয়ে ওদের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে মাসিমার সঙ্গে কথা বললুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়ের গল্পবলা, কি আতুরীর কাছে ধামা-কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কে মনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, উল্লাস, দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোক-পূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পটপটি তলার মেলায়, বকুলতলার দিনগুলোতে, পুব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া, তারপর স্কুল কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটিতে আবার এতকাল পরে পা দিলাম রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরকার রোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্বত্ব এই সব মুহূর্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীনবাবু জানলা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখলাম।

রাত আটটার বাসে হুগলী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে। রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বড়-জাগুলে, মরিচা, দুধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট, কেওটা, হুগলী ঘাট, নৈহাটী—সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস্ ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হল।

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির পৈটায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বথ্ গাছটার কাছে রাত আটটায় সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-

মণ্ডলী গঠনের ও 'শনিবারের চিঠি' অন্যভাবে বার করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন, সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলাম প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে বার হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডঃ সুশীল দে-র বাড়ি। সেখানে ঢাকার বর্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটির গোলযোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠল—অনেকক্ষণ বসে সেখানে হাসি-গল্প হল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লুম—এ বাসাটা যদি বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি ?

সেখান থেকে বার হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগচীর বাড়ি। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ এ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত ন'টার সময় একবার এদিক, একবার ওদিক—সে মহামুস্কিল। অনেক কষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ি বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, luck আছে বলতে হবে।' আমি মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম, যা-ই বলি। তারপর জল-টল খাওয়ার পরে সেখান থেকে অনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্মণ্যতা নিয়ে খানিক তর্ক-বিতর্ক হল। উনি বললেন, 'কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি ?' আমি বললুম—সেটা one man show মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি ? ...প্রবাসী আপিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও কবিতা আবৃত্তি হল। অমল হোমের স্ত্রী বললেন, 'একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাঁকে ডাকি,—কালোর ঘরেই আছেন।'

মেয়রের নির্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হলে লোকে তার চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মার্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের—সইমা কি বুড়ি পিসিমা—এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙা কুড়া এক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগল। ...

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবুর বাড়ি। সেখানে হেম বাগচী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চায়ের উদ্যোগ করতে আমরা নিবৃত্ত করলাম—কেননা এইমাত্র অমল হোমের বাড়ি থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আসচি। ফরাসী কবি

বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্তা হল, মোহিতবাবু একটা লেখা পড়লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাটল।

আজ সকালে ধূর্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেনে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, সহজেই বাজার পর্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারি সুন্দর বৈকাল, আকাশের রঙ এমন সুন্দর শুধু বর্ষাকালেই হয়। গাছপালার রঙ কি সবুজ—রৌদ্রের রঙটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেই শিমুলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে—চারি ধারে আকাশের রঙে বড় মুগ্ধ করলে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রঙের রোদ লেগে দেখতে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ-কথা-ক' ডাকচে—খুব ডাকচে। সোঁদালি ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধহয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক, আর আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব জীবন-যাত্রা। কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরনের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি!...আসল জীবনটাই তো হল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেই গ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব অনুভূতি আর নেই!

বিভূতিদের বাড়ি থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদের বাড়ির সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বসলে, গল্পগুজব করলে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্রমাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলা, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? Where is that child?...সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিসে খুব মেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়োস্কোপ দেখতে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ হল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বলছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব ধরনের আনন্দ পাচ্ছি তা বলবার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধু বুঝতে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দু'-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব ভাবটাই মনে আসছিল...আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে। অমৃত বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে, সত্য বলে মনে হচ্ছিল, বিরাট ও শাশ্বত বলে মনে হচ্ছিল···এক উন্মাদনাময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি!···মুগ্ধ হয়ে গেলাম...

দু-একটা চরণ গান তৈরি করে গুন্‌গুন্ করে গাইলাম :

মনে আমার রঙ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্চে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে একথায় কোনো ভুল নেই। এ শুধু হয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ভয়ানক খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই, সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারী জিনিস তা এই কর্ম-ব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা কিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ি-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্ঠুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়,—টাকার গাছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কূজন, নদীর কল মর্মর, অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও বেতে দেখেচি কাষ্ট্‌ক্লাস কামরায় চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষার বৈকালগুলি —কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো কি পাখীর গান হত—জীবনের সম্পদ হল সে সব—এক মুহূর্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ contemplation চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তবে হল আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজ-গারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ার নয়।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ করলে জীবনটার প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, common place হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরী-গুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনের আকাশ-পাতাল তফাতটা ভালো করে বোঝা যাবে।

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টিতে, সে-কথা হল আজ। এদের এখানে প্যাক-বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেনবাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হত···? আজও তাই ভাবি—জীবনের experience আমাদের খুব বেশী না,—সমৃদ্ধ খুব, একথা বলিতে পারি না, অন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরনের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ি—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশী দিয়েচে যে, এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দ প্রত্যেকের মনেই ভগবান দিয়েচেন, যে কোন জিনিসকে উপলক্ষ করে হোক সেটা ব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব আনন্দের বার্তা!

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনালুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে। প্রথমে উপেন-বাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়িতে। খানিকটা গল্প-গুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সহিত পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?···তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথ-বাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার করলেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্ক সার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারি লাভ হল বলে মনে করচি।'

ওখান থেকে এসে গেলাম রেবতীবাবুদের মেসে—খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের স্ট্রীটে কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিনুও এখানে আছে দেখলাম—খিনু কাছে এসে বসলো, অনেক গল্পগুজব করলে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মতো সরল ব্যবহার করলে। ভারি আনন্দ হলো দেখে। ওরা সবাই এল—শরবত করে আনলে খিনু—ভারি ভাল লাগল।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর জলযোগ হল। চা-পানের পর সেখান থেকে বার হয়ে নিকটেই মহিম হালদার স্ট্রীটে রবি-বাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম—সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাই নি—আজ বিকেলে স্কুলবাড়ির ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পটুপটি গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর জীবন-যাত্রার দিনগুলি —কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগৎটা।.. কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো—একটুখানি ভাববার সময় পাই নে, দেখবার সময় পাই নে, তবু যতটুকু সময় পাই—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে একটুখানি অপরাহ্নকে স্কুলের তেতলার ছাদটা থেকে দেখি—আবার সেই 'জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মাধবী কঙ্কনে'র দিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচবে, খুব পাঁকাটি পড়ে থাকবে। সেই জেলেখা, রঙমহাল শিসমহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, না দেখতে পাওয়া,—আমাদের মনে হয় এই ভাল। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির intensity আরও বেশী হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্বে ভারতের বালকেরা, বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রুজল তখন ছিল লোকের অজ্ঞাত, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এ সব তো জানতো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহ্‌গণ—এই সমস্ত Tragic possibility, ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো,—কবিদের, ভাবুকের, গায়কের, চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাব্যতার কথা মনে উঠচে। আরও কত Tragedyর বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়ে উঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চি নে। এই ইংরাজ চলে যাবে একদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসব ঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

কাল সারা দিনটা বড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো—প্রবাসী আপিসে একটা কাজ ছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বার হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদে। নীহারবাবু বললেন, 'পথের পাঁচালী'কে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই।' প্রমথবাবু আবার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বলছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে

ছেলেটি বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা করলে। সোমনাথবাবু বললেন, 'আপনি বর্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—আপনাকেও কিছু বলতে হবে।' খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বার হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক-সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু তা আর যাওয়া সম্ভব হল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প করতেই বেজে গেল নটা। অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাঁকে বললুম সে-কথা।

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে। শীতল একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বার করচে, তাতে লেখা দিতে বলচে। কাল সে আসবে বেলা তিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরছিলুম—বৈকাল ছটা। পূর্বদিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূর্বদিকে চাই। অন্যদিনও চাই, এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব মনে হল। ...মাকাল ফল, পিসিমা, পুরনো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখী, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—সেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

তার পরে সুরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ি যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—যাতে সর্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বর্ধিত হয়, আনন্দ বর্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপুষ্ট হবে তার সন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বার হয়ে পড়া গেল। দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেনটা ছাড়ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটার শ্যামল-শ্রী দেখে বুঝতে পারলাম বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করি নি—কী অপূর্ব অস্ত-আকাশের রঙীন মেঘস্তূপ, কী অপরূপ সন্ধ্যার শ্যামছায়া!...কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা এর আগে কে ভেবেছিল?—পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মনে হল—সেই ঝিকুরে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্ণের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পুজার সময়, বাবা এতদিন বাড়ি এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড় কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশী করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ির মধ্যে বসে বসে লিখচি —কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটে নি।

পরশু বৈকালটি সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমে রেষ্টরেণ্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডঃ সুশীল দে-র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারি আনন্দ হল।

কারগী রোডে পৌছে দেখলাম কিছুই আসে নি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতে রাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পৌছতে তুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটি সাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্তনই যুক্তিযুক্ত মনে হল। একজন বাঙালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য—তিনি সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক।—ঝিঙে ও ঢেঁড়স ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটির দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হল ওরকম বাড়িতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন—সেখানে তরকারীর বাগান। একটি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সামনের পাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপারে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খৃষ্টান ডাক্তার জানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙালী ষ্টান মেয়ে এসেছিলেন—এই ট্রেনে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ি পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশী ছিল না। বিলাসপুরের ও রায়গড়ের মধ্যেকার আরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামবার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেন যেতে লাগল, যার তুলনায় পূর্বে যতগুলো দেখেচি সব ছোট হয়ে গেল, তুচ্ছ হয়ে গেল—সেটা হচ্ছে রায়গড় ও ঝারশাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ আরণ্যভূমির বর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ায় অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গভীর অন্ত কোনো দৃশ্য জীবনে দেখি নি। কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়ও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্যন্ত এলো!···মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে, যেন কুমোরেরা পণ পুড়ুচ্চে—নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভাই বা কি! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বললে, 'মশাই এ অঞ্চলে সবই barren'...barren কোথায়? তারা কি চক্রধরপুরের পরের এই গম্ভীর-দৃশ্য বনানী দেখে নি?···

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে—সন্ধ্যাবেলাতে তুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে—ওটা আর রেলের পিছনে মাঠগুলো নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরি হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এই

জিভুজটার সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবর ওই পাহাড়টা। এই অরণ্যভূমির ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেলপথটা চলে গিয়েচে। সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্টপূর্ব শোভা!...গাড়ির সবাই বললে—স্থাখো, স্থাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হল, চারিধারে এই অপূর্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকার পর্বত-সান্নিহিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে সন্ত কোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও Rock cuttingটা ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এ ধরনের দৃশ্য ক'টাই বা দেখেচি!...রাত আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হল, সকালে এসে কলকাতায় উঠলুম—দুপুরটা ঘুম হল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব—ভাবচি—বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবে এখন।

আজ সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনীবাবুদের বাড়ি—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে জিতেনবাবুদের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে হল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজল তিনটে। Living age কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই 'Life of the Ants' সম্বন্ধে একটি ভারি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম—সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানটিতে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আসচে, ওধারের তালগাছগুলো মেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবির মত মনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটিকে আমার মনের সঙ্গে কি জানি আজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচি নে—আমার মনের সুসম্বদ্ধ, সুনির্দিষ্ট অপরাহ্নের মালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের ও সুন্দর অপরাহ্নটি বিস্তৃত শত অপরাহ্ন-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ি, তারপর দক্ষিণাবাবুদের বাড়ি দক্ষিণাবাবু বাড়ি নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা করলে, কাছে বসে পাওয়ালে। রাত এগারোটার পরে এলেন দক্ষিণাবাবু। গল্পে গুজবে হল রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্তে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল না মশায় ও গরমে—অনেকরাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়চে।

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম—এত সুন্দর গন্ধ বন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানতঃ ওঠে বনমরিচায় ফোটা ফুল থেকে ও কেলেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব ধরনের হল

যা অনেকদিন কলকাতায় থেকে অনুভব করি নি। নৌকার ওপর বসে বসে যেন জীবনটা আর একটা dimension-এ বেড়ে উঠল—ঘন লতাপাতার সুগন্ধে বহু অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দুজনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম—কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা, প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করে বুঝলাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাটল—ঊষাদেবী এখানে এসেচেন ঢাকা থেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলুম—বেশ মেয়েটি—বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদারও খুব সুন্দর। সুনীতিবাবুর বাড়িতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—অনেকগুলো গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেক ছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্তির ফটো—এই সব দেখে এলাম—প্রবাসী আপিসে আড্ডা যা চলচে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ি, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাত ন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুক ও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়া ওঠা সম্ভব হত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ির—যেন দীনহীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ি। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাত বারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নির্জন। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে, 'অপরাজিত'র অপুর বন্য-জীবনের গোড়াটা লিখচি—তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারার কথা মনে হল—ভারি আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজার সকালবেলাটি; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হার্ডির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটি তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্তনও কি কম হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে—তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু—চারজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত 'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখলাম। খুব ভাল লাগল বইটি।

আজকার দিনটি বেশ ভাল কাটল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু দুপুরের পরে খুব রৌদ্র উঠল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী আপিসে গিয়ে দেখি অশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই সজনীবাবু গিয়ে গাড়ি করে সুনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, সুনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা জ্বলে উঠে একটা অগ্নিকাণ্ড হত, কিন্তু সুনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুটল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কলকাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক এক গাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌঁছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওখানেই মোটরখানা রইল, কারণ দিনকয়েক আগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চললুম, সুনীতিবাবু কাঁচা কোসো কুল ও সেঁয়াকুল খেতে খেতে চললেন, অশোকবাবু ছড়ি কাটবার কথা বলতেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুটল গাড়িতে ছুরি আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠালতলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বসল। তারপরে সইমার বাড়ি গিয়ে কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করে একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গল্পগুজবের পরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায় ছায়ায় এলাম সলতেখাগী আমগাছের তলায়—সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটে নিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলার বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়না-কাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেলুম কুঠিটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠি দেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষে কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না—বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠি দেখানো পুনরাবৃত্তিটা করলুম। তখন কুঠিটা আমার কাছে খুব গর্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আসতো, তাকেই নিয়ে ছুটতাম কুঠি দেখাতে। আজ বহুদিন পরে সজনীবাবু, সুনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠিতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক করতে পারলুম না কুঠিটা কোন জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তায় পড়ে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্তিকমাসেও একটা গাছে একগাছ সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানে ঝোপটি কি অন্ধকারই হয়েচে! সুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সবাইকে ডেকে দেখালেন—আমার বেশ মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সলতেখাগী তলায় যেখানে আমিই আজকাল কম যাই সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ সুনীতিবাবু, অশোকবাবু,

এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমাদের কুঠির মাঠে, আমাদের সইমার বাড়ির রোয়াকে!

সন্ধ্যা হলে তেঁতুলতলায় পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম—ময়না-কাঁটার ডাল-গুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—সইমার বাড়ি এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে সুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল—পরে আমরা বার হয়ে গিরিশদার বাড়ি এসে গেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট-ফেরতা লোক বসে আছে মোটর দেখবার জন্যে। খানকতক স্যাণ্ডউইচ্ ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁজোর জল খেয়ে-টেয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হল।

বন্ধুর বাসায় এসে দেখি তরু বেচারীর চৌদ্দ পনের দিন জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বন্ধু ফোড়ায় শয্যাগত—বন্ধুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দশার সীমা নেই। সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ি চালিয়ে রাত্রি সাড়ে নটাতে কলকাতার বাসায় এসে পৌঁছলাম। তখনও বাসায় খাওয়া আরম্ভ হয় নি—ঠাকুর তখনও রুটি গড়ছে। আমি এসে টেবিল পেতে লিখতে বসে গেলাম, আর ভাবছিলাম এই খানিক আগে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ির পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জ্বেলে বসে লিখচি, এ কেমন হল?...

যদি মোটর না থাকতো তবে কখন পৌঁছতাম?...সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেন ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পৌঁছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরনের আনন্দ পেলুম। ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরনের আনন্দ পেলুম যা আর কখনো কোনো trip-এ পাই নি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে ওঁদের নিয়ে ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বনভোজন করা হবে। সুনীতিবাবুও সে প্রস্তাব করলেন, সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠাকুরবাড়িতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে বেলা হল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখতে মনোমোহনে।

এ গেল কালকার কথা, কিন্তু আজ এমন অপূর্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকে যে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরনের বিষাদের ও উত্তেজনার আনন্দ হয় নি আমার।

কিসে থেকে তা এল? অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে দেবব্রত নাকি ছোট একটা ঘড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসের মনিটার তার হাত মুচড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে। দেবব্রত

এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললে; বললে, দেখুন স্যার, ওরা এত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়িতে আর আমি এইটুকু নিলাম। আমার হাত মুচড়ে ও কেড়ে নিলে?—হাতে এমন লেগেচে!

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজল। তখনি অবশ্য মনিটারকে বকে খড়িটুকু দেবব্রতকে ফেরত দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অনুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ!...দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান বুঝি। তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়, তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনিই জানেন। অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের সান্ত-দৃষ্টির নাগালে ধরা দেয়? মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েছেন—সেইদিনটিতেই আমার এই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। তারও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিলেন, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও কাঁটা তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা খেতে।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পর [illegible] আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট, সেই আমার দলের [illegible] শেষ হওয়ার দিনগুলো—কত কি—কত কি, তার পরে বিভূতির কত কষ্ট! আর আমার দেবব্রতের কষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা. অবশ্য হয়তো অনেক দুঃখ বাজে, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনা একটুও আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেইখানেই।

যাক। আজকের স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারি করতে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে, সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখা পড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনের আনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয়তো—নিরানন্দের দিনে এ কথা মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালির আঁচড়ে তা জানিয়ে দিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব অননুভূত অতীন্দ্রিয়, মহনীয়!—এ ধরনের গম্ভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি। করেচি হয়তো সে-দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিসের অত্যাচার করার কথাটা খবরের কাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেকদিন হয় নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ ও ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তের আমাদের ভিটাটার কথা মনে হল একবার···বেশ দেখতে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠচে হেমন্তের

দিনে—সেই ভিটা থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, তুপুরের রোদে যে আনন্দ-জীবনের শুরু, আমি এই ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট-মিট করচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগণ পতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠল, ঐ ছবি বিশ্বের অজানা-অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্ব শৈশব যাপন করচে আনন্দে, সহাস্য কলরবে, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরে তার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্রাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ-সুখের শুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যা কোনো দিন ধারণাই করতে পারে না। উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হল যখন এ ছবি আমার মনে উঠল।

আজ বুঝলাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনেটুনে কত করে, কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও, নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে জোর করে আনন্দ আনতে হয়, তা যাও বা একটু আধটু আনে—তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বুঝি বা হল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মুহূর্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না তা আজ বুঝেচি—সে সহজ—অর্থাৎ spontaneous.

আর ও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে—অর্থের মানে, যশের প্রাচুর্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখচি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিস দিলে—আমি আগে জানলে হতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ও নি,—যদিও সাহেবের কোনো দোষ ছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না—বেচারীকে যেতেই হল। এই বেকার-সমস্যার দিনে একজন Young man-এর চাকরি এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হল···সুবোধবাবু মুখটি চুণ করে বসলো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই।

আশ্চর্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্তিক পূজার ছুটির দিনটা বলে রমাপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশবাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ করতে লাগলাম যে, তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হল, আরাম পেলুম, বালতির পর বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে লাগলাম—এত গরম।

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কলকাতায় দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

অনেকদিন লিখিনি—বাজে জিনিস না লেখাই ভাল, অন্ততঃ এ-খাতায়। আজ দুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ি—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে Wide World Magazine দেখে আসি।

শাঁখারীটোলায় ভীমেদের বাড়িতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা করতে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হালখাতা করচে—তাকে ডেকে আদর করে ভারি আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আসচি। বেজায় গরম পড়েচে আজ কলকাতায়।

জীবনের সৌন্দর্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাবচি। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়চে ছেলেবেলায় যে টক এঁচড়ের চচ্চড়ি ও টক কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুম রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসে—সেই কথা। সেই মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটার কথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষ অনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা!···সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরাজেয় জীবন-ধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশে—ওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জ্বলচে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয়তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও তাদেরও সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, Globular Cluster-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব অজ্ঞাত সব জীবনধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে?···

এই বড় জীবনটা আমার···

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌঁছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনস্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে

বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি ?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণতর হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুনবে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ্য উৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বি-জয় ও বি-মৃত্যু-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে আবার আসন পাতবে। বিহার অঞ্চলে দেখেছি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাস একেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্যে ? যাই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাপের গোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু-হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি, মাস বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিংবা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর ?...

সেদিন গেছলাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিদুর সঙ্গে দেখা হল। আবার পুরনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। দুটোর ট্রেনে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং করলুম। রসিদকে আজ তাড়ানো হল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আপিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বন্ধু বলছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছলাম, যুগান্ত পরে যেন কথাটা আবার শুনলাম বলে মনে হল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাটলো। শীঘ্রই গরমের ছুটি হবে, কাল রাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয় নি, উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতে গেলুম—ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুম একটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হল আর বেশী দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি, জীবনে দেখেচি ভবিষ্যতের ভাবনায় সব সময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হল না। বেলা আড়াইটায়

সময় দরজায় শব্দ শুনে খুলে দেখি নীরদবাবু। তাঁর গাড়ি নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দুজনে উঠে একেবারে দমদমায় সুশীলবাবুর বাগানে। সত্যি, ওদের সাহচর্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সজীব মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হল—চা-পান সমাপন হল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্তী 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেছেন, 'শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো।'

ছটার সময় নীরদবাবুর গাড়ি করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপলবাবুর বাড়িতে। আজ খুব মেঘ করেছে, দমদমা থেকে আসতে মেঘান্ধকার পূব-আকাশের দিকে চেয়ে আমার পুরনো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াপানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি!...নীরদবাবুও গাড়িতে বললেন, কড়াপানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিল মনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর এলুম রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস্-ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এল—অশোকবাবু ও সজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি যাচ্ছেন সুবোধবাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ি চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকে আমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ি থেকে অনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওই দিকের বাঁশবাগান দিয়ে আসেন। কাল তাই যখন শাঁখারী-টোলার দখল-করা বাড়িটার সামনে পুরনো জমিদারী কাগজের মধ্যে ১৩১০ সালের একখানা পুরনো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হল,—আচ্ছা এমনি দিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হল, একটু নেশা-মত যেন!...কোনো সত্যিকার জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ি করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি!...ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখ দিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব-মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান্ ভালবাসা, গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটাকে অতি নিকটে আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সে অনুভূতিটুকু সঞ্চার করতে কৃতকার্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তো দেখানো চলতে পারে, খুব cleverness-এর পায়তারা ভাঁজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তা সত্যিকার বড় জিনিস হয়ে উঠতে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকার আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে।…ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আসচে—I am re-living my childhood days—কোন্ দিনটার কথা মনে আসচে আজ?…যেদিন বাবার সঙ্গে তমরেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠের চাটুয্যেদের জমি মাপতে যাই, প্রথম দক্ষিণ মাঠ দেখলাম—কত কুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আর যেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হল—এই দুটি দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু-ঘণ্টাব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে—মোটরগুলো জল ভেঙে যাচ্চে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব অনুভূতির আনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি। জীবনের সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!…

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি!

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনে হচ্ছিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির বিরাট কন্দুকক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীদলের উত্থান-পতনে—যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ বৎসর ধরে এই মহাশক্তিটি তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা অজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ করছেন তা বুঝতেও পারচি নে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখচি—তাও না জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায় সাতাশ বছর কতটুকু?…সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাঁদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণার পাত্র—নিতান্ত শিশু। কি জানি, কি বুঝি?…কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাই হয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব বৈকাল!…আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর সুবিধা করতে পারি নি। আজ একেবারে মেঘনির্মুক্ত, অদ্ভুত

বৈকালটি। কাল খিসুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা লওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরি—ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েচি। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব দেশ...এ ধরনের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদমাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না—এ সত্যিই Land of Lotos Eaters. এত ছায়া, এত পাখীর গান, এত ডাঁসা খেজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি—বেদনা-মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে?...শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্যে।

এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরা রেশমী সবুজ চুড়ির টুকরো চোখে পড়ল—কার? হয়তো মনির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন—এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়ে আছে। মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠির মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি এখানেই কিছু কম যে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিই কোথায়!...

বকুলগাছে পাখী ডাকচে—বৌ-কথা-ক', বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ি পিসিমা বললে, সে চারটি জাম দিয়ে গেল, তাই এখন খাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রা শুনতে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখি নি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ির ওদিকের ঘুঁড়ি পথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়ের কথাই আবার মনে হয়।

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে—তার মধ্যে বাস্‌খানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেনে উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা Vision দেখলাম—এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—Greatness of space. Undaunted travels of গ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না—কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে—লেখো 'রত্নগর্ভ' বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটি দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথে বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম।…বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়িটা আজ আটাশ বছর পরে আবার দেখলাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা করতে। স্থানটা আমার ভাল লাগে নি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই—আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটির তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষাপ্রবৃদ্ধ ঘেঁষাঘেঁষি। ননীর সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে খুলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেব।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ!…বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘের পাহাড় নানা স্থানে আকাশে। কেমন যে মনে হচ্ছিল, তা কি করে বলি।…বেলা পাঁচটাতে রবিবাসর ছিল প্রবাসী আপিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সে এল না। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরে যাবার পথে রাধাকান্তদের মাস্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে blackmail করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বললে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হল। হেমেন সত্যিই বললে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাততালি ও নাম কিনবার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরনো কথা বলতে বলতে শেয়ালদ পর্যন্ত এলাম—ওকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বললুম, পূজোর ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখা হবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেনকে।

চাঁদ ওঠে নি, কিন্তু আকাশে খুব মেঘ নেই। খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখচি। দূরের সেই মাকাল লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটি কি অপূর্ব হয়েছিল সেখানে ...কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম—কত পথে চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরা ভিটেটা কি ভুলেচি!...

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাব।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হল না। এত অপূর্ব জ্যোৎস্নাও কলকাতায় আর কখনো দেখি নি যেন—বর্ষাধৌত নির্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার খেলা! সারারাতের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারলাম না—গুন্‌গুন্ করে গাচ্ছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে"

—কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম—আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত!...রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল খোয়া পুকুরই বা দেখলাম কতকাল পরে। একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে।...এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ কষ্ট—Back-ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য—সহস্র tradition—এই সব নিয়ে।

সাধনার কথা বলছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টুইশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবীরদের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্তমান আমি কি এক ? অনেক বেড়েচি —সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।

ক'টা দিন বেশ কাটল। সেদিন হাওড়ার রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটা পার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশবাবু, নীরদবাবু সবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারে সকালে সকালে কাজ মিটতো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বললে, তোমার নাম সিনেট থেকে যায় নি। সিণ্ডিকেটের সেদিনই মিটিং—ছুটির পরে ফণিবাবু ও আমি দুজনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়িতে দেখা না পেয়ে ইউনিভার্সিটি—সেখানে দেখা হল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম। সেখানে থেকে ইন্স্টিট্যুটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকে Y.M.C.A-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি X. Libraryতে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাকে সেখানে না দেখে সোজা 'শনিবারের চিঠি' আপিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল—কেউ আসে নি। ওখান থেকে বাস্-এ চেপে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ি। তারপর অনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটির পরে সুনীতিবাবুর সঙ্গে engagement. সকালে সজনীর ওখানে গেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন। সেখান থেকে দুজনে 'শনিবারের চিঠির' আপিস —আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। প্রথমে এসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলারের আপিসে। কেউ নেই—পরে দেখি সাহেব রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম, একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করা গেল। তারপর হেরম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটমলি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা 'শনিবারের চিঠির' আপিসে। গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। সুনীতিবাবু এলেন— গল্পগুজবের পরে আমি, সুনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প করতে করতে বেরুনো গেল।

সুনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভার্সিটিতে, তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি এলেন। আমার বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বললেন।···তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় বসে আছেন—তাঁরা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটির পরেই বাসায় এলাম। অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাকলে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ি—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেই পথটা ধরে) বিডন স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম। মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবো না—যা শেষ হয়ে গিয়েচে, ওই সজনে গাছটা এখনও কার ফিরবার আসায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু-চারটে তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওই অপূর্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। মন্মথদের বাড়ি সভা হল। আমায় করলে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পরে বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতি কাছে বসে খাওয়ালে। পুরানো দিনের গল্প হল, সব চেয়ে কথা উঠল—'পুত্তলিকা' 'পুত্তলিকা' সে কথা হোল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরনো দিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে, থানাটার পাশ দিয়ে। একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী আফিসেও Sir P. C. Roy-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকে দেখে এমন স্নেহ একটা হল! আমার নাম উঠলেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরের বড় মাসিমা কাঁদেন, এই সব কথাও বললে। একটা চাকরির কথা বললে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন, সে কথাও বললে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দুজনে দমদমা গেলাম—সুশীলবাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দুজনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হল—মাঠে বসে চা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দুবাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অসমর্থ হলেন—মরীয়া হয়ে বললেন, সন্দেশটা ভালো নয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে নিয়ে নীরদবাবুর গাড়িতে নিউ মার্কেটে গেলাম। কথা রইল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবে দমদমার বাগান-বাড়িতে। Wide World কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম।

কিন্তু আজই মনটা কেমন উড়ু উড়ু, মায়ের সেই সজনে গাছটা,—ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ির কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরীতে। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল বেশী। সপ্তাহব্যাপী ছুটি। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আসচে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দমদমা। সুশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। সুশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুনবেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল না। যশোর রোডের 'পরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছানা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটি কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেনে চাপলাম—[illegible] বাসায় পৌছে দেখি তরু নেই। হেডপণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম—দেবেনের বাসায় গেলাম, তারপর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্পগুজব করে চাল্‌কী রওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমুলফুলের শোভা। বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেক-কাল দেখি নি। চাল্‌কী পৌছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদো সবসুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ি পৌছে দিয়ে আমি আবার গেলাম উত্তর মাঠে—তখন চারিধার কি নির্জন।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারা পথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কি অপূর্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল। সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম। তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বসলাম। আবার যাবো—রামপদ এল। তাকে একটু জল খাইয়ে দুজনে একসঙ্গে বার হাওয়া গেল। কি অপূর্ব শান্তির মধ্যে দিয়ে এসে পৌছলাম। আমি পটপটি তলার ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের পথে আসচি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুকনো খোসা ও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!...কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণদাদার বাড়ি এলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠলে চাল্‌কী চলে এলাম। ছেলেপিলেরা এল গল্প শুনবে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে। বৃষ্টি নেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্বত্র আমের বউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনী দাসের বাড়ি গেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াশা। সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। [illegible]।

'অপরাজিত'র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেছি। কিছু করবার নেই, হাত ও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে 'Wide World' খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফিরচি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে লেখবার জন্যে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটি ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলেপুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গ বেশ লাগে। ওরা সবাই শিশু—নীচু ক্লাসের ছেলে। আমাকে মাস্টার বলে ভয় ভক্ত করে না, যতটা আপনার লোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায় troubles খুলে বলে, বেশ লাগে। ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। নিষ্ক্রিয়, Death-in-Life ধরনের existence-এর চেয়ে এরকম স্কুল মাস্টারীও শতগুণে শ্রেয়।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম, না খেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতের পরীক্ষা নিলেম। তারপর ইউনিভার্সিটির সামনে সুধীরদার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হল—সমীর বললে ভালো লিখেচে। শৈলেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রমথবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্মাটা প্রেসে ছাপতে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে, সত্যিই স্মরণীয় দিনটা। ১৯২৬ সালের পুজোর সময়টা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি, মনে রেখেচি—কত কি করেচি। ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন-দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি—অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি

আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হল। এদের সকলের উদ্দেশে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দুখানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাই নি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখেচি, অদলবদল করেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্যসত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্বদা ভেবেচেন।—তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রানুদিকে—এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু-পাঁচজনেরও এতটুকু ভাল লাগে বই দুখানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসমাইলপুর থেকে সাবোরে আসচি ঘোড়ায় ভাবতে ভাবতে—নোট করতে করতে। কার্তিক আগুন জ্বাললে সাবোর স্টেশনে। সে জিনিস আজ শেষ হল? যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল—কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রি অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখতে লিখতে বহু দূরের অন্ধকার আকাশের জলজ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখচি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকারপটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে Examiners' Meeting-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দুজনে গেলাম লিবার্টি অফিসে। টমসন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায় 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করেছেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপর বাসে উঠে সজনীর বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে Sample কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষ করলাম।

স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো?

সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আনলাম। আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গল্প-গুজব করে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটি হল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্য হয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, কাজল, লীলা, পটু, রিনি—এরা সব আজ মনের বাইরে চলে গিয়েচে, কতকালের সহচর-সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্নে Wide World-পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।

ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠেচে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic করতে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জোৎস্না আধ-আঁধার রাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে।

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়লে—গল্পটা মন্দ হয় নি—সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথা ছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত হৃষিকেশ লাহাদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বা'র হয়ে বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেনে শ্রীরামপুরে গেলাম। সেখানে 'আনন্দপরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকে সঙ্গে নেব বলে ডাকতে গেলাম, পেলাম না। ঝম্-ঝম্ করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরে বেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গেল। লীলারানী দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনা'য় লেখেন। ওপরের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে শরবত

তৈরী করে খাওয়ালেন ও জলখাবার দিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ির কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ি। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম—কিন্তু লোক ফিরে এসে বললে কারুর সঙ্গে দেখা হল না।

সভায় যখন আসচি—ওদের বাড়িটা দেখলাম—ভাঙা দোতলা বাড়ি—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার কার্য শেষে আবার ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের বাড়ির দোতলার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলমূল, মিষ্টান্ন, শরবৎ সাজানো। এত খাই কি করে? এই শ্রীলীলারানী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আসচি। কে সে কথা শোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওঁদের কাছে করলুম—রসের বৈচিত্র্য ও quaintness হিসেবে।

ওরা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল—বাড়ি জিরেট-বলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, অনেক গল্প-গুজব করলে। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে। একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে-তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বোলবও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ির পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসত—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর আনন্দই পেয়েছি!…সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনি আছে—আমিই কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফণিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়িতে তাস খেলতে যাবে বলে—আনন্দ করচে ঝিটকীপোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েচে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাকতুম—আমিও ও-থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি একেবারেই। Sophisticated হয়ে পড়েচি, hampered হচ্চি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয় নি বলে এখনও এসব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের—আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দমদম্ থেকে ফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারে Outing-এর নক্সা করলাম, তারপর

আমি আর নীরদবাবু মোটরে ফিরেছি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম।

কন্‌ভেন্ট রোডটা অন্ধকার, এখানে-ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার-বিহার ও অর্থোপার্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে, তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—loyalty-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরনের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারি নে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক্। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসে-মোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমুলবন, পাখীর ডাক—নীল পর্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ—এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানবজাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থানপতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা—জানা-অজানা জাগতিক শক্তি,—এই X-ray, বিদ্যুৎ, invisible rays, high penetrating radiation,—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য, এই বিরাটত্ব, এই কল্পনার মহনীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু-মহিষের মত ঘাস-দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগ্যগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর করতে পারবে ?

মানুষের মত যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান্ বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুলতে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না, নিজের মধ্য-দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জড়তাকে প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য—সত্য নিত্যকালের মশালচি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং হল। রাত দশটার পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে আসতে গিয়ে লাউডন স্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেল ফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভিড়। অনেক কষ্টে রাত্রে বাড়ি পৌছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। চা পান করে দমদম্ থেকে

বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়িরও একখানা টায়ার গেল! বনগাঁয়ে পৌঁছে বাজার করে বেলেডাঙ্গা পৌঁছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নক্ত-হ্রদের ঘাট পর্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান করলুম। তারপরে সেদিন রাত্রে দমদমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে!

এবার বাড়ি গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণদাদার স্ত্রীর স্নেহ বড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষা-বাদলার দিনে পুঁটিদিদিদের বাড়ি গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল। ওখানে এবার তুকন্ ঠাকরুন মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হল। রোজ বিকেলে বকুলতলায় বসতুম। জগা ছড়া বলত—

"অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,
দুনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—
কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়,"—ইত্যাদি

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগত।

কিছুদিন কলকাতা গিয়ে রইলাম। একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। নীহার বললে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে। ধূর্জটীবাবুর বাড়িতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা হল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জিনে নোট লিখে। তারপর নীরদের বাড়িতে চা-পার্টি উপলক্ষে সুনীতিবাবু ও রবীন্ হালদারের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরের রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নামলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ি যোগাড় করে ফিরলাম। হাটবার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদাদের জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এরা পড়তে এল—বকুলতলায় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প করলুম। রিমঝিম বর্ষার মধ্যে মেঘভরা আকাশের তলা দিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপারে বর্ষাস্রোত বন, গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জল গরম—নেমে স্নান করতে করতে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথার উপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটার রূপ—মনে হল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূরপ্রসারী প্রান্তরের সেই সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা-সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতীর পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি

জলে সাঁতার দিলাম। মনে হল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাই নি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে। সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটে নাইবার সময় ঘাটের ধারে যে গাছগুলো আছে, ওদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু-এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড় শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই!···

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টি ছিল না, সুন্দর মাঠ তৃণাবৃত, সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটি রাখাল ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, নদীজলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠীর পথে একটা ঝোপের মধ্যে একটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়—এক সময়ে এরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।...

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশতলার দিকে যাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলি প্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয় নি। পরশু পর্যন্ত আছে। কিন্তু খুলবার সময় হয়েচে। মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটি এ রকম করে কাটল। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদা কথা।...

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুকটুক্ করছে, যখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম। খুব কষ্ট হত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘের ছায়া!···ঘাটের পথে খেজুর গাছটার খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজলে দু-একটা পাওয়া যাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা করতুম, খুকু sentence লিখত, জগা ছড়া বলতো:—

'এঁতল বেঁতল তামা তেঁতল

ধরতো বেঁতল ধরো না'—

কি মানে এর, ও-ই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি করত!···শিবু ও সুরো ধনুক-বাণ নিয়ে যাত্রা করতে আসত, খুকু কত রাত পর্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুনত,—জ্যোৎস্না

উঠে যেত তবুও সে বাড়ি যেতে চাইত না। এক একদিন আবার দুপুরে এসে বলত, গল্প বলুন। আসবার দিন বকুলতলায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, sentence করতে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখব।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েছে, ভিটেটাতে বড় বেশী জঙ্গল হয়েচে—অপু" যেমন বইতে লিখেচি।

কুঠীর মাঠে গিয়ে এক-একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া, বড় চমৎকার লাগত। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগত ভালো। ও-পাড়ার ঘাটের সামনে সবুজ ঢালু ঘাস-ভরা মাঠ ও আঁকাবাঁকা শিমুলগাছটা যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলত চোখের সম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝবে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা-ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকত, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্যবার এত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখি নি—তার মুখ ভুলেই গিয়েছি—এতকাল পরে এইবার দেখব।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছলাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোর কত খেলা করলুম। খুকী কত ফল তুললে, পাতা তুললে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম; খুকী রাঁধলে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই।* খুকী কিন্তু পড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প করছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে। রাত্রে এই দিন বন্ধুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে! চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসে ছিল—কতকাল আগে! সেদিনে আর আজকার মধ্যে কত তফাত তাই ভাবি। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বেড়িয়ে এলাম—বোর্ডিং-এর সব ঘরের সামনে বেড়ালাম। কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আসছিল—একটি ছোট ছেলে বর্ষার জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্যে বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে—এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারচে না ভর্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে?

সেই ছোট ছেলেটি চব্বিশ বছর আগেকার আমি—কিন্তু সে এত দূরের ছবি, যে আজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

* খুকু এবং খুকী এক নয়,—খুকু থাকে বারাকপুরে, আর খুকী বনগাঁয়ে।

ওঃ, এবার যেন ছুটিটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে। সেই কবেকার কথা, সুশীলবাবুর স্ত্রী বটতলায় ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তারপর গোপালনগরের বারোয়ারী, তুফন্ ঠাকুরুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা। বড় চারার আম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়ে খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে গাছপালা ও বাঁশবনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারে শৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্তে।

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান্! এর তুলনা দিতে পারি নে।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল, ইউনিভার্সিটির একটি brilliant ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আসতে আসতে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ি কাঁঠাল-খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেচে। বৃষ্টি আসচে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক করলুম এই ঘরটা আমি একলা নেব। এ বৎসরটা খুব পড়ব, লিখব, চিন্তা করব। Prescott's Peru, Shackleton's Voyages ও Historiography-র ভালো বই এবার পড়তে হবে—যদিও Prescott আমার পড়া আছে, তবু আর একবার পড়ব। চিন্তায় যে নির্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাকলে হবে না। Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বাক্সটাতে, সে বাক্সটা কতবার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাই নি। আজ পালিতদের তারাপদবাবু এলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়ে আছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সব দিক থেকে পরিবর্তন। জ্ঞান মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছা-পোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়ে বাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেচি। সেটা যখন আমার কর্তব্য, তখন তা আমায় করতেই হবে, স্বার্থপর হতে পারব না কোনদিন।

আরও পরিবর্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাই নে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—থাক ও-কথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করে দেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে! মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি 'উদয়ন')—তাকে বললুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে-বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হলে সেখানে কি করে বাস করব? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝি নে—বনগাঁয়ে হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম —জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাকব কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচেছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে?"—ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোলতলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে? ওর রিকেট্‌স্ হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি—ও-শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—বয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite! কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য—খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকার প্রজ্জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য,

তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচি-মুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলচি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েছে—সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য, অস্তিত্ব, অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি—কিন্তু ভাষায় বোঝান যায় না।

* বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙামাটির টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনের আনন্দ পাই নি—কলকাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারা রাত ও আজ সারাদিনের মাঝে বন্য-সৌন্দর্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুপ ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্ স্টেশনের অরণ্য-নদী-পর্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শাল-পলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ, কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই, মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কী নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান করলুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাই নি।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব!

ডাকবাংলো থেকে লোক জিজ্ঞেস করতে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাব।

† সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরনা। সিরসির করে

* সম্বলপুর

† বিক্রমখোলের পথে

পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্ছে। তারা বললে, পাটোয়ারীর ছেলে এ-পথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে। শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া। এখানেই সবাই উড়িয়া বুলি বলচে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হলদে হয়ে আসচে। প্রিগোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৭।৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পৌঁছলাম। বিক্রমখোলের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখবার জন্ত আমরা এখানে এসেচি। লেখাটা ভারী চমৎকার জায়গায়—একটা Limestone-crag এর নীচে ছায়াভরা জায়গার প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত—তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারের বন যেমন গভীর তেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরনের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিগোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্তে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব নীল আকাশ অরণ্যের মাথায়—কি অপূর্ব নিস্তব্ধতা · পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়িতে উঠি। আবার কলকাতায় যাই।

প্রিগোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখানা দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পৌঁছলাম। একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ি করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিম্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্তে দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্তে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখাশুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোন অদৃষ্টপূর্বক জীব ভেবে এখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে। প্রমোদবাবু মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছে—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখন দেখে নি বোধহয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধের জন্ত নাচ হল পথের ওপর—ঝন্-ঝন্ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখে আমি পরিমলবাবুকে তাড়াতাড়ি snapটা সেরে নিতে বললুম।

নাচ গান শেষ হল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে। আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়িতে ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম। দেখলাম—আর্যাবর্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। B. N. R.-ই দেখ না কেন—সেই খড়গপুর থেকে

আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটি, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এই চারশ মাইল—এর পরও চলেচে আরও চারশ মাইল—চারশ মাইল কেন, আরও আটশ মাইল বম্বে পর্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্যাবর্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine meadows, ভারতের প্রকৃত রূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি নে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলা কমনীয়, শ্যামল, ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এ সব দেশের মত রুক্ষভাব ওখানে তো নেই!

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুকরোর মত জ্বলচে!···বিরাট—বিরাট—প্রকৃতি এখানে শিবমূর্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার, মহিমময়, বিরাট। বিরাট is the term for it.

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগত, বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত! Poor mite, what chance had she—a helpless thing?

কিন্তু বনের ওই হলদে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিস বোঝা যায় না, তর্ক-যুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি ফুটে ওঠে, নির্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝান কি যায়?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসে নি। আমি একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সামনে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জ্বলচে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগলাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েকবার উঠে এসে এসে বাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখতে হয়েচে!···

অনেক রাত্রে আমরা স্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেনটা এল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হল কুলুকা স্টেশনে। কি অপূর্ব পর্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য। এমন Wilderness আমি খুব কমই দেখেচি। যে স্টেশনে আসি—সেইটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল। নোটবুকে বসে বসে নোট করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা স্টেশনটি বড় সুন্দর

লাগল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশী। পঞ্জাপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটি এ হিসাবে বেশ ভাল।

বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে বিরাটত্ব নেই, majesty নেই—হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে না। এতে মনে তৃপ্তি আসে—ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা ভাবায়, নানা পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না করতে চায় তার সব উপকরণ জোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জাবনতা পল্লীবধূটি যেন—তার সবই মিষ্টি, কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়, আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুক্ষ, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি—সেটা বাংলার নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা?···সেও অপূর্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা-খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কলকাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল সন্ধ্যায়! আমার আবার একটু দেরি হয়ে গেল। সুশীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী আফিসে আমায় Phone করেছিলেন—খাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁর বাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিসের দোকানে আজ আবার দেখা হল। কদিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়চে—বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবনী ও টাটানগরের মধ্যবর্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হলদে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাবচি ওইখানে যদি একটা বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জন মাঠ বন, অরণ্যানীর মধ্যে।

অপরাহ্নে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাবলেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়িতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করে এলুম। সারা পথে মুচুকুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটা গাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রঙের ফুল ধরেচে। বড় লোভ হল—ট্রাম থেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বললে—নেহি। সংক্ষেপে বললে, আমায় সে মানুষ বলেই মনে করলে না। আবার বললুম—দু একটা ফুল নিয়ে আসতে পারি নে? তলায় তো কত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত Contemptuous ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বললে—নেহি।

ভাল, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেব এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ি। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম শ্যামাপ্রসাদ

বাবুর বাড়ি। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখলাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁর লাইব্রেরী ঘরে কি কাজ করছিলেন। সেখানে খানিকটা থাকবার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাবছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।...বাঁশের শুকনো পাতার কথা কেন এত মনে হয়, তা বুঝতে পারি নে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখলুম—তখনও বাঁশবনের কথা ও শুকনো পাতার রাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সব দিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছে অদ্ভুত ধরনের wild আনন্দ।...

বেলা পড়ে এসেচে। গোঁসাই পাড়ার নারকোলতলায় আজও তেমনি মেলা বসেচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কি ও কদ্‌মা বিক্রী করচে, গোপালনগর থেকে হয়তো যুগল ও হাজরা ময়রা তাদের তেলে-ভাজা জিবে-গজা ও জিলিপীর দোকান নিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটা আজও আমার মনে আছে। পুরনো খাতাখানা আজও আছে, নষ্ট হয় নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশী—মনকে বড় পীড়া দেয়। এদের মন চারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুলবার অবকাশ নেই। আবালবৃদ্ধ-বণিতার এই দশা দেখচি। এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্যবর্জিত—স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য—এ অন্য ধরনের। কিছুদিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন পাহাড়ের সৌন্দর্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝলাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য more tropical—এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশী। নীল আকাশ ওখানেও খোলে—মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য মনে অপূর্ব শিল্পরসের সৃষ্টি করে—মনে বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই, ঠিকই—কিন্তু Poetry of Life এতে যেন বেশী। বাঁশগাছে ও শিমূলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নি—a feast of green—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানাবর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু

পূর্বে মেঘ-চাপা গোধূলির আলোয়, গাছে পালায়, শিমুলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কি যে শোভা।…

একথা জোর করে বলতে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশ দেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেক বেশী বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম। একথা ঠিকই যে বাংলার রূপ যতই সুন্দর হোক, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্যের চেয়েও এর সৌন্দর্য বিরাট ও majestic। বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপ-পরা ছোট্ট মুখটি। কিন্তু এদেশের highland-এর রূপ গর্বদৃপ্ত সুন্দরী রাজরানীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in the theory."

Einstein,

Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933.

Lucian's Satires,

Celsas (178 A.D.) writes :—

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their Teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualifiation for conversion are ignorance, and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy,

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of men are yet to come : look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day ; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'-র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেচি। অনেক পূর্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়ি নি—কিন্তু কি চমৎকার মিল পড়েছে !]

অনেকদিন লিখি নি, মনেও ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হল তাই সামান্য এতটুকু লিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্ততঃ খাতায় থাকুক।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌছেচি। এবার পুজোয় এখানেই আসবো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ির ঝাঁকুনিতে বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগে যে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে স্টেশনটা আজ রাতে—শেষ রাতে বেরিয়ে চলে গেচে, দেখতে পাই নি। বিলাসপুর পর্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর স্টেশনে আমরা চা খেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্যন্ত প্রায় একই একঘেয়ে দৃশ্য—সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে থেকে অন্য চক্রবালে পর্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া ! ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা স্টেশন পর্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপর আবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিক চক্রবালদেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্নারাত্রে ও অন্ধরাত্রে যে অদ্ভুত দেখতে হবে তা বুঝতে পারলাম—তবু মনে হল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য যা বাংলাদেশে আছে, তা এসব অঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন-ভোলানো রূপ এদের কৈ ? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় স্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমন অনাবৃত শিলাস্তূপ, অত গম্ভীর-দর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দুজনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলাম। হাওয়া কি সুন্দর। দুজন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টি সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতাশ মাইল প্রান্তর, অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে বারাকপুর। হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করে ফিরচে, আর বলতে বলতে যাচ্চে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন ?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কি অজানা গাছগুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেই আবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়মে অনেক পুরনো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটি খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাসপুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখলাম, ভারী কৌতূহলপ্রদ জিনিস বটে। একটি জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখব না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্চে আজকার বিকেলের মোটর ভ্রমণটি।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিশিষ্ট স্থান আছে সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেও নি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য, তা লিখে প্রকাশ করতে পারি নে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন। বহুদূরে, দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে চাই, ধূ-ধূ বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু-চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব নীল আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে—পিছনের পাহাড়টি ক্রমে গাড়ির বেগে খুব দূরে গিয়ে পড়চে, তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসচে—সামনের শৈলমালা ফুটে উঠছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবলডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য যে ধরনের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশে, সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়—সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরনের অবর্ণনীয় সুমহান, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এসব দেখি নি, কাজেই উড়িষ্যাকেই ভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বন না থাকলে আমার চোখে সে সৌন্দর্য সৌন্দর্যই নয়—কিন্তু বন না থাকলেও যে এমন অপূর্ব রূপ খুলতে পারে, এমন Superb অনুভূতি মনে জাগাতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বললে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সামনে কলকাতার

ঢাকুরে লেককে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব? ম্লান জ্যোৎস্না উঠল। যোগপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেচেন 'মুলো' —সে চুপ করে থাকলে আমরা আরও অনেক বেশী উপভোগ করতে পারতুম।

আসবার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্চে—দুধারে সেই রকম immensity। মনে হল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখন এই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কি, নারকোলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়ে খেতে খেতে প্রতিমা দেখচে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজনে গাছটার কথাও—সেই সজনে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্-টাউনে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। নাগপুরে বাঙালী এত বেশী তা ভাবি নি; ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ করলে—কিন্তু নীরদবাবুকে রুগ্ন অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশীক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। আমরা মহারাজবাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েচে—দুধারের মাঠ ছাপিয়ে জল উঠেচে—তারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ,— বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই—নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দর লেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হল সে যত সুন্দর হোক, তার বিরাটতা নেই—তা pretty বটে, majestic নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখচি। প্রমোদবাবু বলচেন, সূর্য ঢলে পড়েচে শীগগির লেখা শেষ করুন। এখান থেকে আমরা এখন রামটেক্ যাব। কি গভীর জঙ্গলটাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কৈদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্বতমালা বেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেচি। পাহাড়ে যখন মোটরটা উঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা-তা লিখচি। সূর্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী রামটেক্ দেখতে যাব। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্চেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরের ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েচে—হর্ন দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাই নি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের

সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দুজনে খেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ন দিতে দিতে এল। প্রমোদবাবু ছড়ি ফেলে এসেছেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আনতে গেলেন। ফিরে বললেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্ণের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। এখান থেকে মোটর ছেড়ে শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেকে যখন এসেছি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য অস্ত গেছে। অপরাহ্ণের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম—এই সুন্দর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠবে, এই নির্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেচি, বেশীক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানুশোভা উপভোগ করতে তো পারব না! পথ খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো —কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয় না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখলে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্বশেষে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরা বসলাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্‌সী হ্রদ, পূর্বে পূর্ণচন্দ্র উঠচে, চারিধারে থৈ-থৈ করচে বিরাট space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানে নহবৎ বাজে, এক ছোকরা বাইরে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুটল। আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবু তো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ের নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করচে। মন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভারী ভারী গড়নের পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম—সেকেলে ভারী দরজা, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দুপাশে ছোট ছোট ঘর, পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধূলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রামসীতার মন্দিরের দরজার পাশে অনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বললুম—এত বন্দুক কার? সে বললে—ভোঁস্‌লে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁস্‌লা এই বর্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্‌লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আসবার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠে নীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখলাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, একটা ছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটি কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোন ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান! এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যময় গলিঘুঁজি,

উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনান্ত দেশ। আমার পক্ষে তো একেবারে স্বর্গ। ঠিক এই ধরনের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেচি অনেকদিন ধরে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য অনেক বেশী, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড় অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটি আমার বড় ভাল লাগল—চারিধারে একেবারে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলা ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায় নি। আম্বারা গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাড়ের মধ্য দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্ধ আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালী আতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে তর্ক হল, আমি বললুম—ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদবাবু বললেন—না, নাগপুরের।

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাই নি। রামটেকের মধ্যে ঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়িতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতে খেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরে আমার গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজচে। লক্ষ্মীপুজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চে বাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে। রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুটল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আসবার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁকা-বাঁকা, উঁচুনীচু পার্বত্য প্রদেশের কঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়ে মোটর তীরের বেগে ছুটে চলেচে—প্রমোদবাবু বললেন, a glorious drive.

রামটেক্ স্টেশনে নাগপুরের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনও সাড়ে আটটা বাজে নি। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল স্টোনে পড়লেন—নাগপুর ২৮ মাইল, মান্‌সার ২ মাইল। দেখতে দেখতে ডাইনে মান্‌সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জন শৈলশিখরে, এই ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একা একা তাদের জীবনের অপূর্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরের বাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতালা বাড়ির কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যখন খুশি সেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই

জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে। মানসারে যেখানে নাগপুর-জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা P.W.D. বাংলো আছে, সামনে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটি অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্বতের ওপর মোটর গাড়ী উঠিয়ে নিয়ে গেল—অনাবৃতদেহ পর্বতপঞ্জর রৌদ্রে চকচক করচে, খাড়া কেটে ধাতুপ্রস্তর বার করে দিয়েচে—সামনে schist ও granite—নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গে দু টুকরো ম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজ-চাপা করবার জন্তে। তারই মুখে শুনলাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডে অনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে। সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য নাগপুর-অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কানহৌলি ও বোরি নদীর উপত্যকাভূমি ধরে যদি বরাবর সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মানসার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দুধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করচে—আকাশে দু-দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পর, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কামটি এসে পড়লাম। পথে কান্‌হান্ নদীর সেতুর উপর এসে মোটরের এঞ্জিন কি বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা কান্‌হান্ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেনে মোটরে একটা রেস হয়—কিন্তু তা আর হল না, ট্রেন ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কামটিতে এঞ্জিন আবার বিগড়ালো একবার, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক হল। তারপর আমরা নাগপুর এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্চে।

কিন্তু কিন্‌সী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলি নি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন আরণ্য প্রদেশটি আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহা! ঐ বনের শিউলি গাছগুলোতে যদি ফুল ফুটত, আরও যদি দু-চার ধরনের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরো নিবিড় হত—কিন্তু এমনি কত দেখেছি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাব, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুটব, আবার অপকৃষ্ট 'ক্যালকাটা কেবিনে' বসে চা ও ডিমের মামলেট খাব—তখন এই বিশাল পার্বত্যকায় সরোবর, এই শরতের রৌদ্র-ছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌সী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহু-কাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচি নে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখচি আমি এ পর্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কাটনি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগরিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরীতেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্নী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য ও বিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাব। আজ রাত্রে নির্জন বাংলোর বারান্দাতে বসে জ্যোৎস্না-ভরা কম্পাউণ্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেই পুরনো বইখানা, সিদ্ধেশ্বরবাবুদের আফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা, তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিসনটা—সেই রোকড় খতিয়ানের স্তূপ, ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালের বম্বে মেলে প্রমোদবাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হল, তাঁর বাড়ি খড়্গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বললুম, মতি-কাকার কাছে আমার নাম বলবেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। South Tiger Gap Road দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় শাঁকোর ওপর বসলাম। সামনে ধু-ধু প্রান্তর, দূরে দূরে শৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মানসারের ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙ ফুটল। আমার কেবলই মনে আসতে লাগল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থানং'···শ্লোকের টুকরোটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাবলাম আমার উত্তর-পূব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মির্জাপুর ও চুণার পড়ে আছে—পশ্চিম ঘেঁষে প্রাচীন অবন্তী জনপদ · পূর্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সামনের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে—ঐ হল মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবান পর্বত। এই যেখানে বসে আছি, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবি ভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি জড়ানো প্রান্তর, অরণ্য, শৈলমালা দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জনে বসলেই মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়।

পূর্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না-শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্য শিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—তিনজন বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা—তারা আমার বাংলোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবল্‌ডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানে রেডিওতে কলকাতা Short Wave ধরেচে, বাংলা গান বাজচে—একটু পরে রেডিও স্টেশনের বিষ্ণু শর্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্মার গলা এখানে এসে পৌঁছলো—যে মুহূর্তে সে গার্ষ্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বললে সেই মুহূর্তেই। রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভব করি নি—কলকাতায় বসে শুনলে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা বড় একটা মনে আসে না।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসে বসে 'The Story of the Mount Everest' বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকলে দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবল্‌ডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও স্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে গোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র, বালাঘাট পার্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর, fossil, জব্বলপুরের অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনালুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দ্‌ওয়ারা জঙ্গলের বাইসন বা গৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরানী লোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা হর্ষ ঘোষের পুত্র রাজপ্রসাদের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশে পুত্রের আত্মার সদ্গতির জন্ম তিনি যে মন্দির নির্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখচি। এখনি চা খেতে যাব।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ডুগ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেস্ট দেখব বলে আমরা রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রকাণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমন এক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর এল না—ডোঙ্গরগড় স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হল না—জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পৌঁছুলাম—বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগল যবে আমার ছোট তরী,
ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুটি চরণই বার বার মনে আসতে লাগল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য অস্ত গেল, চালতেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখলাম—এবার কিন্তু চোখে লাগল না তেমন। কেন এমন হল কি জানি?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C. P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে ; কিন্তু ভূমিসংস্থান বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল,—এ বড় বেশী। লোকেও ভূমিশ্রী বর্দ্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ আদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে, যখন জলে থৈ-থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষার সৌন্দর্য নেই, কিন্তু অস্বস্তি ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছপালায় মনকে বড় চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কলকাতায় বড় ভাল লাগচে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন : সকালে বিশ্বনাথের মোটরে গোপালনগর গিয়েছিলাম—তারপর লাঙ্গলচষার প্রতিযোগিতা হল, ছেলেদের দৌড় হল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগচে এবার! কাল হারাণ চাকলাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—মাঠের মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্চে। একটা ঝাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সামনে অপরূপ রঙে রঙীন সূর্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটির সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কত কৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিকচক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে ঘনোরী তেওয়ারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিন আজকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুদের সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড় গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ির চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগল। ভেবেছিলাম এখানে আর আসা হবে না। সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হল,—বিশেষ করে সেই শীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগ রয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতে রদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলাম মালীর ঘরের সামনে, নীচের ছাদটার ফলসা গাছের ডালে সেই অপূর্ব অবনমন দেখলাম, যা ওই ফলসা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এ সৌন্দর্যভঙ্গি দেখি নি কখনো—বাগানের পাঁচিলের ওদিকে

পাটের কলে নিবারণ মিস্ত্রীর সেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিনে গাঁদাফুল-ফোটা নিকানো দুপাশে তকতকে উঠোন,— সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগল আজ বেলুড়।

সন্ধ্যার আগেই মোটরে চলে এলাম কলকাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেকদিন পরে আজ আমড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন চিনি নি—আজ চিনেচি।

এবার ইস্টারের ছুটিটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীল ঝরনার যে উপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রানীঝরনার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতির গ্রামে আবার বেড়িয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়গাছি ঘাট। সারা পথের দুধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র—তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুল টুপ টাপ ঝরে পড়চে। রাখামাইনস ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন বেশ ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়গাছি ঘাটটা বড় চমৎকার,—এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরনা আছে—তবে এখন ঝরনাতে জল খুবই কম। ওদিক বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্নারাত্রে যে এসব স্থানের শোভা অপূর্ব হবে সেটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়িতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশী আরামের। বাংলোর সামনে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কলকাতাতে ফিরব।

কাল রাখামাইন্‌স্‌ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনের মধ্যে দিয়ে অস্তসূর্যের আলোয় রাঙানো সুবর্ণরেখা পার হয়ে। আজ সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠল তা মোটেই টের পাই নি—স্টেশন থেকে এসে দেখি চাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে স্টেশনের পথের ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ পাথরের চাঁইগুলো, ছোট বটগাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরাম গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বললে ঠিকরী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হল না, পূজার সময় যাব।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারের রামনবমী দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশ বনে কিরকম শুকনো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চটকাতলা খালের উঁচু পাড়ে কিরকম ঘেঁটুফুল ফুটেছে, রঘুদাসীদের বাড়িতে ওরা আবার এসেচে, পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তারপরে খয়রামারির

মাঠে সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখতে গিয়েছি—রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেড়িয়ে এসেছি আর ভেবেছি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডির বাংলোর পিছনে বসে লিখছি—রানীঝরনা নেকড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাখামাইন্‌সে দুরাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখলাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাকলে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়া দেয় না, কেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদের চিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্ব জিনিস সেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের সূর্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুংরি পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনির তলায়, সম্মিলিত সিগারেট ধূমের কুয়াসার আড়ালে।

তাই বলচি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাব। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নেয়ে আসবো—অনেকদিন পরে ওতে বড় আনন্দ পাব। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছ শীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকচে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগচে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসেচি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এবার বেশী করে চোখে পড়েচে। সমস্ত গ্রামটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়িতে কোন গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠীর মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এসবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠের মধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব। এমন সবুজ মাঠে, উলুফুল ফুটেচে চারিধারে, শিমুলগাছ হাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্তশীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখীর পুচ্ছের মতো বাঁশবনের মাথা দুলচে, এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কালবৈশাখীর মেঘ,—তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি

নদীর ঘাটে চলে গেলাম। পথে জেলি বললে শিগগির নেকো তলায় যান, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখতে চাই। নদীজলে নামবার আগেই বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগলাম কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙে পড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বক্ষেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্চে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল ডালপালা ওঠা শিমুলগাছ, সাঁইবাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করব—ঐ ঝোড়ো-মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা-আপনি নুয়ে পড়তে চাইল। এ ধরনের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে। এ Realisation যেমন দুর্লভ, তেমনি অপূর্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই—পথঘাট এখনও শুকনো খটখটে, অন্যবার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠীর মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুল [illegible] [illegible] আসচে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমন জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচি এসেচে। সে, আমি, খুকু, রাণু মায় ন'দি ক'জনে কাল বসে কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের চর্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ঘাটে স্নান করতে এসে দেখি ওরা সবাই ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়ে গিয়েচে প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আসচি, কালো তখন গেল শিমুলতলাটার কাছে। আমি বললুম, তোর মা ঘাটে তোকে ডাকচে। সে 'যাই' বলে একটা বিকট চীৎকার করে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমায় ডাকচে—বাঁশবন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেচে—ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময়ে মনে কি যে এক অপূর্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনের জীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সার্থক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তার ঐশ্বর্যে।

আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি করে ন'দির হাতে এল—তার কোন

খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে—

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি
করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখান হাসিটি
বহুদূর জগতে গিয়েছে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া
ভালবাসা সব ভুলে গেছে···

চৌদ্দ পনেরো বছর আগের এমনিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষায় কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে। ..

যাক। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেল পাহাড়ের স্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখি শ্যামাচরণ-দাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর বিরাট ওর অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে···খুকুকে বললুম, ঐ স্থাখ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিগ্যেস করলে—তবে তার বয়েস যদিও খুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকে বোঝাতে পারলুম কোন্‌টাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্চি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্নাঘরের ওপরে। রাত অনেক হল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বললুম, আলোতে তেল নেই।

নইলে ঘুম হবার যো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।

লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল, আর রোদ ওঠে নি। মেঘ ভরা বিকেলে শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ির সঙ্গে দেখা হল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে, বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?

—না, নেই। বিড়ি খাই নে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাব না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোনো একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ও কি বনই এঁকেছে!

প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব ধরনের—যখন বিলিতি Grand Evening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরনের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন বাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে-কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্চিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে আর কোনদিন হয় নি। তার মাথায় একটা তারা উঠেচে—দূরে কোথায় একটা ডাহুক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করেচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল—সেদিনও বঙ্গশ্রী আপিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহ জেগেচে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম, যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম সব ধর্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদলা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারের বেলে মাটির পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটির খেয়া পার হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ি পাটুশিমলে বাগান-গাঁ। কাল সুন্দরপুর পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে—ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্য দেখে আসচি, কিন্তু ও পুরনো হল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুর পেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙার মাঠে মরগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে-আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বললে মোল্লাহাটির হাটে পটল কিনতে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফিরলে যে?

—কি করব বাবু, ছ'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না। গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায় নি। যে দুর্বচ্ছর পড়েচে বাবু!

কলকাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনে আনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড় উঠল। হাজারী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আম কুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিন্থকে গাছে, চারা বাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বর্ষাস্নাত গাছ-পালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গাতে। সেখান থেকে যখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশে কালো কালো মেঘ উড়ে চলেচে—আমার মনে হল আমিও যেন ওদের সঙ্গে চলেচি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সে গতি—পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়ের তলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য, মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে অমিত-তেজে চলেচে—দিক্‌পাল বৈশ্রবণের বিশ্ববিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি এলাম।

আজকার সন্ধ্যাটি ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাকলে ভাল হত—কত থাকলেই তো ভাল হত—সব সময় হয় কৈ ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হল। আমি কত নিঃসঙ্গ নির্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয় থেকে কতদূরে। কিন্তু ১৯২৩—২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরনের বেদনা-মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আর কখনো হয় নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ও পরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে—আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না। বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার পুলের পথে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারা আকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমুল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙ্গার ওপারে সেই খাবরাপোতার দিকের আকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণ-শ্রী, সূর্য বোধহয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারা গাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙার পথে মরগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছটা যে কোথায় গেল !

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠির মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসি নি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতার দিলাম।

এবার বারাকপুরে চমৎকার ছুটিটা কাটল। সমস্ত ছুটিটাই তো এখানে রয়েচি। আর

বছর এখানে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলাম—বনগাঁয়ে ছিলাম বেশীদিন। এবার এখান থেকে কোথাও যাই নি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কলকাতার জীবনটা যেন ভুলে যেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টিমাথায় বেলে-ডাঙ্গার পুল পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপরে নদীর জলে স্নান করতে নামলাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্যন্ত গেলাম।

সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাই নি কোনদিন এবারকার গরমের ছুটির আগে। কুঠীর মাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালো মেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ,—গাছে পাতায়, ডালপালায়, ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জন প্রান্তরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুব ঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতে নেমে মাঝ জলে গিয়ে ওপরের একটা সাঁইবাবলা গাছের ওপর রোদের খেলা দেখছিলাম—কি অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব সোনার রং রোদের।···সকলের চেয়ে সেই সাঁইবাবলা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।···তারই পাশে ওপারের কদম্বগাছটাতে বড় বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে··· শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটি বর্ষাদিনের প্রতীক্ স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমে ইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্যন্ত উঠবে, ঝরা কেশররাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে...উলুবন আরও বাড়বে···আমি তখন থাকবো কলকাতায়, সে দৃশ্য দেখতে আসবো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মতো। এবার ছুটিটা কাটল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটিটা উপভোগ করা গেল এবার। কলকাতায় থাকলে আমার যে আফ্রিকা দেখবার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখবার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে দু' পাশের বাঁশবন, সাঁইবাবলার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুর মাঠের দৃশ্য, পাখীর অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসে লিখচি, রাণু এসে বললে—দাদা এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বলচে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার বার একথা বলেছে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলি নি একটি দিনও—ও খেলতে চাইলেও খেলি নি। ভাল করে কথাও বলি নি।

বললে—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসবেন তো?

আমি বললাম—যদিই বা আসি, তোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তুই তার আগেই তো চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কলকাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেচি। রাখামাইন্‌স্ গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একা মেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সাটকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকেও বড় একটা সাহস করে না—যখন একটা ছোট পাহাড়ী ঝরনায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্চি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলু ঝরনার শব্দটি মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগছিল। পাহাড়ের saddleটা যখন পার হচ্চি তখন ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর্-ঝর্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুমান আম্রকূট' কথাটি বার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্‌স্-এর বাংলোর পিছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টার মাথায় অস্তগামী সূর্যের আলোতে বসেছিলাম; ওদিকে রাঙা রোদ-মাখানো সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ের Ledge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুর বাংলো দেখা যাচ্চে—সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝরনার ধারে একটা শিলাখণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেট কিনতে। আশ্চর্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেবের বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়া দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদের বাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেকড়েডুংরি পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ি গিয়ে গান শুনলাম আবার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লে না। ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে সুবর্ণরেখা

রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম রাখামাইন্সের বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা—সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিম তীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি —প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে সাটকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তারপর দিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চার নম্বর খাদানের নীচের জঙ্গলের মধ্যে পিকনিক্ হল। খুকু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটি মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণ করলাম। একেবারে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। একটা অম্লমধুর বনফলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলায়—তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে।

সেদিন আমি স্টেশনের বাইরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বট-গাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখীর গান শুনছিলাম।...

বেলা পড়ে এসেচে...বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্ছে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল। বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়া যায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছেপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতেতলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখে একটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেচে।

আজ কদিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোন কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্প করচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেচে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটে ভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমুলগাছগুলো আমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ। এগুলো আর সাঁইবাবলা না থাকলে ইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা

কেটেছে—আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে—বোধহয় ওবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্মল আকাশ ও প্রচুর সূর্যালোকের জন্যে হাঁপাচ্ছে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখচি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতী রং ফিরে এসেচে—সে ঘষা কাচের মত রং নেই আকাশের।···কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সে অপূর্ব সুগন্ধটা প্রস্ফুটিত ময়চে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠীর মাঠে আজ স্নানের পূর্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতাপাতায় ফুল ফোটে। ময়চে-লতা তো পুষ্পিত হয়েছেই, তা ছাড়া মাখম-সিমের গোলাপী ফুলের দল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেয়েঁঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেচে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু,—কি ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্যন্ত ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠীর মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তপর্ণ তরুর দেখা মিলল, কিন্তু ফুল হয় নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত বনের মধ্যে, এক জায়গায় একটা বড় কেয়েঁঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে আমার রাগ ও দুঃখ দুই-ই হল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল, তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেয়েঁঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূর হৃদয়হীন বর্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ির সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিন টাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্যে। এমন কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটা সম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্য তিনটে টাকার জন্যে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালবাসার প্রাণ থাকলে এ সব কি আর হত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙার পথে যেখানে একটা বাবলা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতে বসলুম—কত দিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ-যেন পরম প্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্তিক মাসে সোঁদালি ফুল, কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলেকোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধনতলায় বড় একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলিতলায়। বারাকপুরে চোদ্দ পিদিম দেওয়া দেখি নি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠীর মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কুঠীর হাউজঘরে ঘোর জঙ্গল হয়ে গিয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—

আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপর ফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পূজোর ঠাকুর দেখাতে। হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরদিনও আবার কুঠীর মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু মনোরমার ভাই কালো কুঠীর জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে, তার ফলে সকলেরই বেড়ান বন্ধ হল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ির পাঁচি কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাসখানেক হল মারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরনে 'ও ভাই রে, বাড়ি এসো', বলে চেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হল ওর জন্যে। পাঁচিকে এ গাঁয়ের সব লোকেই 'দূর, ছাই' করে, সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচি ওদের সবারই বড় হয়ে গিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে—'আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে।'

নৌকা করে বনগাঁয়ে যাচ্চি সকালবেলা। চালকীর ঘাটে এসেচি—এবার এদিকের গড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটি পাখী বাবলা গাছে বসে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হলদে বড় বড় বন ধুঁধুলের ফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হলদে ফুল ফুটে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হলদে নক্ষত্র ফুটে আছে—ছোট ছোট খুদে খুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে রাখলাম, আবার আসচে বছর দেখতে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়ে নি। হেমন্তে এত বনের ফুলও ফোটে এদেশে! ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যে তিৎপল্লার ফুল, খুদে খুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের। কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদী তীরের কি অপূর্ব শোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্তপর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটি করে ছোট ছোট পাপড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরীপানার ফুল ফুটেচে, অনেকটা কাঞ্চন ফুলের রং কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বা সরস সবুজ ডাঁটায় থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্যেই কচুরীপানা সৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছামতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুক তুলে। এ সময়ে বক্কেবুড়ো গাছেও শাল মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেছে—আর এক প্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে ঐ খুদে খুদে অজানা ফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তার শব্দ-পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব অননুভূত ভাবের উদয় হোল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বলেন, নেই। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নির্মেঘ, নির্মল! দুঃখ হোল এই ভেবে যে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে! আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না! খুকুর গাওয়া সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর
নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ

কাল কলকাতা থেকে এসেছি, বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্বত্র দেখেছি এ সময়ে। কলেজে পড়বার সময় যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ি যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ওদিকের পথ দিয়ে যাবার সময়ে দেখতাম একটা বড়ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কেলো এসেছিল আমার সঙ্গে আমার বাসার—এক সঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটিতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তের কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্বত্র ফুটন্ত ধুর ফুলের প্রাচুর্য ও শোভা দেখে মনে হোল, সেদিন মনি বোসের আড্ডার যারা বলছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমন নেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ক্রোকাস, মার্গারেট্ কি কর্ণফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যে দিকে চোখ তাকাই, সে দিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভ শুভ্রবর্ণের ধুর ফুলের অপূর্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল— সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্যন্ত, আগা গোড়া ভর্তি। এত নীচু ও অত উঁচুতে ও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতে ঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এর সন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারা বাংলার নিভৃত মাঠ বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব সুন্দর ফুলকে কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেকরার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান। বাঁশের বেড়া। ননী সেকরার মেজছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকান ঘরের সামনে একটা নতুন কামারদোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্ছে। হালের চারধারে ঘুঁটের গনগনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্ছে। দোকানের পিছনের বেড়ায় ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সে দিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর

পর্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্যাস্ত শীতকালের নিজস্ব। এমন অস্ত-আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না, আমি তার G. T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প টুলটা নিয়ে কুঠীর মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়ে বসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখী এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কল্‌কাতাতে আর কোনো পাখী নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখীর কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কি সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমুলগাছটা দেখা যাচ্চে, নীলাকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে। একটা বাব্‌লাগাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে—শীতের অপরাহ্ণে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধহয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করে সে জায়গার রস অনেক বেশী পাওয়া যায়—কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগে কাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে·এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয় —তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বনঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা রোদমাখা শিমুলগাছের, বনপাখীর এই কলকাকলির অপরূপ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড়লক্ষ Super Galaxy আছে এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম—সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানিনে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয়। What is in microcosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুল-ফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দ পাচ্চি পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগে যেতাম, খুকু বসে ছিল, বল্লে, একটু দেরি করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর পায়ে হেঁটে পৌছে গেলাম বেলেডাঙার সেক্‌রার দোকানে—মধ্যে এই ধুরফুল-ফোটা বিশাল মাঠটা যেন এক দৌড়ে পার হয়ে গেলাম, তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টা গরু ছিল, আর বছর ফাল্গুন মাসে একে একে সব কটা মরে গেল গাল-গলা ফুলে। দোকানের সামনে একজন লোক বসে হাল পোড়াচ্চে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু,এক পয়সায় সে দিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্চি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েচে—কুঠির মাঠে শুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল। ঐ super galaxy-দের কথা—বিরাট

space ও নীহারিকাদের কথা—এই বনফুল ও পাখীদের কথা। কতক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এই নক্ষত্রটার সঙ্গে যেন আমার কোন্ অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েচে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিল পুরোনো দিনে, সে কথা মনে এলো।

গৌরীর কথা মনে এলো—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এলো। আমি ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই সেখান থেকে কুঠীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে না অনেকদিন পরে,—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমি জানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্ধায় জোর করে বলছি বনফুলের শোভার এ প্রাচুর্য আমি দেখিনি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এই বাংলা দেশের sub-tropical বন জঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এই প্রাচুর্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলা কঠিন। বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী-প্রান্তের সৌন্দর্য তারা কখনো দেখেনি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগা, বুধো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে বনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি ঘাসে-ভরা জলার ধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমি এই সবই ভালবাসি, সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে। এই শীতকালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ কাকলি, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্মল শীতের সন্ধ্যার বাতাস, কি রঙীন্ অস্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা সুঁটি ঝুলচে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল কলমী ফুল ফুটেচে। মটর শাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল সৌন্দর্য—এই আকাশ, এই মাঠ, এই সন্ধ্যার-ওঠা প্রথম তারাটি—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এরাই আবাল্য আমার অতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই।

বিকেলে আজ বেলেডাঙার মরগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এক বোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলায় সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম—ভগবান তাঁর পুজো না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ওঁর পুজোর সঙ্গে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর যে পুজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সেকথা বোঝানো শক্ত। পুজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পুজো করছিলাম, তখনই আমার মনে হোল,

এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্ত-বেলার পাখীদের কলকাকলির মধ্যে। তাই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এলো। এই পৌষ মাসে ঠিক এই সময়ে আমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিন টাঁড়ায় বনের ভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেত থেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আসতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাস টোলায় আগুনের চারিধারে বসে গ্রামের লোকে গল্পগুজব করতো। ফিরবার পথে বাঁধের ওপর উঠবার সময় দেখতুম চারিধারের মাঠ কুয়াসায় ভরে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হলো। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরগাঙের শুকনো আগাড়ের নতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠের ওপারের বনফুল ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক পাখীর ডাক, গ্রামসীমার বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতা-বিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধির, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যা বাংলাদেশের এ অঞ্চলে অন্ততঃ নেই—Space। Wide open Space। দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বের অনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরে গেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসেছিলাম। বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল। লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেকরার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রূপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম—ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাকবার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না, অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত, অবর্ণনীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তারপর নীল ও বেগ্‌নি রং হয়ে গেল জলতে জলতে—জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরনের উল্কাপাত দেখিনি।

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল-ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া

আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি অদ্ভুত ধরণের নীল! কুঠীর সেই দেবদারু গাছটা, কানাই ডোঙ্গার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে! মাঝে মাঝে দু' একটা চিল উড়চে বহুদূরের নীল আকাশের পথে! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপ মনে নতুন ধরণের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ আমি জীবনে কতবার দেখলাম—তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠীর মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল্ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত উর্ধ্বলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace Solitude as a bride." এসম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগন্য তারকালোক'। জার্মান মিষ্টিক্ একহার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না—তাঁর "Our Heart's Brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।

ওকথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলে এসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—পুঁটি দিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যামলতা, ভোমরালতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যামলতার ফুল ফুটে বৈকালের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকাল সে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠীর মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন্ অস্ত-আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরণের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে এবং আসাম ও হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায় থাকে—আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বেলেডাঙ্গায় গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটি ও ডাঙা পাশে রেখে, ফুল ফোটা বড় বড় বনঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখী বেড়াচ্ছে ঝোপের নীচে শুকনো পাতার রাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুব বড়, বনতারা।—নামটি

ভারি সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন লতার কথা বলচে—আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে, ঝোপে, বাব্‌লাগাছের মাথায়, কুলগাছের ডালে, বেড়ার গায়, ডাঙাতে যে দিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখিনি। যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কল্‌কাতায়। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে এবার নন্দলাল বসুর দু'খানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকী সঙ্গে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনীদাসের বাড়ি, একদিন নীরদের বাড়ি, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হোল যে এখানে এসময়ে সুপ্রভা নেই।

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব, অন্ধকার হয়ে গেল। কল্‌কাতার হৈ চৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল-ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েছে। চালতেপোতার বাঁকে বনের মাথায় প্রথম একটি তারা উঠেছে—কত দূর দেশের সংবাদ আলোর পাখায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্য নদীর চরে—আমার মনের নিভৃত কোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিসপত্র নিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ি এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠীর এদিকে বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটা আছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তারই পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেই বটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভুত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—কদিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সে সৌন্দর্য এখনও ম্লান হয় নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এ বড় আশ্চর্যের কথা। এমন কোনো বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অবস্থায় এতদিন থাকে। বালজ্যাকের গল্পটা (Atheists Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি, আকাশ যেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল-ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠীর সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল, ওপারের। শিমুলগাছটার মাথার ওপর উঠে গেল, তখনও আমি চুপ করে বসেই আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে এবার, এই যে লিখচি আঙুল যেন অবশ হয়ে আসচে।) আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার

ভাবলুম বেলেডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে পারা গেল না এই সৌন্দর্যভূমি ছেড়ে।

নির্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পারের দ্যুতিলোকের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখচি কুঠীর মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Æsthetic, কিন্তু এই জনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌঁছে দেয়, তা বিশ্বলোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি। আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তো মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারিনে, বুঝতে পারিনে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম। তারপর স্নানের পূর্বে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুরফুল-ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রান্তে রাঙা সূর্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অন্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠীর মাঠে গিয়ে এক জায়গায় কটা রোদ-পোড়া ঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে একটা বাব্‌লাগাছের শুক্‌নো মগ্‌ডালে অনেক পাখী এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরী করেচে। সামনের বনঝোপ, কুঠীর শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না—কুঠীর মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি? আজকার এই অপরাহ্ণ যেন চিরদিন মনে থাকে—এর সুখ, আনন্দ ও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে। অশ্বিনী যাত্রা-দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ি পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল—সে এখানে এসে গল্প করে গিয়েচে যে, সে বিলেত ঘুরে এসেচে। প্রমাণস্বরূপ বলেচে কোথায় নাকি প্রকাণ্ড পিতলের মূর্তি সে দেখেচে—এ দ্বীপে একখানা পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পা—তার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এ একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেতে গিয়েছিল।

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়ি ব্যারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাই

বাড়ির পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ীর বাড়ির সামনে বড় বটগাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে, 'আমাদের দিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথ দেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজ বেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তু অন্য কোনো সময়ে পাইনি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠীর মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যে আমি কি আনন্দ পাই! একটা অনুভূতি হোল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নিচের গাছপালার আঁকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্চি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখী বসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরচে। তবে ফুলের শোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবে আবার দেশে ফিরতে পারব!

মৌরীফুল

মৌরীফুল

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ি হইতে এক তুমুল কলরব আর হইচই উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘি-টার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন, ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে।

বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচিলের জায়গা নিয়ে মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন না ?

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—জু-নালির চৌধুরীদের কান-সোনার মাঠের দাঙ্গার মকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না ?

রামতনু মহাশয়কে ঢোঁক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের খন্দের মামলায় আপনি বাদী-পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না ?

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তারপর বিপক্ষের উকীলের পুনঃ পুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটি-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তারপর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল-আমলায় ভর্তি মুন্সেফ-বাবুর এজলাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়-বিষে জর্জরিত মনকে একটু

স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্ত আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তাহার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

তারপর প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন-সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃ-কুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন-সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী আসিল। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, বেশী লেখা-পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ন'টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত-পা ধুইতে গেল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথায় কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া, বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মা যুবক-দিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্ত সকাল-সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন; তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে —, ইত্যাদি।...

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্ত দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্ত রামতনু মুখুয্যের বাড়িতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্ত তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল,

স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?

কিশোরী বলিল—আর ডেকে কি হবে? আমার কি আর হাত পা নেই! নিতে জানি নে?

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বনবে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়িসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে লেগেছে কে., শুনতে চাই। না হয় বরং...

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত-দুপুরের সময় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে বুঝি। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না; কিছু না, ও একটা ছল; ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—যা খুশী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে ওঠাবো।

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন, চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—ও বউমা, একটু সকাল সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।

বেলা নয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকিদার হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বলছি—ও বউমা, দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে শোনে?—এই বেলা-দুপুরের সময় রানী এখন এলেন নেয়ে···

সুশীলা রক হইতেই সমান গলায় উত্তর দিল—মাইনে করা দাসী তো নই, আমি যখন পারব রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার না চলবে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক···

এ-কথায় উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বারো বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরনে

অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে ছোট একটা বাখারির ছড়ি লইয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। ছেলেটি পাশের গ্রামের আতর আলি ঘরামীর ছেলে, গত-বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জোটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে এ-গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে আসিত, কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ি আর কখনো আসে নাই তাহার একটা কারণ এই যে, দানশীলতার জন্ত রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ স্থর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাত গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—থাম্—থাম্, ও-সব রাখ্—এখন ও-সব দেখবার শখ্ নেই—যা অন্ত বাড়ি দেখ্‌গে যা—যা···

স্থশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্ হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—শোন, তোর বাড়ি কোথায় রে?

—হরিশপুর মা-ঠাক্‌রুণ।

—তোর বাড়িতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ—মোদের আর কেউ নাই, মুই বড়, ছোট দুটো বোন আছে···

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস? হ্যাঁ রে, এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, স্থশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির স্থর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়া-শীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাক্‌রুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখতে চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পারতাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাক্‌রুণ···

স্থশীলা বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়া, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আলনায় একখানা নূতন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে, হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া টানিয়া লইল। তারপর জানালা দিয়া বাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে। কাটবে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা, কেউ যেন না দেখে···

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া স্থশীলা বলিল—ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়বে, শীগ্‌গির যা···

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কিছু দেব বাবা ?

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পায় তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয় তো বল নিজে মরি-বাঁচি একরকম করে' সাজ করে' তুলি।

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন ?

মাস-দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়িতে যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজের বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে।

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল—বলবো কেন ?

—থাক, না বলো, ভাত দাও। রাত কম হয় নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছে না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারী-হৃদয় ইহারই জন্ত তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্ত সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্ত ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে ঘেঁষিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজ কলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না ? অনেকদিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি···

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য

উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত। জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন-পরীদের জগৎ···খেজুর বনের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে···পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়···তরুণ শাহ্‌জাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্‌জাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকে যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া যে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁ, এখন গল্প বলবো! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরে বকবক করি আর কি। তোমাদের কি? বাড়ি বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল, তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়···

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কম বেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপচাপ শুয়ে পড় এখন······

সুশীলা এইবার জিদ ধরিল—বলো না একটা, ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে বলছি একটা কথা রাখতে পারো না?

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে ব'সে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি? নিজের খাটুনিটাই কেবল······

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো, ঘর থেকে বেরো, আপদ—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুশি যা······

ঘরের আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচড়াইয়া

তাহার হাতের আঙ্‌লগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহ্‌জাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ-রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ির মত সাদা, ভোর রাত্রের বাতাস লেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে-যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—বউমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পুজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইঁহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইঁহাদেরই জমি-জমা সংক্রান্ত মকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়িতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাস করিয়া বছর-দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরি পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরীগৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল, নীলাম্বরী কাপড় পরনে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়-চোপড় পরিবার অগোছাল ধরন দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ও-ধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখাপড়া জানিত এবং দেশ-বিদেশের খবরাখবরও কিছু কিছু রাখিত—চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিক-ক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই?

সুশীলা সলিজ্জস্বরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস, ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল—সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে

চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল ; রং যদিও ততটা ফরসা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম-কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানার মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি বসে আছেন কে ভাই, শাশুড়ী ?

—হ্যাঁ।

—এস, আর একটু সরে এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই ?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিমলে।

—কোন্ শিমলে ? কলকাতা শিমলে ?

কলকাতার শিমলে আছে নাকি ? কৈ তাহা তো সুশীলা কোনদিন শোনে নাই সে বলিল—আমার বাপের বাড়ি এখান থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ ছ' কোশ পথ, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

নদীর ধারে যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুশি। এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই ?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো ?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কলকাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগানবাড়িতে যাবার কথা মনে আছে, তারপর এই আসছি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই ?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝলসানো রং, অদৃষ্টপূর্ব দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ-সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত, এ-সব সামান্য জিনিসও নাই নাকি ? সুশীলা হাসিয়া বলিল—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই ? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ির গাঁয়ে কত তো মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাও নি ? কল্‌কাতায় বুঝি নেই ?

কলিকাতার বউটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে। প্রথম বিবাহের পর

তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক ওদিক বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক!…নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে!…ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া বসিয়া কেমন ঝিমায়!…

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুশি হইয়া বলিল—খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো…

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বউমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার তলায় ভাঙা ইঁটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে শুরু করিয়া সকল রকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল, দেখিগে কেমন পুজো হচ্ছে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই।

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—আর বলতে হবে না মা-ঠাকরুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায় নি, ও বয়েসে অনেকের…

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাকরুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, একমাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম কত হয় মা-ঠাকরুণ…

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। যেন কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বার-মুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে

একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজকার দিনে জিনিসটা-আসটা কিনিবার জন্যে সে ইহা বাড়ি হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ির বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকরুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই, তুমি এখন দিনকতক আছ তো ?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠি-পত্র দেবে তো ? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে ? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে ঝগড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তাহার মায়ের দেওয়া আংটি, বিবাহের পর প্রথম তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল, তুমি হ'লে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে ? না ভাই···

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই···

বউটি বলিল—দূর! না ভাই ও-সব রাখো—সে বরং ..

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই ? আচ্ছা, তুমিই যদি দিতে চাও এই পুজোর সময় আসবো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই!—আর আমায় ভুলবে না তো ভাই ?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো না ভাই মৌরীফুল! কখ্খোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল ..

তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরনে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি ?...

কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউ এই অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তারপর দুজনেই চোখের জলে ঝাপসাদৃষ্টি লইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।...

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে দু'একদিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বউমা আমার ফেরবার কোনো ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে' রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ির কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা, জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্বে বাড়িতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-কথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেক দিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই, কিশোরীর দোষ নাই, কেন না সে বড় একটা বাড়িতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়কির বাহিরে অনেক শুকনা বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন, কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আনিলেই এখনই একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল। এদিকে বাড়িতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারবো না, রোজ রোজ এমন করে' সংসার করা আমার দিয়ে হবে উঠবে না—আজ দু'মাস ধরে' বলছি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাত পা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধবে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে আর কাজ নেই—থাক্‌লো হাঁড়ি পড়ে', যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন করে' নেবেন...

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল

ততক্ষণ মশলাগুলা বাটিয়া রাখা যাক্। সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্ত কয়েকদিনের মশলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকরুণ নেই···

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে ফেলি নি এই কত।···

বউটির চোখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ও-সব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষীটি, নইলে জান তো কি রকম লোক সব···

—দেব—দেখবে সব আজ কি রকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাটবো আর ভাত রাঁধবো, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বোস ঠাণ্ডা হয়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে···

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা···

—তুই বোস দেখি ওখানে চুপ ক'রে, দেখিস এখন মজা—আজ ছ'মাস ধরে রোজ বলছি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর—আজ মজাটি দেখাবো···

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ি। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে-অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়িতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাউল না থাকিলে আঁচলে করিয়া চাউল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

মোক্ষদা ঠাকরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিসপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্যবর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাকরুণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁশিয়ার মোক্ষদা ঠাকরুণ তাহা কখনও ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়া-ক্রান্তিতে তাহা আদায়

করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্ক-ধরনের মানুষ, সে ধার দিয়া অত-শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত—ওই তুই আবার দিতে এলি কেন ভাই ছোট বউ, ওর আবার নেব কি? যা, ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর, তোর রান্নাবান্না?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয় নি। আজ রাঁধবার তেল নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাবো—সেইজন্যে···

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয় নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে···

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতেই ছাড়ছি নে...

বেলা বারোটার সময় মোক্ষদা ঠাকরুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হইচই বাধাইয়া দিলেন। প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবার কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে শুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈস্বরে সুশীলার কুলজি গাহিতে লাগিলেন।—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ি আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনো চেলা-কাঠ পড়িয়াছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল। সুশীলা তখনও বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল—স্বামীকে শুকনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটা তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা দিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—

মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ির বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ির মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কিতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্বাঙ্গে ধূলা, বাটনার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা একধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ি হইতে ছুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্ম ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজা দিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-রকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কির বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ির প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা হাতে—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি—বলিয়া বাড়ির মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কি-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষীটি, তখনই যে বারণ করলাম?···

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছনে ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কি-রকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি?—কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্বনাশ! আর একটু হ'লেই হয়েছিল গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ির মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সেই বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, ছাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু—নিজের চোখে দেখে নাও ব্যাপার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ···

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচকি হাসিয়া বলিল—ও-সব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে এতদিন···

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে ?···

মোক্ষদা ঠাকরুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউ-ঝিও দেখাদেখি ঐরকমই হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকরুণের বন্দোবস্ত—কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবত নির্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচছয় বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত,না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল ?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়···দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের

শিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে..পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী...বসন্ত লক্ষীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।...

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্যই যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট-বউটা। আহা, ছোট-বউ-এর বড় কষ্ট। ভগবান দিন দিলে সে ছোট-বউ-এর দুঃখ ঘুচাইবে।...কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নহিলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরি করিয়া দিতে পারে। চাকরি হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছালো নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে সে গোছালো কি না। আচ্ছা, ওই বাড়িখানায় যদি আগুন লাগে! না—আগুন দিবে কে? ছোট-বউ, উঁহুঁ, দিলে তাহার শাশুড়ী ঠাকরুণই দিবে, যে রকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?...তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজাইয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে...আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান...

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকরুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল।...

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে—আমি অত ভেবে...

সন্ধ্যার কিছুপূর্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাক-চিলগুলাও একটু স্বস্তির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু, হুঁশিয়ার, গোছালো। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন

পরেই যখন কিশোরী পালেদের স্টেটে ভাল চাকরিটা পাইল, তখন নূতন বউ-এর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুশি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে না।

জলসত্র

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় শিষ্য-বাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ-মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ন হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে' প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ-কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেক বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যে-দিকে চোখ যায়, সে-দিকেই কেবল চকচকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হোল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিব জোর করে' চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে···চকচকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে. মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।...অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হোতে লাগলো—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি···জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা' এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা...পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে

তো একেবারে বরফ···কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে' নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয় ?··· তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কলজে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জৈ্যষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে' প্রাণ হারিয়েছে!···সত্যিই তো!···এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম ..যদি তিনিও ?

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ-হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ-হাঁটার বাজী জিতলে সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চলছিলেন। আধ-ক্রোশটাক পথ চলে' উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধহয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে ?

বটতলায় পৌছে দেখলেন একটা জলসত্র! চার-পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কচি ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে ?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণি মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।...একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল' করবার জন্যে।···আঃ, কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে' গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বললে—ঠাকুর-মশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে' একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের ?

—আজ্ঞে ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন ?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস ? সদ্গোপ ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে' জল খাবেন ? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী ; আজ কি তিনি—ওঃ ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।—নইলে, এখনি তো...

শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া ?

—তা আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি বলি শুনুন। বলে' লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে' কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো ; এতেই তাদের সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাব-গঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্ত পাড়ায় জল খাওয়াবো।

সেই 'একটু আগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো। বারবার বলতে লাগলো—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল···

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট্ট বোনটা গাছতলায়, মরে' পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে' তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে' বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন

তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্ম তুই একটা জলসত্র করে' দে ?···তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে' জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলবো কি বাবা ঠাকুর, এখনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে' ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক না কি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।···

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর-মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে···

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে' কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে' এল। কতলোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে' সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে' গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে' ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা ?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবো তো, খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাটকা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ করে' বসে' পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না ?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে' গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে' একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে' গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ভাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদে রংএর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে' ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা-ক'—বৌ কথা-ক'।

শিরোমণি-মশায়ের বসে' বসে' মনে হোল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে।···এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জলদাত্রীর মত দশহাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-

মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে!···চারি ধারে যখন সন্ধ্যা নামে···তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া-শীতল হয়ে আসে···তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে' যায়!···তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।···

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি মশায় তাকে বললেন—ওহে বাপু, তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে এক ঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্ত আনা সন্দেশ আছে বললে না?

রোমান্স

সমীরই প্রথমে কথাটা তুললে।

তার মত এই যে রোমান্স প্রেম ও-সব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে' মনে হোল। ক্রমে ক্রমে বাকী সবাই সমীরের মতেই মত দিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌঁছলো অন্ত সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ-টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম-কেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনো কথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—ভাখো, তোমরা এতক্ষণ বকে' যাচ্ছিলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে—সে-চোখে দেখে ক'জন—দেখবার চোখই বা আছে ক'জনের? আচ্ছা, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এস খেয়ে নেওয়া যাক্—শোন তারপর বলি···

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বর, মাস চারেক হোল যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, দাবা কোনো খেলাতেই কোনো দিন তিনি যোগ দেন নি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠে চলে' যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে খুব পছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটা জিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে তিনি উঠে চলে' গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনো দিন বলতো না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখ মুছে গল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও প্রচারের কার্যে ঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে' একদফা পদ্মার স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে ন'টা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায় পৌছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনি শহরের একজন বড় উকীল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠবো এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পৌছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ফুল-বাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকে-বেঁকে উঠেছে—আলো-আঁধারে পাতার আড়ালে বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুটি সেঁকা ফেলে গাড়ির কাছে এসে সেলাম করে' দাঁড়াল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' জানলাম উকীলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন চারদিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই। কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাক বাংলোতেই অগত্যা উঠবো—একটি ছেলে বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দারোয়ানটিও এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে—বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনি যাবেন না—শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও।

সুতরাং র'য়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হোল, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে বসে' কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকীলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাই তাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে। গৃহস্বামী গাড়ি থেকে আমায় দেখে নেমে আমার পরিচয় জেনে খুব খুশী হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথাটা অন্ততঃ দশবার এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে মনে হোল রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাত্রে আমার আহারের স্থান হোল বাড়ির মধ্যের দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরের ঘরে একটি বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর-ডাগর চোখ, কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে' যাচ্ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি খুকী এ-বাড়িরই না? নাম কি তোমার?

সে হেসে বললে—বীণা।

তারপরই সে চলে' গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চলে' গেল না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি স্কুলে পড়—না ?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড় ?

—এবারে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুয়ারী মাসে .

—কি কি বই পড় ?

কিছুক্ষণ ধরে' আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চেয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো। বলল—আপনি বুঝি বই লেখেন ?

—কি করে' জানলে বল দেখি ?

—আপনার নাম দেখেছি, আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে .

—কই কোন্ মাসিকপত্র আনো তো দেখি।

বীণা দু'তিনখানা মাসিক পত্র নিয়ে এল।

একটাতে আমার "বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্তব্য" বলে একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ বার হয়েছিল বটে; সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্প করতে লাগলো। আমি মুখে মুখে ট্রান্‌স্লেশন্ জিজ্ঞাসা করলাম—সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকা মিউজিয়াম দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটায় কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধরে' ঘরে বসে রইলো—মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হোলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাত্রে কি জন্তে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলি গলায় কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিওমেট্রি পড়ছে—Two tangents can be drawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—। ভারী আশ্চর্য লাগলো। বীণা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ফোর্থক্লাসে জিওমেট্রির ট্যান্‌জেণ্ট কোনো স্কুলেই পড়ানো হয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্তবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটের সময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছা হোল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, শেষরাত্রে কে জিওমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি ?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকে একজামিন বসবে কিনা ?

আমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি? স্কুলের গাড়িতে তো তুমিই একলা যাও দেখেছি…

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বা রে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তো এ্যালাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনরো-ষোল হবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীর দাঁতে কুঁদে তৈরী। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্তগতিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন? ... পরে একটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন না?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে স্কুলের গাড়ির সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেই বলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকালে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন ঐ তো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি। দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে, ও-বেলা...

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও-ভদ্রলোকটি কে রে?

মনে মনে অভিমানে বড় ঘা লাগলো। বড়-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু আজ ছ'সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে' আছি, এতদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকুও কি তাঁর কর্ণগোচর হয়নি?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনো দিনও। সুতরাং বীণার সঙ্গে দেখা হবার সময় হোত না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতে বসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—ঠাকুর দু'বার, তারপর আমি দু'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা?

আমি কৈফিয়ত দেবার আগেই সে আবার বলে' উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারি থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানই আছে...

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্ত ভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে অনর্গল বকে যেতে লাগলো—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিই বেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়ে বললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি...

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চলে' গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালি ধরন আমার জানা ছিল কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পর দিন সকালে সে এল—হাতে একখানা "বঙ্গ-বন্ধু"। আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন দিকি বুঝিয়ে? লাল পেন্সিলে দিদি দাগ দিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলো। সেই মাসের "বঙ্গ-বন্ধু"তে আমার "যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য" বলে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন-পনরো ধ'রে, ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী যাতায়াত এবং নানান Year-Book নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হোল?

বীণা বিকেল বেলা একখানা খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে নিন—নিয়ে দিদির এই ট্রান্স্লেশন্‌টা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো। দিদি বললে আপনাকে দেখাতে···

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রান্স্লেশন্‌টা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি? তখন একটু আমতা আমতা করে বললাম—নম্বর? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি···

—মোটে? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরিজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলুঃ—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল খিল করে' হেসে উঠলো। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রান্স্লেশন্ দেখে দিতে হবে– পারবেন তো?

—খুব খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে। কেন দেখে দেবো না?

সেদিন থেকে আমার কাজ হোল রোজ রোজ এক রাশ করে' ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতার শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রীটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েকদিন খুব গুমটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হোল। উকীলবাবুর বাড়ির সামনে একটা বড় বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে' সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কত দিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষ নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে মাটীর গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে...মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্ত হয়ত এতক্ষণ আমাদের উঠানের বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করছে।... গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাসের খুব মজলিস বসেছে...তখন মন বড় খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকীলবাবু কয়েকদিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারিও

যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন —ক'দিন আপনার খোঁজ খবর করতে পারিনি, কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রান্স্লেশন্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস-টাস করবে? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু না মনে করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময় মত? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুয়ারী মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার...

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশীই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা। কোন কোন দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারি মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যা অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রান্স্লেশন্ দেবার পরে সে মুখ নিচু করে' হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন ..

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে' দেখবে এখন সোজা···

সে পুনরায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন···

যে সুরে সে কথাটা বললে, সেটা অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হোল এর পর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়বৃষ্টি নামলো—এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম কেদারাটাতে বসে' আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হোল। চেয়ে দেখি আগে আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোন সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টার-মশায়?

—এসো এসো। ভিজতে ভিজতে এলে যে?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল গিয়ে গল্প···

প্রতিমা তার দিকে ভ্রূকুটি করে' বললে—আমি?

পূর্বে ও-কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হোল, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপখাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দু'টি চোখ ও ভুরু

ভুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরণের সৌন্দর্যে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে—একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না? বসে বসে লেখেন বুঝি? উঃ, কি শক্ত লেখাই লিখেছেন—আচ্ছা অত পার্সেণ্টেজ, গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ?

—মুখস্থ কি আর থাকে। ও-সব লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year Book হয়ে উঠবো যে...

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিওগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিওগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি···

বীণা বললে—আমাদের ক্লাসের জিওগ্রাফিতে বর্ধমান জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না মাস্টার-মশায়?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিম ঘেঁষে...

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি? আচ্ছা ও কি করে হয়?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতঃই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগবিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাত্মা ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি। একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোন দিন—স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে' গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচুগলায় শাসনের সুরে বলছে কানে গেল—ও-রকম মাস্টার-মশাই মাস্টার-মশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারি খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েকদিন পরে হঠাৎ আমি কলিকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম অফিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধা-ছাঁদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে? দিদি বলে' দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ করে' আয় কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হোল।

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটলো। দশটার গাড়িতে আমি যাবো, উকীলবাবুও আমার সঙ্গে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো।

সকালে দু'জনে একসঙ্গে ঘরের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকীলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। অ্যাঁকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকীলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেলায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন-বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে' আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখছেন তো একবার কাণ্ডখানা? বুলি এটা কি ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না, আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু আমি আজকালকার ও-সব বিবি সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। খুব হয়েছে পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে...

আমার সামনে এ-সব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যপথবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেন না আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের সামনে পরিবেশন করতে বেরুলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে নিজের ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরেই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে—দুধ-মিছরি খেয়ে নিন্—

—দুধ-মিছরি, কেন বলো দেখি?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময় তাঁকে দুধ-মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে' দিলে—রমেন-বাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে...

গত তিন দিন প্রতিমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আজ এই মাত্র এই যা খাবার সময় দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়ও দেখা হোল না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময় কাছে কাছে ছিল। আমার মনে কয়েকদিন ধরে' একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—। বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনোদিন। তিনি...

—আমার মা এক মাস হোল মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোটমামার বিয়েতে—এই বুধবার আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই...

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—বা রে, অ্যাদ্দিন আছেন, তাও জানেন না বুঝি? আপনার মন থাকে কোথায়? একদিন তো আপনার সামনে এ কথা হয়ে গিয়েছে না?

কবে পূর্বে একথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হোলেও এতদিনের একটা খটকা আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে এতখানি তফাত! কথাটা অনেক বার মনে হোলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এত দিন।

অত্যন্ত অন্তমনস্ক ভাবে উকীলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম। আজ কয়দিনের তো আনাগোনা—কিন্তু চলে' যাবার সময় মনে হতে লাগলো, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকাগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেকদূর পেছনে পড়ে গিয়েছে—আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা, ঐ পাতা-বাহারের গাছটা, বাইরের উঠানের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়-হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্তে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোন দাবীদাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র। তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন বাড়ি থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পূজার পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ অফিসের হুকুম হোল আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মত ভিড় ছিল না। পদ্মা-বক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মত নীল। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে কিন্তু বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাক-বাংলোয় উঠলাম।

নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বার বার অনাহুত ভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে' আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্না-পক্ষ ঘুরে এল। ডাক-বাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না ঝোপের মিঠা মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দার রেলিঙ-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষীছাড়ার মতো ডাক-বাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরাবহুল হস্তের ডালভাত ও সুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হোলে তার সহ্য হয় নি, নানা অনুযোগ করে' ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্তে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। এক একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্তকে অন্ত কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমার কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু "ভারতমাতা ব্যাঙ্কের" শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝন্‌ঝন্ ভোগের

পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠলো। একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি হাতে নিশ্চিন্তমনে বেড়াতে গেলাম—যেন এই পথ দিয়েই কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখ পড়লো বাড়ির ওপরের ঘরে সব জানালা বন্ধ। উকীলবাবুর অফিস-ঘরের সামনে রামধনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা···কি করা যায় বা কাকে ডাকবো ভাবছি এমন সময় উকীলবাবুর পুরানো খানসামা ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি ?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায় ?

—আপনি শোনেন নি, জানেন না কিছু ?

পরে সে একে একে যা বলে' গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্রমাসে উকীলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তার ওপর বিপদ—বড় দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তাঁর মা নিজের বাপের বাড়ি চ'লে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন। বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দারোয়ান আর সে ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্য চাকর-বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাক-বাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকবাংলোর নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে ;···পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে অফিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার অফিসে বড় বড় রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাক-বাংলোর বেয়ারা বললে—আপ্‌কো পাস এক আদমি আনে মাংতা হ্যায়···

একটু পরেই দেখি উকীলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের স্বরে বললাম—কি মনে করে' ?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ি এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি সেদিন বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কিনা, থাকলে আমাদের বাড়ি অবশ্যি করে' একবার আসতে বলে' আয় আমার নাম করে'—আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে' দিলাম, অফিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা 'চাই গরম গরম বাখর খানি' বলে

হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌঁছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম। একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার শরীর ভালো আছে?

—এক রকম মন্দ নয়। তোমার—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জল ঝরে পড়লো। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধ হয় উচিত ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটাকতক মামুলি কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়? ডাকবাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই···

বীণা কথাটা এমন হুকুমের সুরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার ভাবে নানা অল্পবক্তব্য কথা ওঠালাম, যেন প্রধানতঃ সেই-গুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হেঁটে এসেছি; শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায়? এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি।

বীণা বললে—দিদি এখনও সারে নি। বড় মামাবাবু সঙ্গে করে চুনার নিয়ে গেছেন সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে' বসে' কি ভাবে এ ছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই। কিন্তু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাত দিন বসে' বসে, ভাবছে—ঐ তার রোগ ··

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে···

বীণা বললে—শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা তার এক সম্বন্ধ ঠিক করলেন। চাট-গাঁয়ের উকীল, হাতে পয়সা আছে, কিন্তু তেজপক্ষের বর, বয়স চল্লিশেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়ে' খবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারীর দরখাস্ত করে, চাকরি পায়ও—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড! তারপরই পরীক্ষায় ফেল হোল, সে আবার এক কাণ্ড। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে এ-বিয়ে ঠিক হোত। এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল। চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোন দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারীর দরখাস্ত করেছিল সে শুধু অপমানের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে' গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জল খাবারের রেকাবি আর জলের

গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে—আসুন দিকি, খেয়ে দেখুন তো চা'টা—তবে কি আর আপনার ডাক-বাংলোর বাবুর্চির মত হয়েছে?

বীণা আগেকার চেয়েও সুশ্রী ও মাথায় বড় হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরনগুলো ঠিক আছে- একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে—কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো? আমি মাকে বলেছি, আপনি না এলে ভারী রাগ করবো কিন্তু বলে' দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাক-বাংলোয় পাঠিয়ে দেব এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—এবারকার অফিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশীদিন আর ঢাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এর পর যখন আসবো—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশী কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে, তবে একটু দেরী হয়ে যাবে হয়তো, এই বেলা ন'টার মধ্যেই আসবো। বীণা খুব খুশী হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাবো। চলে' আসবার সময় আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন···

ডাক-বাংলোয় ফেরবার পথে সেদিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—হঠাৎ বীণারা আমার বড় আপন উঠেছে। এত অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনী পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্ততঃ তার কোনো কার্পণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এরকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড় সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে' দেখতে শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দর-ভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবা-প্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগৎকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভরে' রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাক-বাংলোর বারান্দাতে বসে' মনে-প্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে · রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয় ··নৈশ পাখীর ডাক দূর থেকে ভেসে আসে···মনের মধ্যের নাম-না-জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে নিজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।···

ডাক-বাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরানো বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ইন্সিওরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জে কাজে এসেছেন এবং সেখানেই আছেন! তাঁর নামে তাঁর একটা মণিঅর্ডার এসেছে কিন্তু সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে' টাকা দিচ্ছেন না; এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায়?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকিদারকে বলে' গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলতে যে জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে' গিয়েছি আজই ফিরবো। নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা। পোস্টমাস্টার আমাকেও

চেনেন না, টাকাও কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু' একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তাঁরা টাকাকড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাক-বাংলোয় ফিরেই অফিসের চিঠি পেলাম বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে। চিঠি এসে দু'দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্যক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক-বাংলোর চাপরাশি বললে রঘু মিশির দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই বীণার সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হোল চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা। তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হোল। অফিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করাতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে, শীঘ্র কাজে যোগ না দিলে অন্য লোক বাহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই এতদিন পরে ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড় রোমান্সের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো —এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—তখন কে জান্‌তো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরের জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল। মাত্র নির্জন অবসর-মুহূর্তে, বার-লাইব্রেরী কক্ষের মক্কেলহীন দুপুর বেলায়, মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মত ঠেকে।···

এই সব স্মৃতিতেই জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক-পাখী, ফুল-ফলে সকাল দুপুরের সঙ্গে সুর-মেলানো অনন্তমুখী সঙ্গীত এদেরই নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউণ্ড, গেটের ওপরকার লোহার জাফরিতে থোকা থোকা মাধবীলতার গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হোল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না।

বীণা!···

কিন্তু এ কোন্ বীণা? চার বছর আগে সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্যসুন্দরী, ধীরা সংযতা তরুণী! মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভাল; বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়েছেন। বীণা চোখ নিচু করেছিল, আমার দিকে চায় নি—সে বোধ হয় জানেও না যে আমিই পাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ও-রকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোন কথা বললাম না।

শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হোল না, এমনই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা? তলে তলে বুঝি এই সব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধ হয় এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় দুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে? আর এলেন না কেন সেবার?

সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসে নি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সংযত সুরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারই মাঘ মাসে মারা যায়। মাথা তার ভাল হয় নি। আপনার নাম বড় করতো, আমার কাছে, কতদিন বলেছে।

রাক্ষস-গণ

বিপত্নীক হবার অল্পদিন পরেই সুরেশ সলিমপুর স্টেশনে বদলী হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন, নিকটে লোকজনের বাস খুবই কম। রেলের কোয়ার্টারে বড়বাবু পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করেন। কিছু দূরে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে—তার শিক্ষকগণ স্কুলের নিকটেই একটা বড় আটচালা ঘরে মেস করে থাকেন। এ ছাড়া বড়-একটা বসতি নেই।

বিকেলের ট্রেনখানা রওনা করে দিয়েই সুরেশ স্কুল-মাস্টারের মেসের বাসায় তাস খেলার আড্ডায় যায়। সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাউন-যাত্রী-গাড়ি আসবার পূর্ব পর্যন্ত সেইখানেই থাকে। পরে খানিকক্ষণ স্টেশনের কাজকর্ম করবার পর রাত্রি সাড়ে ন'টার শেষ গাড়ি রওনা করেই নিজের কোয়ার্টারে ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এসে ও-বেলার রাখা বাসি রুটি-তরকারী খাওয়ার

পরে সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীরটাকে নিঃসঙ্গ শয্যায় লুটিয়ে দিয়ে আপন মনে কত কথা ভাবে। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশন, রাত্রে আর ট্রেন নেই।···

জানালার বাইরে খোলা আকাশটা নক্ষত্রভরা, একটা মাদার গাছের ডাল-পালা গরাদের গায়ে এসে ঠেকেছে! মনে পড়ে মৃত্যুর পূর্বে নলিনী তার হাত নিজের দু'খানি রোগজীর্ণ দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে হাসিমুখে বলেছিল—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষীটি, ফের বিয়ে কোরো। কথা রাখবে ঠিক, বলো?

সে নলিনীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলেছিল—ছিঃ, ও-সব কথা কি বলতে আছে? তুমি সেরে উঠবে; ডাক্তারবাবু তো বলেছেন, পূর্ণিমাটা কেটে গেলেই পথ্যি দেবেন। ও-রকম কথা আর তুলো না, মা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করবেন—ছিঃ···

সে পূর্ণিমা কাটে নি।

কর্মভারনত নিরানন্দ প্রবাসের দিনগুলিতে নলিনীর এই স্মৃতিই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুরেশের অন্তমনস্ক মুহূর্তগুলি মধুর রসে ভরিয়ে তোলে, নিশীথে ফোটা রজনীগন্ধার মিঠা মৃদু সুবাসের মত—বিশেষ করে এইসব রাত্রে যখন সে একা।···

মাঘ মাসের সকাল বেলা। এই মাত্র স্টেশন থেকে এসে রাঁধতে বসেছে, একটি বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ে একখানা থালা হাতে ঘরে ঢুকে লাজুক সুরে বললে—মা পাঠিয়ে দিলেন।···থালাতে ছয়-সাতটি বাটিতে নানা তরকারী।

সুরেশ হঠাৎ বড় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে তাড়াতাড়ি তরকারী বাটি থেকে তরকারী নামিয়ে সেগুলো খালি করে দেবার চেষ্টায় এতটা অনর্থক ব্যস্ততার আমদানি করে বসলো যে মেয়েটি মৃদু হেসে বললে—বাটি এখন থাক, রেখে দিন আপনি, ঝি এসে নিয়ে যাবে এখন।

শুধু থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে সে চলে গেল। সুরেশ ভাবলে, বড়বাবুর বাসা থেকে এসেছে বটে কিন্তু বড়বাবুর নিজের মেয়ে নয় সে জানে। এতদিন এ মেয়েটিকে কখনো দেখেও নি তো?

বেশ শান্ত মুখখানি।

মাসখানেক কেটে গেল। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশনে ছোটবাবুর জীবন সকাল-সন্ধ্যা একঘেয়ে একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন ভাবে কেটে চলেছে। সেই মেয়েটি আরও কয়েকবার নানা কাজে সুরেশের বাসায় যাতায়াত করেছে; মেয়েটি বড়বাবুর ভাগিনেয়ী—মা নেই, বাপ পদ্মার ও-পারে কোন্ এক স্টেশনে চাকুরি করেন, সম্প্রতি মামার বাড়ি এসেছে বেড়াতে, মামী-মাকেই মা বলে ডাকে—এ সব খবর সুরেশ ক্রমে জানতে পারে।

একদিন কি কাজে মেয়েটি এল। সুরেশ কথায় কথায় বললে—রেণু, পানগুলো আজ ক'দিন ধরে পড়ে রয়েছে, সাজা অভাবে খাওয়া হয় না। গোটাকতক সেজে রেখে যাবে?

রেণু অমনি পান সাজতে বসে গেল। নিপুণ হাতে এক রাশ পান সাজা শেষ করে সে তাগিদ দিয়ে কলঙ্ক-ধরা অপরিষ্কার কাঁসার ডিবেটা সুরেশের বাক্সের কোণ থেকে বার করে

নিয়ে সেটা খানিকক্ষণ বসে বসে বালি দিয়ে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুললো। বিছানার ধারে পানে ভর্তি ডিবেটা রেখে দিয়ে হাসিমুখে বললে—ছ'আনা পয়সা দিন আমাকে…

সুরেশ বুঝতে না পেরে বললে—কেন বলো তো?

—বৌ মারা গিয়ে সন্নিসী হয়েছেন বুঝি? না মশলা, না একটু এলাচ দারচিনি। শুধু খয়ের-চাল দিয়ে পান সাজা—পয়সা দিন, আমি ভজুয়া পয়েণ্টসম্যানকে দিয়ে আনিয়ে রাখবো বাজার থেকে…

এক এক দিন তার কোটটার পকেট থেকে ময়লা রুমালখানা বালিশের তোয়ালেখানা-কে সাবান দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে দড়ির টানায় মেলে দিয়ে চলে গিয়েছে, ট্রেন পাস করে বাসায় ফিরে এসে সে দেখতে পায়। তারপর উপরি উপরি দিন কয়েক সে অদৃশ্য সেবা-হস্তের সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন চোখে পড়ে ঘরের তক্তপোশের নিচে তার ছোট পাথর-বাটিতে এক বাটি বেলের শরবৎ কে সযত্নে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

স্কুল-মাস্টারদের মেসের বাসায় তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। টিকিট-বিক্রির জানালায় পয়সা গুণে দিতে দিতে ভুল হয়, নির্জন শয্যা প্রান্তের সাথী মাদার গাছটার অন্ধকার ডালপালার সীমারেখা আরও অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব মনে হয়।…

ঝি পাঁচীর-মা সেদিন অত্যন্ত বেলায় কাজ করতে এল। কৈফিয়তের সুরে বললে—একটু বেলা হয়ে গেল বাবু, এই দুপুরের গাড়িতেই রেণু দিদি আবার চলে যাবে কিনা তাই সকাল সকাল বড়বাবুদের পাট সেরে তবে আসছি।…

সুরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—রেণু? আজ চলে' যাবে? কই তা তো… কেন আজ কেন? আমি তো কিছুই জানিনে…

কথাটা বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে' রইলো। পরের বাড়ির মেয়ে, তার সঙ্গে তো পরামর্শ ক'রে মেয়েটির যাতায়াত ধার্য হবে না। যায় যাক না—তার কি?

পাঁচীর-মা বললে—নিজের বাপের কাছে চলে যাবে। বাপ সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করেছে কিনা তাই মেয়ে দেখতে আসবে। গেলেই বাঁচে, যে মামী—খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত উঠিয়ে মারে, না একটু যত্ন—না একটু আত্তি ..

বারোটার ডাউন ট্রেন আসবার বেশী দেরী নেই। সুরেশ এই মাত্র খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে কোট পরছে, রেণু বাসার সদর দরজা পার হয়ে উঠানে এসে ঢুকলো। একটু যেন ইতঃস্তত করে পরে ঘরে ঢুকে বললে—আমার একটা সেপ্‌টি-পিন সেদিন কি এখানে ফেলে গিয়েছি?

সুন্দর করে চুল-বাঁধা, পরনে খয়েরী রঙ-এর জমির ওপর প্লেন জরির কাজ করা ছেলে-মানুষের মতো শাড়ি, গলায় সরু চেনহার, একরাশ ঘন কৃষ্ণ চুলে ভরা শান্ত মুখ।

সুরেশ বললে—তুমি আজ চলে যাবে রেণু? কই সে কথা তো জানিনে? এই বারোটার গাড়িতেই বুঝি?

রেণু এ-কোণে ও-কোণে কি খুঁজছিল। বললে—আবার এই কাঁচের গেলাসটা সোজা

করে বসিয়ে রেখেছেন ? একটা ভেঙেছেন যে এমনি করে সেদিন হাঁ, আমি তো এই গাড়িতেই যাবো···একটা সেফ্‌টি-পিন দেখেছেন কোথাও ?···কোন্ প্রশ্নটির উত্তর সুরেশ আগে দেবে ভেবে ঠিক করবার আগেই রেণু বলে উঠলো—নাঃ, সে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আমি যাই, গাড়ি এল বলে···

কথা শেষ করেই হঠাৎ সে সুরেশের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করে উঠে শান্ত নত মুখে সদর দরজা পার হয়ে চলে গেল।

পূর্বেও ঘরে কেউ ছিল না, এখনও কেউ নেই—তবুও সন্ধ্যার ট্রেনখানা পাস করে দিয়ে বাসায় ফিরে এসে সুরেশের মনে হোল—সব খালি, কেউ কোথাও নেই, ঘরের আসবাব-পত্র শূন্যতায় ভরা !···

মাসখানেক পরে বড়বাবু সুরেশের কাছে এক অভাবনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন। সে তাঁর ভগ্নিপতির শ্বশুর, বিশেষতঃ রেণু মেয়েটিকে সে অবশ্যই দেখেছে, সংক্ষেপে রেণুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব।

প্রথমে সুরেশের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হোল না, পরে সে চুপ করে রইলো। বড়বাবু প্রবীণ ব্যক্তি, সুরেশের বয়স সবে তেইশ, সুতরাং বড়বাবু সুরেশের সঙ্গে এ-বিষয়ে এর বেশি আর কোন কথাবার্তার আবশ্যক দেখলেন না। তার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে তার জ্যাঠামশায়কে পত্র দিলেন। বিবাহের যোগাযোগ ও অন্যান্য কথাবার্তা চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে সুরেশের জ্যাঠামশায় রেণুর বাপের কর্মস্থানে পাত্রী দেখে এসে সুরেশকে ও বড়বাবুকে জানালেন—পাত্র সুন্দরী, তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। সামনের মাসেই শুভকাজ সম্পন্ন হয় এই তাঁর ইচ্ছা।

শীঘ্রই কিন্তু একটু গোল বেধে গেল। উভয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠী মেলাতে গিয়ে দেখা গেল মেয়ের রাক্ষস-গণ। মিলনের বহু বাধা, নক্ষত্রেরা সব তির্যগ-গতিতে অবস্থান করছেন—বিবাহ অসম্ভব। সুরেশের বিধবা মা কেঁদে বললেন—তাঁর ছেলের নর-গণ, তিনি কখনই এ পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন না। জ্যাঠামশায়ও সম্মতি দিতে পারলেন না, তবে খুব দুঃখিত হলেন, কারণ মেয়েটিকে তাঁর ভারী ভাল লেগেছিল।

সুরেশ বাড়িতে চিঠিপত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে। তবে তার স্বগ্রামস্থ কোন বন্ধুকে লিখিত পত্রের সংবাদে বাড়ির সকলে জানতে পারলে যে সে শীঘ্রই গেরুয়া ধারণ করে রামকৃষ্ণ-মঠে যোগ দেবে। সুরেশের মা দেশ থেকে রেলের বাসায় এসে পড়লেন। নানা মতে বোঝালেন, কান্নাকাটিও কম করলেন না। পাচীর-মার মুখে রেণু ও সুরেশের পূর্ব পরিচয়ের সব কথা শুনে বললেন—কোথাকার এক রাক্ষসি সে আমার ছেলেকে ফাঁদ পেতে ধরতে এসেছিল। তোর বিয়ে না হয় এমনি বেঁচে থাক। দরকার নেই আমার ছেলের বউয়ের সেবার—ইত্যাদি।

বিবাহ হোল না। বিবাহ ভাঙবার পর থেকে বড়বাবুর বাসার সঙ্গে সুরেশের সদ্ভাবও আর তেমন রইলো না। বড়বাবু আর ভাল করে কথাই বলেন না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সুরেশের অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেল। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী মেয়ে, নাম আভাবতী। বেশ নম্র লাজুক।

সুরেশ বিবাহের অল্পদিন পরেই নব বধূকে রেলের বাসায় নিয়ে এল। মাদার গাছের তলাকার ছোট্ট বাসাটিতে, তারপর তারা দু'জনে যে সুখের নীড় বাঁধলো সুরেশের তা কত সীমাহীন নির্জন রাত্রির স্বপ্ন!···শেষ পর্যন্ত সুরেশের মনে হোল—ভালই হয়েছে সে বিয়েটা না হয়ে, গণকের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার জিনিস তো আর নয়? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। ইতিমধ্যে আরো দুটো খবর সে পেয়েছে—রেণুর বিবাহ কোনো রকমে হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই রেণুর বাপ কলেরায় মারা গিয়েছেন।

আরও এক বছর কাটলো। আভাবতী শুধু যে দেখতে সুন্দরী তা নয়, তার আয়-পয়ও যে খুব ভাল তার প্রমাণও শীঘ্র উপস্থিত হোল। সুরেশ বিখ্যাত পাটের ব্যবসায়ের গঞ্জ রসুলপুর স্টেশনের অস্থায়ী চার্জ পেয়ে বদলির হুকুম তালিম করবার জন্যে প্রস্তুত হোল, মাইনেও গেল বেড়ে।

যাবার দিন ক্রমেই নিকটে এসে গেল। স্কুল-মাস্টারেরা মেসের বাসায় তাকে এক বিদায়-ভোজে নিমন্ত্রণ করে আকণ্ঠ খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ালেন। সে চলে যাওয়াতে যে সলিমপুরের বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটলো, এ-সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কারো দু'মত দেখা গেল না। সে অভাব ভবিষ্যতে পূরণ হওয়ার বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

রওনা হওয়ার পূর্বদিন সারা বিকেল ধরে জিনিসপত্র গোছানো হোল। আভাবতী ভারী গোছালো মেয়ে। সন্ধ্যার আগেই সব জিনিস বাঁধাছাঁদা ঠিক হয়ে গেল—মায় ট্রাঙ্ক বন্ধ করার আগে স্বামীর আয়না-চিরুনি, পানের ডিবেটি সকলের ওপরে রাখা পর্যন্ত—পাছে বা কখনো পথে দরকার হয়।

সকাল সাড়ে ন'টার ডাউন যাত্রী গাড়ি স্টেশনে এসে লাগলো। ছোট্ট স্টেশন, বেশীক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায় না। যাত্রীর দল কে কার ঘাড়ে পড়ে এই রকম অবস্থায় ওঠা-নামা করছে। সুরেশ স্টেশনের কুলীদের সাহায্যে মালপত্র ওঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে স্ত্রীকে মেয়েকামরায় তুলে দিতে গেল। মেয়ে-গাড়ির সামনে প্ল্যাটফরমের কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় এইমাত্র একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ মালপত্র নামবার অপেক্ষা করছে। সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া একটা ছোট্ট ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বোঁচকা নিকটে নামালো। সুরেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। না, তার ভুল হয়নি—ঠিকই দেখেছে সে।

সরুপাড় ধুতি পরা, হাত খালি, মাথায় আধরুক্ষ চুল, বিধবা বেশে রেণু। সুরেশ সেখানে আর দাঁড়াতে পারলো না, দিশাহারা ভাবে এসে নিজের গাড়িতে উঠলো। রেণু সম্ভবতঃ তাকে দেখেনি, তার চোখ অন্যদিকে ফেরানো ছিল।···সুরেশের সারা শরীর দিয়ে কি যেন একটা ঝাঁজ বেরুচ্ছিল। নিজের কতকটা অজ্ঞাতসারে তার মনে হোল—উঃ, কি বেঁচেই গিয়েছি! মার কথা যদি তখন না শুনতাম? রাক্ষুসীর ফাঁদই তো বটে! আটকেছিল তো

পা আর একটু হলেই কাঁদে ? তার আরও মনে হোল, বড়বাবু এ-খবর পূর্বেই জানতেন কিন্তু প্রচার হতে না দিয়ে গোপন রেখেছিলেন।

তারপর কখন গার্ড হুইসিল দিয়েছে, কখন গাড়ি চলেছে এ-সব তার খেয়াল নেই।··· কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে আসতে সে চেয়ে দেখলে প্ল্যাটফরমের পূর্বদিকে তারের বেড়ার ওপরকার খিলানবসানো পাকা ধাপ ডিঙিয়ে আগে আগে মালপত্র হাতে ভজুয়া পয়েণ্টসম্যান, পেছনে প্রৌঢ়াটি ও সর্বশেষে নম্রমুখী রেণু, বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলেছে।···

হঠাৎ সুরেশের মনে দূর-সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল-প্রথম-বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দ-দীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত ?···

দ্রুতগামী ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আর একবার চেয়ে দেখলে—রাক্ষস-গণের মেয়ে ততক্ষণে বড়বাবুর সদর দরজায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছে, দরজা তখনও খোলা হয়নি, বোধহয় ভজুয়া কাউকে ডাকতে গিয়ে থাকবে।

পদবৃদ্ধিজনিত কিছুক্ষণ পূর্বের সে আনন্দ সুরেশ আর মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ করে' র‍্যাগ টেনে নিয়ে ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে —ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি···

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ-হাঁ করে' উঠলাম···রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে' দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে র‍্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে' শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে— দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো ?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny ? ভূত টুত ?

সে র‍্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন···

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়।

আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে' পড়ে' আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে' নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে' লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে—তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়র কি জন্তে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার··

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি · সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে' চলে' গিয়েছে।

গল্প ভাল করে' জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে—দেখছো ? Where there is a will, there is a way। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই ? স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী, চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন.

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন আসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশন-মাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্তে হাত উঁচু করে' গরুড়ের মত বসে' আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায় ?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে

মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর···তা আপনারা কতদূর যাবেন সব ?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে' বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না ? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে' গিয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে ?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে' গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিখটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রদীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো ? এ প্রশ্নের পরেই সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি ..

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পুজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-মধু

সংগ্রহ করে কি ।। পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে' আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেকদিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ করে' জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দরবনের ছবি ...অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড় · নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি...খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছিল দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে জেগে উঠতে লাগলো। বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো —হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার।· হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে···মাটি যেন কাঁপছে···বোটটা যেন দুলছে।

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে। ..

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্ম্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকাটা সেখান থেকে সরানো যায় কিনা। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোনো মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হলো। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার। আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘর-বাড়ির

চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে, জনহীন জনপদের ধ্বংস-স্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন্ অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাস-ভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।... তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে!

প্রত্নতত্ত্ব

আমি এ গল্প আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাক্তার সুকুমার সেনের নাম সুপরিচিত। ডাক্তার সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। পাটনা excavation-এর সময় তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curator-ও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconography-তেও তিনি সুপণ্ডিত। "প্রাগ্‌গুপ্ত যুগের মূর্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানা ছাড়া, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে এবং বহু দেশী সাময়িক পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর পড়বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরানো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তি-বসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্তির শ্রেণীবিভাগ করতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কোনো নতুন-আনা মূর্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখতেন, পুঁথি মেলাতেন, তারপর টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—তারা"। দিনকতক পরে এ বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না। তিনি আপন মনে বলতেন—উহুঁ, ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল যে, তারা কি করে হবে? তারপর আবার 'লেন্স' হাতে মূর্তিটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করে দেখতেন। মূর্তিটার যে হাত ভাঙা, সেটার দিকে চেয়ে বলতেন—এ হাতটায় নিশ্চয় পদ্ম ছিল। হুঁ—মানে—বেশ বোঝা যাচ্ছে কি না? তারপর আবার পুরানো টিকিটের ওপর নতুন টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—জম্ভলা"। তাঁর এ ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেত। আমার চেয়েও বিজ্ঞ লোকে ঘাড় নেড়ে বলতো—হ্যাঃ, ও-সব চাকরিবাজী রে বাপু, চাকরিবাজী! নইলে কোথাকার পাটলি-পুত্র কোথায় চলে' গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইটপাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাটমন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ; দেখতে দেখতে এক

প্রকাণ্ড রাজবাড়ি মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠলো!···চাকরি তো বজায় রাখা চাই? কিছু নয় রে বাপু, ও-সব চাকরিবাজী!

তবে এ-সব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এ-সব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন দুপুর বেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেনরাজাদের শাসনকাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোশগল্প করে সেখানে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর করতে বুঝলাম তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। এ-কথা সে-কথার পর ডাঃ সেন বললেন—চা আনাই, একটা গল্প শোনো। এটা আমি কখনো কারুর কাছে বলিনি, তবে স্পুনার সাহেব কিছু কিছু শুনেছেন।

বাইরে সে দিন খুব শীত পড়েছিল। দরজা বন্ধ করে সুকুমারবাবুর গল্প শোনবার জন্য বসলাম। চা এল, চা খেতে খেতে সুকুমারবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন।

বিক্রমপুরের পুরানো ভিটার কথা বোধহয় কিছু কিছু শুনে থাকবে। এটা কতদিনের, তা সেখানকার লোকে কেউ বলতে পারে না। অনেক দিন ধরে ঢিবিটা ঐ রকমেই দেখে আসছে—এটা কার বা কোন সময়ের তা তারা কিছুই বলতে পারে না।

ঢাকা মিউজিয়ম থেকে সেবার ঐ ঢিবিটা খোঁড়বার কথা উঠলো। এর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠলো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল খরচ যা পড়বে তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিকলো না। ওটা খোঁড়বার জন্যে টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।

গিয়ে দেখলাম, যে-ঢিবিটা কাটাতে হবে তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে' এসেছে। ঢিবি দুটো খুব বড় বড়। ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার ওপরের অংশ একেবারে দুর্গম: পূর্বদিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পেছনের ঢালু দিকটায় খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জন।

সাধারণতঃ খননকার্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা প্ল্যান তৈরি করে, নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তারপর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে, আমরা সেই প্ল্যান ক্রমে ক্রমে বদলে চলি। পাটনা excavation-এর সময় এতে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু ছোটো দুটো গ্রাম্য ঢিবি খুঁড়ে তুলতে আমি এ-সব করবার আবশ্যক দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য

চালিয়েছে এমন কোনো লোক ছিল না। তার কারণ এই যে, ওটা খোঁড়া হচ্ছিল ঢাকা P. W. D. থেকে।

এই ঢিবি দুটোর বড়টাকে ওখানকার লোকে বলে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" ও ছোটটাকে বলে "টোলবাটীর ভিটা"। কারুর মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শাঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্ত দেশের লোকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, বল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায়ও জন্মান নি। তাঁদের মতে ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক সে কথা। আমি কিন্তু জানতে পেরেছি ওখানে কে বাস করতেন। আমি যা জানতে পেরেছি, পূর্বে কেউ কেউ তা আন্দাজ করে-ছিলেন, কিন্তু জোর করে' কিছু বলতে পারেন নি। আমি জোর করে বলতে পারি, কিন্তু বলি নি। কেন বলি নি, আর কেমন করে আমি তা জানলাম, সেইটেই বলবো।

কিছুকাল ধরে' ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তারপর প্রকৃতপক্ষে খনন কার্য শুরু হোল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মের ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া-নিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে' থাকতাম। আমার বন্ধুর চোখ মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরানো আমলের রাজবাড়ি-টাড়ি, বা একটা তাল-পাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাত নাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুলো একটা মাটির ঘট। ও-রকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নিচে থেকে তলা পর্যন্ত curve-টি যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধ-ঘট কড়ি। হিন্দুরাজত্বে কেনা-বেচার জন্তে কড়ি ব্যবহার হোত তা জান তো ? কোন্ অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ দুর্দিনের ভয়ে কড়িগুলো সযত্নে ঘট ভরে' মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন, সে ভবিষ্যৎ কত দিন হোল সুদূর অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে, সঞ্চিত অর্থের আর প্রয়োজন হয় নি। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জিনিস বেরুতে লাগলো। আরও মাটির অনেক ভাঙা ঘট, কলসী, একখানা মরিচাধরা লাল রঙের তলোয়ার, একটা প্রদীপ, ভাঙা ইটের কুচো এবং সকলের শেষে বেরুলো একটা কাল পাথরের দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটিকে নিয়েই আমার গল্প, অতএব এইটাই ভাল করে বলি।

দেবীমূর্তিটি পাওয়া যায় টোলবাড়ির ভিটায়। মূর্তিটি রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটির তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের ওপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্তিতেই আমি দেখেছি। মূর্তিটি সরস্বতী

দেবীর হলেও, তাতে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে' মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলেও দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে, তাকে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো।

মূর্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। অনেক মূর্তি গত পনরো বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছি—কিন্তু এ কি? বাটালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে কি করে! খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় পত্রবিরল ঘোড়া-নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ···অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব...সৌন্দর্যে ঝলমল চক্‌চকে কাল পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্তির, তার মুখের দৃঢ়রেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্প-ভঙ্গির হাতের আঙুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরনের···সকলের ওপর মূর্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল।···জয় হোক সে অতীত যুগের অজ্ঞাত-নামা শিল্পীর··জয় হোক তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!···

মূর্তিটাকে বাড়ি নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানিবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখতাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নিচে বাঁশ-পাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোনো জিনিস পাই নি, যাতে মূর্তিটির বা ভিটার সময় নিরূপণ করতে পারি। তবে মূর্তিটি গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরী, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্তিতেও দেখেছি।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।

এইবার যে কথা বলবো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলছি—অপরের কাছে এ কথা বলতে আমার বাধে; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপধুনো গুগ্‌গুল, ফুল, ঘি চন্দন সবসুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সেই ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিদ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেললো। রাত ক'টা হবে ঠিক জানি না···মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছিল···হঠাৎ দেখলাম, খাট থেকে কিছুদূরে ঘরের মেঝের কে একজন দাঁড়িয়ে···তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরোহিতের মত হলদে পরিচ্ছদ···মুখের হাতের অনাবৃত

অংশের রং যেন সাদা আগুনের মত জ্বলছে···বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল!···বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো···ভাল করে চোখ মুছলাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখছি ছেলেবেলাকার সেই Abou Ben Adhem (may his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকবার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাকবো। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম, একটু পরে বেশ ঘুম এল। কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল···ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম···আবার সেই নেশা! এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে' ফেললে···তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ময় বৌদ্ধ-ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!···

তারপর আরও কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটলো।

হঠাৎ আমার ঘরে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল···দেখলাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ি, শ্বেত-পাথরে বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল···অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর মত-পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এ-দিক ও-দিক যাতায়াত করছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত···একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ায় শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু! দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনায় নিরত এবং যুবক-মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোক-কুঞ্জের ঘন-পল্লবের প্রান্তস্থিত রক্ত-পুষ্পগুচ্ছের ঝরা পাপড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল···আমার তন্দ্রালস কানের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত সুর বেজে উঠলো···এক বিরাট উৎসবসভা! উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে···সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ···সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে ··সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরণে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে···মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম আঁটা এক যুবক···তার কোমরে ঝকঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার দুলছে···গলায় ফুলের মালা···মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটির নিটোল সুন্দর হাতটি ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো···পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো! চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ সাদা বরফের রাজ্য···ওপর থেকে বরফ পড়ছে...তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট···সামনে পেছনে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া···সামনে এক সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গমপথ

বেয়ে ভীষণতর হিম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে পথ চলছেন···তাঁর মাথা যেন ক্রমে ঝুয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে···কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলছেন···বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধ্বক্ ধ্বক্ করে' জ্বলছে।···

তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেললো। তারপরই চোখের সামনে —এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের পাড়াগাঁ···খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আসছে! বৈঁচি-ঝোপে শালিক পাখীর দল কিচ কিচ করছে। কাঁটালতলায় কোন গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সামনে আমার খুঁড়ে-বার-করা সেই দেবীমূর্তি!···দেখে মনে হোল, যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্তিতে সফল হয়েছে···বর্ষাসন্ধ্যার মেঘ-মেদুর আকাশের নিচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাবগভীর চোখদুটি মেলে সে পাথরের মূর্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।···

হঠাৎ সে দৃশ্যও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এবার তিনি কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন—তুমি যে মূর্তিটি মাটি খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। নয় শ' বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে; এবং এই জন্যেই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নয়পালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল; সে জন্য দেশের হিন্দু-সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দা যাই। বুদ্ধের নির্মল ধর্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই সে ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আজও আমার স্মরণ হয়। আজ অনেকদিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে-কথা বেশী করে মনে পড়ছে।···চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে-দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দার অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সে-দিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয়নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সে বিবাহের পুরোহিত ছিলাম।···অল্প বয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্তি গড়তে শিখি এবং অবসর মত আমি তার চর্চা রাখতাম। তারপর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্তি গড়ি। মূর্তিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্তিটির টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বলতো; কারণ, আমি একেই বৌদ্ধ ছিলাম, তার ওপর সাধারণভাবের ধর্মবিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্য আলোকিত করেছে—যা তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ। সাধারণ লোকের পক্ষে সে-সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যতে চিরদিন লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে-সব যুগপূজ্য জ্ঞান-তপস্বী আমার নিত্য সঙ্গী। তোমরাও অমৃতের পুত্র—সে লোক তোমাদের জন্যেও নির্দিষ্ট আছে। ···অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।···

বৌদ্ধ-ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন।···কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েছে বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ সেন গল্প শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মূর্তিটা কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—ঢাকা মিউজিয়মে।

দাতার স্বর্গ

শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন ছিলেন খুব দাতা। পথের দুঃখী আতুর নিরাশ্রয় লোককে চিরদিন তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সকলে বলতো তাঁর মত লোক আর হয় না; স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নেমে এসেছেন নবরূপ ধরে' প্রজার দুঃখ দূর করতে।

সামান্য ভাবে থাকলেও কর্ণসেন ছিলেন মস্ত ধনী। এই সব ধন বিতরণ করে' তিনি চিরদিন মহা সুখ পেয়ে এসেছেন। পথ চলতে চলতে অন্য অন্য কৃপণ-ধনীদের মূল্যবান অশ্বযোজিত-রথে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যেতে দেখে কর্ণসেন মনে মনে ভাবতেন—এই সব স্বার্থপর ধনীর চেয়ে আমি কত বড়! পরক্ষণেই কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতেন —না না, ও-কথা না, কে কাকে দেয়? ভগবান শুধু আমার মধ্যে দিয়েই তাঁরই ধন তাঁর জীবদের দিচ্ছেন বই তো নয়।

তখনই আবার তাঁর মনে হোত—আমি কি নিরহঙ্কার! আছে আছে, আমার ভেতরে কিছু না থাকলেই কি আর এত লোক থাকতে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর···অমনি আবার সামলে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন—না না, ওকি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহঙ্কার যতই ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করুন না কেন, মনের কোন্ গোপন-কক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকতো—আমি এমন যে দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপতে চেষ্টা করছি। ওই সব লোকে আর আমাতে কত তফাত! আমি একজন সাধু ব্যক্তি!

সেবার রাজ্য জুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদল-পোকার মত মরতে শুরু করে' দিল। রাজ্যময় মহা হাহাকার! নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালাগুলি ভর্তি হয়ে গেল। নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না নগরের পথের ওপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্যের চিন্তা দাতা কর্ণসেনেরই মনে সকলের আগে এসে পৌছতো। রাত্রে শুয়ে তাঁর হোল—এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্তে ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এত বড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হোল—ওই! ওই যে আমার মনে একথা উঠলো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কই, আর তো কেউ···

তখনিই আবার ভাবলেন—না, ছিঃ, ও-সব অহঙ্কারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে' তাঁর মনে হতে লাগলো—দিই বাড়িখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন—না, যাক্ গে যাক্। বাড়ি দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চলবে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে পড়তো, নিরাশ্রয় আর্তদের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি!

তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে' উঠতো, ভাবতেন—দিই বাড়ি ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ি। ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া···

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে এ-কথা জাগতো—উঃ! দেখছ, দেখছ! মনটা আমার কি রকম দেখেছ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ শুষ্ক মুখগুলো মনে করে' তাঁর চোখে জল আসতো।

মনে তাঁর উঁচু ভাবের ঢেউ এল—গেল। অন্যান্য বার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে' এসেছেন, এবার কিন্তু তিনি মনের সে ভাবটাকে চেপে রাখলেন। ভাবলেন—না না, বাড়ি নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তল থেকে এ-কথা উঠলো—আমি যে খারাপ লোক তা তো নয়। কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই? আর লোক যে আমি কৃপণ তাও তো নয়—আমি উঁচুই। তবে এবার ··

সেবা-যত্ন শুশ্রূষার অভাবে মৃত হতভাগ্য দরিদ্রের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ-ধনী—এ পর্যন্ত যিনি কোনো সৎকাজে এক কানাকড়িও কোনো দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্ত।

মহাপ্রাণ ধনীর জয়-গীতে নগর-পথ মুখরিত হতে লাগলো।

কর্ণসেন ভাবলেন—এঃ, কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল দেখছি। তাই তো, কি করা যায়!

পরদিন তিনি শুনলেন, কৃপণ-ধনীর মহান দানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নগরের আর একজন ধনী বণিক তাঁর বাড়িও রোগীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।

আনন্দ-কোলাহলে নগরে কান পাতা দায় হোল।

অন্যান্য বার সকল মহৎকার্যের অগ্রণী হতেন কর্ণসেন। তাঁরই দেখাদেখি অপরে তাঁর পথ ধরতো। এবার তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো—কই! আমিই যে তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তি, তা কই? এতদিন ভুল বুঝেছি। কাজ করাবেন ইচ্ছে করলে ভগবান পাষাণকেও গলিয়ে কাজ করাতে পারেন। নইলে পরীক্ষিৎ ওই কঞ্জুষ, ও কিনা নিজের বাড়ি...

কর্ণসেনের অহঙ্কার চূর্ণ হোল। তিনি ভাবলেন—ভগবানের কাছে চিহ্নিত অচিহ্নিত পাত্রাপাত্র নেই—সবাই সমান। আর আমিই বা এমন সাধুব্যক্তি কই? আমি যে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে উঠলাম না, অপরে তা তো করলে!

মনে মনে নিজেকে ত্যাগী পরার্থপর বলে, যে আত্মপ্রসাদ তাঁর মনে জাগতো, তা একেবারে দূর হয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধাই তাঁর এসে পড়তে লাগলো।

এদিকে প্রতিদিনই শোনা যেতে লাগলো, মহাপ্রাণ দাতাগণের পথ অনুসরণ করে আরও অনেক লোকে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। কর্ণসেনের বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে গেল, তিনিও যেন শীঘ্র একটা কিছু করেন। লোকে এবার তাঁকে নীরব থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সকল সৎকাজই তিনি সকলের আগে করতেন, এবার তিনি অবিলম্বে একটা কিছু না করলে দুনাম রটবে।

কর্ণসেন ভাবলেন—পরের দেখাদেখি এবং লোকের কাছে দুর্নাম রটবার ভয়ে তাঁকে দান করতে হবে! কি গৌরব সে দানের? আর যদিও বাইরের লোকে তার গৌরব করতে পারে কিন্তু মনে মনে তিনি তো বেশ বুঝতে পারছেন এ দানে তাঁর কিছুমাত্র মহত্ব নেই। যদি তাঁকে দান করতে হয় তো সে দায়ে পড়ে, মান বাঁচাবার জন্যে। এ দায়ের কথা মনে হলেই যে তাঁর মন নিচু হয়ে যাবে! অন্যান্য বারের মত সে উচ্চ আত্মপ্রসাদ কই এখানে?

কর্ণসেন মনে মনে মহা চটে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি কিছুই করবেন না। লোকে যা বলে বলুক, যে দান স্বার্থপ্রসূত, যার মূলে লোকের কাছে নিজের মান বাঁচানোর কথা নিহিত, এমন দান তিনি কখনো করবেন না।

শয্যায় শুয়ে অনেক রাত্রে কর্ণসেনের ঘুম ভেঙে গেল! জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন, দূর আকাশের নীল-সাগরের পারে একটি নক্ষত্র যেন তাঁর দিকেই চেয়ে জলছে, প্রলয়কালের বিশ্বের অনন্ত-জলময়ী প্রসারতার মাঝখানে অনাদিকারণ প্রজাপতির চিরজাগ্রত নেত্র-জ্যোতির মত!...আকাশের নিথর নীল বুকে শুভ্র-জ্যোৎস্নার তরঙ্গগুলো যেন তাঁরই সৃজন বীণার মর্মস্পর্শী নীরব রবে কেঁপে কেঁপে উঠছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—উঃ, কি সুযোগই হারিয়েছি! আজ যদি আমার বাড়িখানা ছেড়ে দিতাম তো এই রাত্রের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা যোগ হোত। আমার সঙ্গে ভগবানের আর কোন সম্বন্ধই নেই, কারণ আমি স্বার্থপর, আমি তাঁর প্রেরণার অবমাননা করেছি।

আকাশের সে দূর-নক্ষত্রটির ভর্ৎসনা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কর্ণসেন জানালা বন্ধ করে দিলেন।…

হঠাৎ আতুরদের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখগুলি আবার তাঁর মনে এল—আহা, এই রাত্রে তারা সব আশ্রয় অভাবে পথে শুয়ে রয়েছে!…

কর্ণসেন ভাবলেন—দিই না বাড়িখানা ছেড়ে। অবশ্য এ দানে আমার আর কোনো গৌরব নেই, কিন্তু তা নাই বা হোল, এই নিরাশ্রয় লোকগুলো তো আশ্রয় পাবে? এই শীতে তারা যে সব পথে শুয়ে মরছে!…

কর্ণসেনের মনের সে গোপন কক্ষটিতে এবার আর কোনও সুর শুনতে পাওয়া গেল না। তার পরদিন নগরের লোকে শুনলে, কর্ণসেন তাঁর বিরাট প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি নগরের দুঃস্থ আতুরদের আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটা তখন আর নতুন নয়। কেউ কেউ একটু আধটু প্রশংসা করলে। কেউ ভাবলে, দেবার ইচ্ছে ছিল না, মানের দায়ে দিতে হোল।

যথাসময়ে কর্ণসেনের মৃত্যু হোল। তিনি তাঁর কৃতকার্যের ফলাফল শুনতে যমরাজের খাস-দরবারে নীত হলেন।

সামনে প্রকাণ্ড খাতা খুলে বসে চিত্রগুপ্ত।

তিনি খাতা দেখে বললেন—দাতার স্বর্গ-ই হচ্ছে সমস্ত স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। এক একটি দানে শত মন্বন্তর করে সে-স্বর্গে বাস করবার অধিকার জন্মায়। তোমার একশত মন্বন্তর দাতার স্বর্গে বাস করা মঞ্জুর হয়েছে।

কর্ণসেন একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন—বোধহয় হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে, আর একবার না হয়—কারণ…

চিত্রগুপ্ত খাতার পাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—না, ভুল হয় নি। তুমি একবার তোমার বসতবাটী অত্যন্ত মড়কের সময় তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীদের উপকারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলে—এই একটি ছাড়া তোমার অন্য কোনো দানের কথা তো খাতায় লেখা দেখছি নে বাপু।

কর্ণসেন বেকুপের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

যমরাজ অন্য কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন।• তিনি অন্তর্যামী; কর্ণসেনের মনের কথা তাঁর মনে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি মুখ তুলে হেসে বললেন—বুঝেছি বাপু। কিন্তু তোমার অন্য অন্য দানের পুরস্কার আমরা তো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। তুমি দান করে কি একটা সুন্দর আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর নি?

কর্ণদেব বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

যমরাজ বললেন—সেই-ই তো আমাদের পুরস্কার! তোমার জন্মভূমি তোমার দানের খ্যাতিতে ভরে গিয়েছে, তুমি নিজে একটা সুন্দর তৃপ্তি অনুভব করেছ, ওই তো সে-সব দানের পুরস্কার। কিন্তু তুমি একটি দান একবার করেছিলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েই শুধু পরের দুঃখ মোচন হবে বলে। নিজের দিকে সে-বার তুমি চাও নি। তোমার সে দানের পুরস্কার তখন হাতে হাতে দিয়ে তোমার দানকে অপমানিত করতে আমরা সাহস করিনি। সেইটিই তোমার পাওনা আছে।

খুঁটি-দেবতা

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটার দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি-দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বস্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরানো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাকা দখলে আসিলেও চরাটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলুখড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী হাতে বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক-খানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ি আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধূলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা! ছই-এর মধ্যে কে?...

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই···

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কাণ্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পুবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা···

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই ?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধানে করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুরে যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইসম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে ?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পুবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায় ?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি ? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি ?···

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল—একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—ত্মাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ ঘরের পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে ত্মাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনো-দিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিছু অন্ত কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুণা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরার এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।...এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরারা দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণ-ছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজ-খানি!...

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে করজোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি...

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর, চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কণ্টিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত ; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে।

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে —সারা মাঠ চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।···

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত ; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল ; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়ের খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা—ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘর-খানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল। মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগোগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গার গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা …এগারোটা…বারোটা…রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!…রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?… উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম…ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?…রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি

রাতে রাঘবের চোখে এতটুকু ঘুম আসিল না—পলকের নিমিত্ত রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম···

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল। রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাকেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' ত্যাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়?··· পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা···এক ঘণ্টা···এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন...বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিতেছে কেন?···না, এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।···রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই—কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?···না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?···যাহা হউক

জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁটকী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন—তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্। এখনও জন তিনেক বাকী।...রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।...এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র!...মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন!

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট? এ সব কি আবোল-তাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়...

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?...ওটা কিসের শব্দ?...বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?...সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এতটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?...

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে! না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুণ...

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।...ঘুমাই নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারায় মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোম্‌টা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে...

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা...

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!...

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই।...

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রইল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের

শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিক চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি।...

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটকায় পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপবিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

গ্রহের ফের

"গত ২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষ রায়চৌধুরীর দ্বাদশ শ্রাদ্ধবাসরীয় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গণ্যমান্য অনেক বক্তা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। হলটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে কলেজের ছাত্র সংখ্যাই অধিক। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব ছিলেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্য দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না। সভার উদ্যোগিগণের উৎসাহ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা স্বর্গত অধ্যাপক-মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ করিলে দেশবাসীর সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।"—

—দৈনিক বসুমতী, ২৩শে অগ্রহায়ণ।

অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়, বড় আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সকালে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল। নলিনাক্ষবাবুর মত তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন না, বর্তমান কালের তরুণদলের অনেকেই তাঁকে দেখেন নি, কারণ আজ আঠাশ বছর হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু যাঁরা দেখে থাকবেন তাঁরা সেই পক্ককেশ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের চেহারা এখনও ভুলে যান নি নিশ্চয়ই।

আমি বলছি স্বর্গত রাজচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা।

নলিনাক্ষবাবু ও রাজচন্দ্রবাবু একই কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। নলিনাক্ষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে

প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাজচন্দ্রবাবু তাঁর পূর্ব থেকেই সেখানে অধ্যাপক। আমি তখন ছাত্র। যোটে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি পাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসে। ইডেন হিন্দু-হোস্টেলে থাকি। ভয়ে ভয়ে কলকাতার পথে বেড়াই, কি জানি কখন গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি, কি পথই হারিয়ে বসি! এত চায়ের দোকান তখন ছিল না, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে দু'তিনটেই যা ছিল। জাত যাবার ভয়ে তার ত্রিসীমানায় কখনও পা দিতাম না। এ-সবের দরুণ অজ-পাড়াগেঁয়ে বলে একটা অখ্যাতিও রটে ছিল আমার নামে।

সেদিন শনিবার। বেশ মনে আছে কি একটা ছুটি উপলক্ষে আমি বাড়ি যাবো। শোনা গেল পদার্থ-বিদ্যার লেকচার-থিয়েটারে রাজচন্দ্রবাবু একটা প্রবন্ধ পড়বেন। উৎসাহে পড়ে হোস্টেলের আরও দশ জনের সঙ্গে আমিও গিয়ে গ্যালারীতে ভিড় বাধিয়ে তুললাম। খুব গোলমাল হচ্ছিল। হঠাৎ প্রবন্ধ-পাঠক বক্তৃতা মঞ্চে উঠতেই গোলমাল থেমে সব চুপ হয়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথা ও একমুখ আধকালো, আধপাকা খাটো ঘন দাড়ি, বেঁটে চেহারা, মাথাটা দেহের অনুপাতে অত্যন্ত বড়। শ্মশ্রুযুক্ত বামনের মত চেহারাখানা। চোখ দুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চকচকে ইস্পাতের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্তি! ফার্স্ট ইয়ার শ্রেণীর ছাত্র, উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বোঝাবার কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, গ্যালারীতে ছাত্রের ভিড়, কলেজের বহু অধ্যাপকের উপস্থিতি, প্রবন্ধের ভেতরকার অপরিচিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি ও সেগুলির উচ্চারণধ্বনি, সকলের ওপর বক্তার চেহারা—সব মিলিয়ে আমার বড় ভাল লাগলো।

তারপর আরও বক্তৃতা তাঁর শুনেছি, যত বুঝি আর না-বুঝি প্রত্যেক বারই আমার অন্ততঃ মনে হোত যে এমন একটা মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, যা পথে-ঘাটে সুলভ নয়। যে-ধরনের লোক পৃথিবীটার ওজন মাপে, বড় গির্জা গড়ায়, সৌর-জগতের বয়স ঠিক করে জোয়ারের সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ খাড়া করে, পৃথিবীর রেডিয়ম-ভাণ্ডার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়—রাজচন্দ্রবাবুকে সেই শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হোত। নলিনাক্ষবাবু বা রাজচন্দ্রবাবু কেউই আমাদের ক্লাসে পড়াতেন না। কলেজের তেতলার বারান্দায় কতদিন বক্তৃতা-ঘণ্টার ফাঁকে দেখতাম রাজচন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলেছেন—এ অবস্থায় অনেক সময় তিনি নিজের পড়ানোর ক্লাসটিতে যেতে ভুলে গিয়ে হঠাৎ অন্য এক অধ্যাপনারত অধ্যাপককে বিপন্ন করে তাঁর ক্লাসটিতে ঢুকে পড়তেন এবং পরক্ষণেই চমক ভেঙে অস্ফুটস্বরে কি বলেই সে ঘর থেকে বার হয়ে পড়তেন। ছেলেরা বলাবলি করতো, তিনি সব সময় গণিতের উঁচু বিষয় চিন্তা করেন, পৃথিবীর মাটির খবর রাখেন না।

তা না রাখুন তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু রাজচন্দ্রবাবু উপরওয়ালার মেজাজের খবরটাও বড় একটা রাখতেন না বা রাখার জন্যে আগ্রহও করতেন না। এটাই ছিল তাঁর মহৎ দোষ। প্রিন্সিপাল লসন সাহেবের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়ের ছাত্রদের কাছে আর দুবার বা'বার দরকার হবে না—খুব ভাল লোক, দর্শন ট্রাইপসে জয়পতাকা উড়িয়ে পাস! সুতরাং

শুধু হাকিমী চালচলনের প্রিন্সিপাল নন, বিদ্বানও বটে। তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক রেহাই দিয়ে চলতেন। কিন্তু নিজের ডিপার্টমেন্টের উপরওয়ালা নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর বনিবনাও ছিল না আদৌ। কতদিন ছেলেরা দেখেছে, নলিনাক্ষবাবুর খাসকামরা থেকে রাজচন্দ্রবাবু অপ্রসন্ন মনে বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ছুঁদে সওয়ারের পাল্লায়-পড়া বিপন্ন একরোখা ঘোড়ার ভঙ্গিতে বার হয়ে গেলেন। নলিনাক্ষবাবুর হুকুম ঠিক মত তামিল না করার মূলে রাজচন্দ্রবাবুর যে ইচ্ছাকৃত কোনো অবিনয় ছিল তা নয় বোধহয়—তাঁর স্বভাবই ছিল সাধারণতঃ অন্যমনস্ক ধরনের। নলিনাক্ষবাবু অধস্তন কর্মচারীর এ রকম লর্ড কেলভিনের মত মেজাজ বরদাস্ত না করতে পেরে এবং সেটাকে তাঁর হুকুমের প্রতি সরাসরি ভাবের অমান্য ভেবে নিয়ে, সব সময় পঞ্চমে চড়ে থাকতেন।

আমার সহপাঠী প্রতুল হোস্টেলে আমার পাশের ঘরেই থাকতো। অঙ্কে খুব পাকা, হুগলী জেলা থেকে টেম্পল বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাস করে। চেহারা বেশ ভাল, আর একটু সেন্টিমেন্টাল ধরনের ছিল বলে' তাকে সকলে 'মিস্ গুপ্ত' বলে' ডাকতো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সে হোস্টেলের বারান্দায় বসে আমার কাছে গল্প বললে, বিকালে রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই আসছে। আমি জানতাম, কলেজে যে সব ছেলে মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রতুল সে-দলের একজন চাঁই। যেমন হয়ে থাকে কলেজে, ছেলেরা যে প্রফেসারকে পছন্দ করে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমায়। প্রতুলও তারপর থেকে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি যাতায়াত শুরু ক'রে দিলে।...একমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁর সংসারে কেউ নেই, বা তাঁর মেয়ের নাম যে প্রভাবতী, এ-সব কথা আমি ঐ প্রতুলের মুখেই শুনেছিলাম। প্রতুলের মুখেই শুনতাম তাঁর বাড়িতে চায়ের বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ তিনি নিজে চা খান না—ছেলেরা যাতায়াত শুরু করার পরে প্রভাবতী বাবাকে বলে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছেন—নিজে চা পরিবেশন করেন, কাজেই আজকাল এদের—বিশেষ করে প্রতুলের কোনো অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ একদিন মনে হোল রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি না-যাওয়াটা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মান ও ঔদাসীন্য দেখানো হচ্ছে। উঁহু—সেটা ঠিক নয়। পরের রবিবার প্রতুলের সঙ্গে বিকেলের দিকে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রাজচন্দ্রবাবু তখনও ওপরে নিজের ঘরটিতে পড়াশুনায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর মেয়ে আমাদের বসালেন, চা ও খাবার তৈরী হোল, খানিকক্ষণ গল্পসল্পও হোল। তাঁর কথাবার্তায় মনে হোল রাজচন্দ্রবাবু অন্য বিষয়ে যতই অন্যমনস্ক হোন না কেন, মেয়েটির শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে মোটেই ঔদাসীন্য দেখান নি।

তারপর আমরা ওপরের ঘরে গেলাম।• আগাগোড়া দেওয়াল বইভরা আলমারীতে ঢাকা পড়েছে। মেজের ওপর এখানে ওখানে যদৃচ্ছামত বই ছড়ানো। দেখে মনে হয় আলমারী-ভরা বই শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। দিস্তা দিস্তা সাদা কাগজে লম্বা লম্বা আঁকজোক ভরা তক্তপোশের ওপর, টেবিলে ছড়ানো "f" অক্ষরের বাড়াবাড়ি খুব, অনধি-

কারীকে যেন চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে আসছে। দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যক্ষদের সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর পত্র-ব্যবহার হয় বা তাঁদের দু' একজনের সঙ্গে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ তাও রাজচন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতির ফাঁকে প্রতুল খানকতক চিঠি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। হোস্টেলে এসে গল্পের সময় তাঁদের মধ্যে হেনরী রবার্টসন্ ও হ্যারল্ড জেফ্রিস্—দু'টো নাম শুনে একজন এম্-এ শ্রেণীর গণিতের ছাত্র বললে, বর্তমান কালে এঁরা নাকি গণিতের দুই দিক্‌পাল।

কলেজে নলিনাক্ষবাবু "On ইত্যাদি ইত্যাদি" নামক এক দুর্বোধ্য প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন সভাপতি। অন্যান্য অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গণিতের অধ্যাপকেরা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটা একবার দেখবার জন্যে, নলিনাক্ষবাবু বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামলেই কাড়াকাড়ি শুরু করলেন। কেবল রাজচন্দ্রবাবুর কোনো উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল না। তিনি নাকি, প্রতুল শুনে এল, বাড়িতে বলেছেন—নলিনাক্ষবাবু প্রবন্ধের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। অত অসম্পূর্ণ data-র ওপর নলিনাক্ষবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি করে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেছেন তা ভেবে রাজচন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে গেছেন—ইত্যাদি।

এর মাস পাঁচেক পরে Philosophical Magazine-এ রাজচন্দ্রবাবুর একটা প্রবন্ধ বার হোল। তাতে শুনলাম, তিনি নলিনাক্ষবাবুর মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যদিও নলিনাক্ষ-বাবুর প্রবন্ধের উল্লেখ কোথাও তিনি করেন নি। প্রতুল কলেজের লাইব্রেরীতে দেখালে, অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক O'sullivan তাঁর Geometry of Hyper-Spaces সংক্রান্ত নূতন বইয়ে অধ্যাপক সেনের অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন এবং গণিতের এই নূতন শাখায় অধ্যাপক সেন যে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন—মনীষী অধ্যাপক সে-কথা নিজ গ্রন্থের যথাস্থানে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

একদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। প্রভাবতীর হাতের রন্ধনের প্রশংসা এর আগে প্রতুল দু'একদিন করেছিল বটে—খুব যে বাড়িয়ে বলেছিল তা মনে হোল না। প্রভাবতী আমাদের সঙ্গে যত শান্ত, অসঙ্কোচ ও সহজ ব্যবহার করতেন ততই আমাদের, বিশেষ করে আমার আনাড়ি ভাবটা যেন বেড়েই চলেছিল; কোন রকমে নিমন্ত্রিতের কর্তব্য সমাপ্ত করার পর রাজচন্দ্রবাবুর আহ্বানে তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে টেবিল চেয়ার তত ছিল না। তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে আরাম করছিলেন। কথায় কথায় বললেন—ওহে, একটা জিনিস বার করে' ফেলেছি। ঠিক তিন বৎসর পরে একটা ধূমকেতু আসছে—এটা জানাশোনা বা তোমাদের ক্যাটালগের বাইরের জিনিস—এটা হয় আসছে প্রথমবার নয়তো অনেকদিন পরে। ঠিক তিন বছর পরে আমাদের আকাশে দেখা যাবে। তারপর তিনি জানালেন, অন্য একটা বিষয়ের অনুসন্ধান করতে এই ধূমকেতুর আসবার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—তবে এটা ঠিক যে বৈজ্ঞানিকদের তালিকাভুক্ত ধূমকেতু তা নয়।

একটা কিসের বন্ধে ছুটি হোল। হয়তো গ্রীষ্মের হবে, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন পর

দেশ থেকে কলকাতায় এসেছি। ছুটির সময় রাজচন্দ্রবাবু তাঁর দেশ ঢাকা জেলার চলে যেতেন তা জানতাম। এসেছেন কিনা দেখতে তাঁদের বাসায় গেলাম। প্রভাবতীকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে অন্য কোন চাকর-বাকরও ছিল না—সকালে ওপরের ঘরে আছেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাজচন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, তিনি একমনে কি লিখছেন—মুখ তুলে আমাকে দেখেই রুক্ষস্বরে গরম মেজাজে বলে উঠলেন—কে?···যাও যাও, যাও যাও···

কথা শেষ না করেই যেন মনে হোল, তক্তপোশ থেকে কি যেন একটা তুলে ছুঁড়ে মারতে গেলেন।

হঠাৎ পেছন থেকে চোখ টিপে ধরলে, মানুষ যেমন অতর্কিতভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ে—সেই রকম হয়ে পিছু হটে রাজচন্দ্রবাবুর ঘর থেকে বার হয়ে এলাম। পরে কাঠের পুতুলের মত মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গিয়েই দেখি, প্রভাবতী উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে—বোধহয় চীৎকার শুনে তিনি এইমাত্র নিচে থেকে ছুটে উঠে আসছিলেন। আমাকে দেখে শুষ্কমুখে বললেন—আসুন, নিচে আসুন অমলবাবু। দেশ থেকে কবে এলেন?

আমার বিস্ময় তখনও যায় নি, কথার উত্তর খুঁজে দিতে দেখি তাঁর চোখ দুটি জলে ভরা। বললেন—আজ মাসখানেক হোল বাবা ওই রকম হয়েছেন—এক আমি ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারে না। খান না, শোন্ না—কি সব অঙ্ক কষেন বসে বসে রাতদিন। মাথা একেবারে ঠিক নেই—ছুটিতে দেশে যাওয়া হয় নি। কি যে হবে অমলবাবু।

তাঁকে যথেষ্ট সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে সেদিন হোস্টেলে ফিরলাম। তারপর কয়েকমাস প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুর ওখানে প্রায়ই যেতাম। তাঁদের দেশ থেকেও প্রভাবতীর বড়-মামা এসে কিছুদিন থাকলেন।

কলেজে তাঁর চাকরি আর বেশীদিন থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দিন দিন তাঁর অপ্রকৃতিস্থতা যেন পরিস্ফুট হয়ে বেড়ে যেতে লাগলো। বেচারী নলিনাক্ষবাবু প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তাঁকে সামলাতে হিমসিম্ খেতেন, এ অবস্থায় তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিন্সি-পালের কাছে লম্বা লম্বা নোট পাঠাতে লাগলেন। চাকরিতে দীর্ঘদিনব্যাপী ছুটি নিয়ে নিয়ে শেষে ইস্তফা দিতে হোল।

তারপর কলকাতার বাস উঠিয়ে তাঁরা চলে গেলেন শিবপুর ব্যাটরা অঞ্চলে। সেখান থেকে চলে গেলেন চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রতুল একবার সেখানে গিয়েছিল। ফিরে এসে বললে, তাঁরা সামান্যভাবে আছেন, খড়ের বাংলো ঘরে থাকেন। রাজচন্দ্রবাবু অনেকটা ভাল আছেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন আজকাল। রোজ সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে খুব বেড়ান, কোনো কোনো দিন গ্রামের বাইরের মাঠে গিয়ে এক জায়গায় বসে বসে ওয়াটার-কলার ছবি আঁকেন শুনলাম। এ সংবাদটা নতুন এবং অদ্ভুত লাগলো। তুলি ও ইজেল হাতে রাজচন্দ্রবাবুর ছবিটা মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কোনো রকমে। ডাক্তারের

পরামর্শে অবসর সময়ে চিত্রবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেছেন, গণিতের কেতাব সব আলমারীর মধ্যে চাবি বন্ধ!

পুজোর ছুটিতে তাঁদের ওখানে গেলাম। প্রভাবতী ভারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক সুস্থ বলে মনে হোল বটে, কিন্তু আগেকার মত যেন দেখলাম না।

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—ওহে, তোমরা ধূমকেতুটার কথা ভুলে যাওনি তো?...ওটা আসছে কিন্তু ঠিক...

আমি বললাম—আগে এটা এসেছিল কখনো?

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—এসেছিল নিশ্চয়ই, তবে অনেকদিন আগে। মানুষ তখন শিশু ছিল। প্যারাবোলার পথে ঘুরতে—বড় প্যারাবোলার পথে ঘুরে আসতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে ..

আমি না বুঝিতে পেরে বললাম—প্যারাবোলায় ঘুরলে সেটা কি ফিরে আসবে আবার—

তিনি বললেন—কেন আসবে না? বড় প্যারাবোলা আর কিছু না—Ellipse-ই—তবে চ্যাপ্টা খুব বেশী, যাকে বলে Eccentricity খুব বেশী। অন্য ধূমকেতুর পথ ছোট Ellipse, মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই হয়তো দু'বার আসতে পারে—হতে পারে এর পথ ঘুরতে লেগেছে পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বছর।—দশ হাজার বছর আগে যখন এসেছিল তা মানুষের ইতিহাসের বাইরে...

তারপর সরল বৃদ্ধ অপ্রতিহতভাবে বললেন—ওহে, এটা তোমরা দাও না কাগজে-টাগজে লিখে! তারপরই তাঁর সেই প্রাণ খোলা হাসি।

কলকাতায় ফিরে খুব হইচই করা গেল। রাজচন্দ্রবাবুর লেখা এক চিঠি নিয়ে এলাম বঙ্গবাসীর সম্পাদকের নামে। বঙ্গবাসী তখন নামজাদা পয়সাওয়ালা কাগজ! বঙ্গবাসীতে বড় শিরোনামা ফেঁদে কথাটা ছাপা হোল। ক্রমে হিতবাদী, বসুমতী, ঢাকাপ্রকাশ, তখনকার সব বড় কাগজেই কথাটা ছড়িয়ে গেল।

তখনও অবশ্য তিন বৎসর বাকী। কথাটা দু' একবার আলোচনা হয়েই থেমে গেল।

তারপর কি হোল, সে-কথা এখনও বোধহয় অনেকে ভুলে যাননি। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়। জাপানীরা পর পর চেষ্টা করেও পোর্ট আর্থার দখল করতে পারছে না। জেনারেল স্টোশেল বন্দরের মধ্যে ইঁদুর-কলে আটকা পড়েছেন—ও-দিকে বাল্‌টিক-বন্দর চলে আসছে নৌ-সেনাধ্যক্ষ রোজডেস্টভেন্‌স্কির অধীনে! স্পেনের গ্যালিসিয়া প্রদেশের বন্দরটাতে কয়লা নিতে গিয়ে বন্দরের কর্তৃপক্ষদের অদূরদর্শিতার ফলে যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল, কাগজওয়ালারা তা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। সকলে বলছে, এইবার একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত না হয়ে আর যায় না। লোকে ভারী খুশী আছে, অনেকে রাত্রে ভাল করে ঘুমোয় না।

এমন সময় সংবাদ এল, স্পেনের সঙ্গে সে-বিবাদ রুশ মিটিয়ে ফেলেছে ইংরেজের মধ্যস্থতায়। অনেক হুজুগে লোক বড় আশাভঙ্গ হয়ে একেবারে শয্যাগ্রহণ করলো!

ঠিক এই সময়ে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব যেন সংবাদপত্র-গগনে হৈ-হৈ পড়ে' গেল। যেদিন আসবার দিন কাগজে ছাপা হয়েছিল সেদিনের কথা এখনো অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। সেদিন রবিবার, ৭ই জুন। সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই লোক ছাদে স্থান গ্রহণ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। ভাল করে' দেখতে পাওয়া যাবে বলে' অনেকে কলকাতার বাইরে চলে' গেল। নতুন অপেরা-গ্লাসের কাটতি 'লরেন্স ও মেয়োর' দোকানে খুব বেড়ে গেল। বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা কাগজে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো। উৎসাহী দু' একখানা কাগজ তাঁর সংক্ষিপ্ত কাল্পনিক জীবন-কথাও লিখে ফেললে। বিদ্যুতের ট্রাম তখন কলকাতায় নতুন হয়েছে —মোড়ের ওপর ট্রামযাত্রীদের কাছে দৈনিক বঙ্গ-সুহৃৎ খুব বিক্রি হয়ে গেল—তারা উৎসাহের আতিশয্যে আগন্তুক ধূমকেতুর ছবিটা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

এরকমও একটা গুজব রটেছিল যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটার সঙ্গে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীটা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। এই সংবাদটা দু' একটা হিন্দী কাগজে রটে যাওয়ায় মাড়োয়ারীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ওঠাতে শুরু করে' দিলে। একটা ছোট নতুন স্বদেশী ব্যাঙ্ক একদিনে দশটা থেকে ছ'টার মধ্যে একলক্ষ ষাট হাজার টাকা নগদ আদায় দিয়ে লাল-বাতি জ্বালাবার যোগাড় করে' তুললে। কিন্তু এক দুর্বোধ্য যুক্তিবলে সকলেই ঠাওরে নিলে, ধূমকেতুর লেজের ধাক্কায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক চুরমার হয়ে গেলেও তাদের লোহার সিন্দুকগুলো প্রাণে বেঁচে যাবে।

আমি তখন আর হোস্টেলে থাকি না, বহুবাজারের মোড়ে একটা মেসে থাকি। সন্ধ্যার সময় প্রতুল আমার বাসায় এল। দু'জনে ছাদে উঠলাম। আশে-পাশের ছাদ লোকে লোকারণ্য। ভীমনাগের সন্দেশের দোকান বন্ধ, ফুলওয়ালাদের দোকান বন্ধ, সেদিন তারা ছাদ ভাড়া দিয়েছে। ক্রমে বেশ অন্ধকার হোল। তখনও ধূমকেতুর কোনো সন্ধান নেই। রাত্রি আটটা বেজে গেল। নটা—দশটা—এগারোটা। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল। ফুল-ওয়ালারা মাল কাটাবার জন্যে অগত্যা অর্ধেক দরে মালা বিক্রি করতে লাগলো। আরও রাত হোল—কিন্তু কিছু হোল না।

প্রতুল আমায় বললে—এখন না, শেষ রাত্রের দিকে উঠবে···

সারা রাত্রির মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে দেখতে লাগলো। সে-রাত্রে অনেকেরই ঘুম হোল না। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না।

তার পরে আজকাল করে' এক সপ্তাহ, ক্রমে দু'সপ্তাহ কেটে গেল, ধাক্কা খাবার ভয়ে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তারা আশ্বস্ত হোল, ধাক্কা তো দূরের কথা—ধূমকেতুর পুচ্ছের একটা পালকও কারুর নজরে এল না।

কলেজে খুব হাসাহাসি হোল। নলিনাক্ষবাবু এতদিন চুপ করে' ছিলেন, বোধহয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর গণিতের প্রতিভার ওপর গোপনে গোপনে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এবার তিনি ক্লাসে এসে বললেন, (তখন তিনি আমাদের পড়ান) যে, পূর্ব থেকেই তিনি জানতেন ও কিছু নয়। রাজচন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি data-র ওপর এ আজগুবি খবর খাড়া করলেন

তা তিনি ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলেন ; তবে পাছে অশোভন হয় এজন্য কোন কথা বলেন নি। এমন কথারও আভাস দিলেন যে রাজচন্দ্রবাবুর মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হওয়ার দরুণই এই সব গোলযোগ এবং তাঁকে নিবৃত্ত না-করার দরুণ আমাদের মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন।

এ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হতে লাগলো। কাগজপত্রে, লোকের মুখে খুব গালাগালি চললো। নিরীহ রাজচন্দ্রবাবু কারুর কোন অনিষ্ট করেন নি, বরং ধূমকেতুর ধাক্কা খাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে লোকের ইষ্টই করেছিলেন—কিন্তু আমাদের একটা বৃহৎ আশা দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে তাঁকে কেউ ক্ষমা করলে না। স্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিসম্যান মুচকে হাসলে। যে কাগজে ধূমকেতুর ছবি বেরিয়েছিল, তারা ভালমানুষটি সেজে ধূমকেতুর আসা না-আসা সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করলে না। কলেজের নোটিশ বোর্ডে রাজচন্দ্রবাবুর ভক্তের বিপক্ষদলেরা খড়ি দিয়ে একটা ছবি আঁকলে···

দিন কুড়ি পরে প্রভাবতীর পত্র পেলাম, রাজচন্দ্রবাবুর অত্যন্ত অসুখ, একবার আসবেন।—অত্যন্ত অনুরোধ করেছেন।

প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুকে দেখতে গেলাম। তখন বৃদ্ধ একেবারে শয্যাগত, জ্ঞান নেই। প্রভাবতীর মুখে শোনা গেল, ক'দিন ধরে' বৃদ্ধ অনবরত আঁকজোক কষেছেন—তারপরই হঠাৎ ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হয় এবং রাত্রে খুব জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাক্তার মত দিয়েছেন, অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ফলেই এরূপ দাঁড়িয়েছে।

আমরা যাওয়ার তিনদিন পরে বৃদ্ধের অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল হোল। সন্ধ্যার ঠিক আগে তাঁর বিছানার পাশের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তিনি বালিশ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলেন। প্রভাবতী, আমি, প্রতুল ও আরো দু'জন ছাত্র—আমরা সকলে তাঁর বিছানার পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ ধীর ভাবে বললেন—ওটা আসছে—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, প্রকাণ্ড Parabola-র পথে ঘুরে আসছে—আকাশের দিকে চোখ চেয়েই আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি।

পরদিন প্রতুল সকালে আমার কাছে এল। বললে—একটা কথা আছে শোনো। তারপর সে বললে—অনেক রাত্রে রাজচন্দ্রবাবুর বিছানার পাশে প্রভাবতী জেগে বসেছিলেন, বৃদ্ধ মেয়েকে বলেছেন—তুমি সকলকে বলে' দিও হিসাব কষ্‌তে আমার পঁয়তাল্লিশ দিনের ভুল হয়েছে—আমি যেদিন বলেছিলাম তার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে ধূমকেতু ঠিক আসবে। কোন ভুল নেই, আসতেই হবে। বলে দিও ছেলেদের।···প্রভাবতী এ-কথা প্রকাশ করেছেন মাত্র, কিন্তু বৃদ্ধের কথা প্রলাপ কি সুস্থ মনের উক্তি না বুঝতে পেরে, কথার ওপর কোনো আস্থা স্থাপন করেন নি।

সেদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এল, দুপুরের পর তিনি মারা গেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা পরামর্শ করলাম, এ-কথা আর প্রকাশ করবার উপায় নেই—মৃত ব্যক্তির শিরে আর বিদ্রূপ বর্ষণ করার আয়োজন করে' কি হবে? প্রতুলের মত মুগ্ধ ভক্ত রাজচন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা জানি না। সেও

কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হোল। প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব কলেজ একদিন বন্ধ রাখলেন।

আরও কুড়ি দিন কেটে গেল। পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন মনের মধ্যে এমন একটা অদম্য কৌতূহল সকাল থেকেই শুরু হোল, যে, কোনো রকমে অন্যমনস্ক না হোলে সময় কাটানো অত্যন্ত কষ্টকর হোত বিবেচনা করেই সন্ধ্যার পর আমি থিয়েটার দেখতে গেলাম। দর্শকগণের উল্লাসের ও করতালির গণ্ডগোলের মধ্যেও কথাটা কেবলই আমার মনের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলো।

রাত্রি বারোটার পর মেসে ফিরে এলাম। আস্তে আস্তে ছাদে উঠে প্রতুলকে বললাম—চলে' আয় ভাই, নেমে আয়। রাত অনেক হয়েছে।

অনেকক্ষণ থেকে সে ছাদের ওপর হাঁ করে' ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতুলের চোখে জল এল। লোকে তাকে যতই সেন্টিমেন্টাল্ বলুক, নলিনাক্ষবাবুকে মনে মনে কৃপার পাত্র ভাবলাম সে রাত্রে, এ-রকম একজন মুগ্ধ একনিষ্ঠ ভক্ত ছাত্র লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়নি বলে'—উর্দ্ধন গিয়ে তিনি ইম্পিরিয়াল গ্রেডে।

কত রাত্রে জানি না···

কে ডাকছে—অমল···অমল···

ঘুম ভেঙে গেল। মেসের চার পাঁচজন ছেলে ব্যস্তভাবে বললে, শীগগির এসো ছাদে—একেবারে তেতলায় চলো। প্রতুলকেও তারা ডেকে ওঠালে।

প্রতুল ভূতগ্রস্তের মত দৌড়ে ছাদে উঠলো।

রাত্রি তিনটের সময়। নৈর্ঋত কোণ আলো হয়ে উঠেছে। দূরে গোলতলার মিশনারী স্কুলটার মাথার ওপর দিয়ে, আকাশের সেইদিকটা আলো করে' তুলে Astronomy-র পাঠ্য-কেতাবের ছবির মত অবিকল প্রকাণ্ড ধূমকেতু।···তবে পুচ্ছটা যেন একটু বাঁকা—ঠিক সোজা নয়, আর ঠিক পাশাপাশি দৃষ্টি না পড়ায়, একটু চ্যাপ্টা গোছের দেখাচ্ছে।···গোল অংশটা আমাদের দিকে ফেরানো, আর বাঁকা ঝাঁটার মত পুচ্ছটা মিশনারী স্কুলের ছাদ ছাড়িয়ে ধর্মতলার গির্জ্জার দিকে প্রসারিত।···

১৯০৪ সালের সে-কথা এখনও অনেকে ভুলে যান নি। আবার কি রকম হইচই হোল, সব কাগজে কি ভাবে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো, স্টেট্স্‌ম্যান সামনে নিয়ে কি কথা লিখলে।—কলেজে প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব সমস্ত ছেলে ও প্রোফেসার নিয়ে এক সভায় মৃত-আত্মার কি-রকম সম্মান করলেন—সে-আমলের ছাত্রেরা অনেকেই তা' এখনও ভোলে নি।

তারপর প্রতিরাত্রে প্রায় ক'মাস ধরে' ধূমকেতু ক্রমে নিকট থেকে, নিকটে আসতে লাগলো। পুচ্ছটা ক্রমে এক দিকে বেঁকে যেতে লাগলো—কিন্তু মাঝ-আকাশ ছুঁয়ে গেল না—নৈর্ঋত কোণ থেকে বার হয়ে একমাস এগারো দিন পরে ঈশান কোণ কেটে বেরিয়ে চলে' গেল।

কোন্ অনন্ত থেকে কোন্ বিশাল কক্ষ-পথে ঘুরে আসছে জানি না—এই প্রথম না এর আগে এসেছিল তাও জানা যায় নি। হয়তো শেষ যখন এসেছিল, আদিম-যুগের বিশাল

সমুদ্র তখন জনহীন আদিম-কালের পৃথিবীর বুকে দুলতো···সৃষ্টির তখন সবে শুরু...উত্তাল অগ্নিস্রোত কম্পমান পৃথিবী বাষ্পভরা নির্জন আকাশে বহুদূরাগত তার প্রিয় সন্তানদের স্বপ্ন দ্যাখে···

আবার যখন আসবে ফিরে—হয়তো দশ হাজার বৎসর পরের কোন্ তরুণ-যুগের মানুষেরা তখন তরুণ-দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবে নতুন আশা, বল ও উৎসাহ নিয়ে। কে জানে ?...

যে জানতো—সেও এই ধূমকেতুর মতই অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে—তবে ধূমকেতুটা হয়তো আবার ফিরে আসবে—কিন্তু সে-মানুষটি আর ফিরবে না।

বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে এই সব পুরানো কথাই মনে এল নতুন করে' !

মরীচিকা

কাল রাত্রে গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই ভাল।

আজ চাটুয্যে-গিন্নীর নাৎনীকে দেখিতে আসিবার দিন। গ্রামসুদ্ধ মেয়েপুরুষ সেখানে আজ নিমন্ত্রিত।

কিন্তু শুধু নিমন্ত্রণের আনন্দই যে এদের ঘুম না-হইবার একমাত্র কারণ, তাহা নয়। ছোট্ট গাঁ, সবসুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরি করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না। তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা, খাওয়ার আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। তাছাড়া যে বর, সে-ই স্বয়ং আসিতেছে নিজের চোখে পাত্রী দেখিতে—আজকালকার ছেলের ভাই ধরন। রেলের স্টেশনে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি গিয়াছে। বেলা দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছাইয়া যাইবে। রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একদিকে ভুষির বস্তা ও বিচালীর স্তূপ সরাইয়া নূতন মাদুর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, কারণ চাটুয্যে-বাড়িতে বাহিরের বসিবার ঘর নাই। পাত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের শখের যাত্রাদলের ছেলেরা কয়দিন হইতে গান-বাজনার তালিম দিয়াছে; একটি ছোক্‌রা মামার-বাড়ি বেড়াইতে গিয়া কলের গানে রিজিয়া ও বক্তিয়ারের অভিনয় শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিল—গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বহুবার শুনাইয়াছে—আজ সেও একবার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া আছে।

সকাল হইতেই চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের জটলা। তাহারা ঘন ঘন তামাক খাইতেছে ও নানাবিষয়ে গল্পগুজব করিতেছে। বিশ্বাস-মহাশয়ের এক দূর-সম্পর্কের ভাই কলিকাতায়

কোন্ গলীতে বিল-সরকারের চাকুরি করিত—কলিকাতার গল্প বিশ্বাস-মহাশয় তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন—সম্প্রতি তিনি তাহাই মুগ্ধ ও কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বলিতেছিলেন।

পাঠশালার গুরু নিতাই সামন্ত আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গরুর গাড়ি ফিরেছে—বাঁশ-ঝাড়ের আগালে পড়ে' জুলির পথটা বুজে গিয়েছে কিনা, তাই ঘুরে আসছে বোধহয়।

সকলেই গরুর গাড়িটা দেখিল, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না যে, পাত্র আসিতেছে। গরুর গাড়িটা ঘুরিয়া পিছনের পথ দিয়া আসিতেছিল, কেহই দেখিতে পাইল না ছই'-এর মধ্যে লোক বসিয়া আছে কিনা।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে। কলেজের ছেলেটি আসিয়া মাদুরে বসিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ কি এক-আধবছর বেশী, রং ফরসা, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি ও চাদর, চোখে চশমা। সে বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে প্রথম ট্রেনটা ফেল হইবার গল্প করিতেছিল। সবাই হাঁ করিয়া শুনিতেছিল।

প্রথমে যদু ভড়ের কীর্তনগান শুরু হইল। তারপরে দুলাল মুখুয্যে শ্যামাবিষয়ে গাহিলেন। একজন বেহালা বাজাইল। তারপরেই রিজিয়া ও বক্তিয়ার।

গ্রামের সাতকড়ি মুখুয্যে এইবার তাঁর ছেলে তিনটিকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। সাতকড়ি লেখাপড়া আদৌ জানেন না, গোলার ধানে সম্বৎসর চলিয়া যায়—সুতরাং চাকুরির ধারও ধারেন না, কিন্তু তাঁর ঝোঁক গান বাজনার দিকে। পাঁচটি ছেলের একটিকেও লেখাপড়া শেখান নাই, গান-বাজনা শিখাইয়াছেন, এবং যে-সব গ্রাম্যমজলিসে অন্য গ্রাম হইতে দু'পাঁচজন বাহিরের লোক আমদানী হয়, সে-সব স্থানে ছেলে কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া একখানা কম দামী বেহালা হাতে সাতকড়ি গিয়া হাজির হন।

ইনি আসন গ্রহণ করিয়াই সেজ ছেলে বসন্তকে বলিলেন—বাবা, রজনের থলিটা আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে—একবার দৌড়ে যাও তো বাড়ি—চালির মুড়োয় তোলা আছে।

বসন্ত অপ্রসন্ন মুখে পৈঠা দিয়া নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে সে বাবাকে দু'কথা শুনাইত—কিন্তু নবাগত শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহার সাহসে কুলাইল না।

—গেন্থু (বসন্তের ডাক নাম) আজকাল যা কীর্তন গায়, চমৎকার। রাস্থ অধিকারীর গাওনা তো শুনেছি ঘেঁটুপাছির বারোয়ারীতে—তার চেয়ে কম নয়। আমার ছেলে বলে, বলছি নে পদ্ম খুড়ো, তা নয়। রজনটা ফেলে এসে মুশকিল হোল কিনা।···শোনাচ্ছি একখানা, আসুক।

পদ্মলোচন চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত—তিনি গান-বাজনা বিশেষ বোঝেন না, তবুও সাতকড়িকে খুশী করবার জন্য বলিলেন—আহা হীরের টুক্‌রো ছেলে তোমার বসন্ত। ওর গলা আর শুনিনি আমি?···কোজাগরী পুজোর দিনে মহিমদা'র বাড়িতে গাইলে—আহা, যেমনি গলা তেমনি তাল-বোধ।

সাতকড়ি ছেলে তিনটিকে চারিধারে বসাইয়া নিজে মধ্যে বসিলেন। ইতিমধ্যে রজন্ আসিয়াছিল, গান শুরু হইল।

—আর একটা গেয়ে ধর বাবা

বলিয়া সাতকড়ি গর্বিত হাসিমুখে ও প্রশংসমান দৃষ্টিতে কীর্তনগানরত পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া আবার চারিধারে চাহিতে লাগিলেন। গান একে একে অনেকগুলি হইল। সাতকড়ি বড় ছেলেকে একবার ফরমায়েশ করিয়া বলেন—মান্থু, গা তো সেই "ওগো শ্যাম গুণমণি ?"...বড় ছেলের শেষ হইলে আবার সেজ ছেলেকে ফরমায়েশ করিতেছিলেন—ধর দিকি বাবা "মম মানস শুক পাখি ?" অনেকদিন শুনিনি তোর মুখে। কৈলেস খুড়ো, একটু ঠেকা দিয়ে যাও না, ভাল গানখানা···

সাতকড়ি ছেলেদের লইয়া আসিবার পরে আসরে আর কেহ আমল পান নাই। সাতকড়ি নিজের ছেলেদের নিজে বাহবা দিয়া, হাসিয়া, চোখ বুজাইয়া ঘাড় দোলাইয়া, ফরমায়েশ করিয়া এমন জমাইয়া তুলিলেন যে আর কাহারও আমল পাইবার যো ছিল না।

খানিকটা পরে আগন্তুক শহরে-ছেলেটি কি কথায় কথায় কলেজের গল্প তুলিল। সে নূতন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী। এ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকজনের মাঝখানে কথা বলিয়াও সুখ আছে। তাহার ইংরাজী বুক্‌নি-মিশানো কথাবার্তায় সাতকড়ি ভয় খাইয়া গেলেন। ছেলেটি বলিতেছিল—এ সব পাড়াগাঁয়ে সে-সব কেই বা বোঝে ?...এডুকেশন না থাক্‌লে কি একটা জাত কখনো উঠতে পারে ?...কলেজে আজকাল মেয়েরা পড়ছে—এম্‌-এ, বি-এ পর্যন্ত পাস করছে—সে-সব দিন কি আর আছে ?···দেখে আসুন একবার কলকাতায় গিয়ে।

মেয়েদের এত লেখাপড়ার কথা এ-গ্রামে কেহ শোনে নাই। কৈলাস ভট্টাচার্য বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—মেয়েরা এম্‌-এ, বি-এ পাস দিচ্ছে ? বলো কি বাবাজী! কই এ-কথা শুনিনি তো ?···

—এ পাড়াগাঁয়ে বসে' শুন্‌বেন কোথা থেকে ? ছেলেরা যেখানে কখনো স্কুলের ›› দেখেনি, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা তো ভাবতেই পারবেন না।

ও-দিকে সাতকড়ি মুখুয্যে একটু অপ্রতিভ হইলেন। শুধু অপ্রতিভ নয়, কোথায় যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন। পাঁচ পাঁচটি ছেলের কোনোটিকেই তিনি লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা করেন নাই—গান-বাজনা শিখিলে ভদ্রসমাজে, মজলিসে সর্বত্র সম্মান ও গৌরবলাভ করা যাইবে—এতদিন তিনি ইহাই জানিয়া আসিয়াছেন, ছেলেগুলিকে সেই অনুসারেই মানুষ করিয়াছেন। কুলবেড়ের বাহিরে বড় জগৎটাতে যে অন্য ধরনের হিসাব-নিকাশ প্রচলিত, তাহাদের খোঁজও তিনি জানিতেন না।

তিনি নিঃশব্দে তাঁর বেহালাখানা খেরোর খাপের মধ্যে পুরিলেন, রজনের থলিটা সবার অলক্ষ্যে বড় ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একটু পরে জলযোগের ডাক পড়িল।

ইহাও কেবল মাত্র ভাবী পাত্রের জন্য নহে, গ্রামস্থ সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের জন্য। ছেলেটি এই প্রথম পাত্রীর বাড়ি দেখিল। দেখিয়া একটু নিরাশ হইল। চার পাঁচখানি

খড়ের বড় বড় ঘর, সামনের উঠানে বড় বড় গোটাকতক গোলা, দক্ষিণে একটা পুকুর, একটা বাতাবীলেবু গাছ ও গোটাকতক নারিকেল গাছ। পাত্রীর দিদিমা বাড়ির কর্ত্রী; তিনিই গ্রামসুদ্ধ সকলকে আদর করিয়া বসাইলেন, জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন মিটিতে দুইটা বাজিল। ছেলেটি একটু অবাক হইল, ইহাদের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া। একটি পনেরো বছরের বালকও যাহা খাইল, তাহা তার নিজের তিন বেলার খোরাক।

বেলা যখন পাঁচটা, তখন কৈলাস ভট্‌চায আসিয়া বলিলেন—বাবাজী, ওঠো একবার মেয়েটিকে ছাখো। বাবাজীই বলি, তোমার সঙ্গে তো সম্পর্কই বাধলো. মেয়ে দেখে অপছন্দ হবে না। তবে এ তো শহর বাজার নয়, একটু আধটু যা ত্রুটি, তা তোমাকে শুধ্‌রে নিতে হবে বৈকি। এসো বাবাজী।

আবার চাটুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, অন্ধকার মত একটা উৎসবের ব্যাপার ইহাদের গ্রামে অনেককাল ঘটে নাই। অন্ততঃ আগন্তুক ছেলেটির তাহাই মনে হইল; নতুবা গৃহস্থ-বাটীতে মেয়ে-দেখানো-রূপ সামান্য ব্যাপারে গ্রামসুদ্ধ লোকের এত উৎসাহ কেন?

মেয়ে দেখিয়া ছেলেটি সন্তুষ্ট হইল। বেশ স্বাস্থ্যবতী, রং খুব ফরসা না হইলেও মানানসই —মুখশ্রী সুন্দর, বড় বড় চোখ। কেবল ইহাদের চুল বাঁধিবার ধরন সে পছন্দ করিল না। পাতা-কাটা খোঁপা শহর হইতে কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে, আর ইহারা সেটাকে এখনও ফ্যাসান্ বিবেচনা করে! তা ছাড়া অত গহনা কেন গায়ে? গহনার ভারে মেয়েটি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

দিদিমা সজল চোখে বলিলেন—ওকে নাও গিয়ে দাদাভাই। ও আমার যেমন মেয়ে, তেমন মেয়ে এদিকে নেই, এ আমি বড় গলা করে' বলতে পারি। ওরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে' গেল, মেয়ে তখন তিন মাসের—সেই থেকে আমার কাছে মানুষ। আমারও তো ও-ছাড়া আর কেউ নেই, ওর বাবা কোনো খোঁজ নেয় না; সে আবার বিয়ে করেছে ছেলেপুলেও হয়েছে, সে এ-দিক-মাড়ায় না। তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই—তারপর যা রইলো সবই তোমাদের। কর্তারা যা করে রেখে গিয়েছেন, তাতে চাকরি করে' খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চাকরি কখনো কেউ করে নি।

কৈলাস ভট্‌চায বলিলেন—এ-গাঁয়ে কখনও কেউ চাকরি করেছে বউ-ঠাক্‌রুণ? আপনাদের কর্তাদের কথা তো বাদই দিন, তাঁরা তো ছিলেন গাঁয়ের মালিক, মাথার মণি—আমাদের কর্তারা, কি আমরা কখনো গাঁয়ের বাইরে অন্নের চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি? রামোঃ। এই যে দেখছো বাবাজী উত্তরে মাঠ এ সব লাখ্‌রাজ, একেবারে সেই রতনপুরের নীলকুঠি পর্যন্ত। তবে এদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, একা বউ-ঠাকরুণ আছেন, মেয়েমানুষ—তাই চাষ বাস হয় না। নইলে বাট সত্তর বিঘে খাসে আমন ধানের জমি রয়েছে, দুটো বড় পুকুর রয়েছে —চাষ করলে ভাবনা কিসের? এই দেখছো বটে খড়ের ঘর, এ গাঁয়ে সকলেই এঁদের প্রজা।

ছেলেটির নাম সুরেন। আহারাদির পরে সে বাড়ির চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল। কলিকাতায় থাকিবার আজকাল বড় কষ্ট, পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরির বাজারও সুবিধা নহে—যদি এখানে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া বাস করা যায়, এ পল্লীগ্রামের শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে শহরের উগ্র জীবন-সংগ্রাম হইতে বেশদূরে, নিশ্চিন্তভাবে চমৎকার জীবন কাটিবে এখন।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ জমিটা পড়ে' আছে কেন ভট্‌চায্যি মশায়।

—ওই যে তোমাদের বল্‌লাম বাবাজী, এদের বাড়িতে চাষ করবার মানুষ কই? বুড়ী একা তো সব দিক্ দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে যদি বিধাতা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তবে তুমিই এসে সব নিজের হাতে নাও না? তোমার তা হোলে কি কারুর চাকরি করতে হবে! পায়ের ওপর পা দিয়ে চাটুয্যেদের সাত পুরুষ এই ভিটেতে দুধ-ঘি খেয়ে কাটিয়ে গিয়েছে, তোমারও কাট্‌বে।

সুরেন নিজের মেসের কথা ভাবিতেছিল। জানালাহীন ছোট্ট ঘরটার কথা ভাবিল—হাওয়া কোনো কালে খেলে না, গরমে অর্ধেক দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এতটুকু এক টুকরা মাছ, বিস্বাদ ডাল, ততোধিক বিস্বাদ তরকারী—একদল লোক খাইয়া উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভাল করিয়া না ধুইয়াই তাহার উপর আর একদল লোক খাইতে বসিয়া যায়, দেওয়ালের গায়ে আরসুলা চলাচল করে—সব কথা ভাবিয়া দেখিল।

এখানে এই মুক্ত মাঠের ধারে স্বাধীন জীবন—নিজের লোকজন, নিজের হুকুমমত সকলকে খাটানো। সে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এ-সব তো তাহার কাছে স্বর্গের মতই নাগালের বাহিরের জিনিস।

মন্দ কি? আইন পাস করিয়া কি হইবে? এই তো বেশ।

মহা উৎসাহে সে ভট্‌চায্যি-মশায়কে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত আরও প্রশ্ন করিতে লাগিল। কলমের বাগানগুলা কোন্ দিকে? প্রত্যেকটাতে কতগুলা করিয়া গাছ? পুকুরগুলা কি মাছ ছাড়িবার উপযুক্ত আছে?

বেলা খুব পড়িয়া আসিয়াছিল। নিকটের বিলের ধার হইতে চরিয়া গরুর দল কর্দমাক্ত গায়ে বাড়ি ফিরিতেছিল। সান্ধ্য হাওয়ায় তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা দুলিতেছে ও শুক্‌না তালপাতার খড়্-মড়্ শব্দ হইতেছে!

সুরেন একা একটু বেড়াইবার জন্ম দক্ষিণের মাঠের রাস্তাটা ধরিল। কৈলাস ভট্‌চায এবার সঙ্গে আসেন এটা সে চায় না; কিন্তু ভট্টাচার্য মশায় খোশগল্পের শ্রোতাকে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—শুভ রত্নপুরের খড়ের মাঠটার শালিয়ানা তিনশো টাকা আয় ছিল বাবাজী। বাঁড়ুয্যে-গিন্নি তো বোঝেন না, ওঁকে ঠকিয়ে সেটা বারো ভূতে খাচ্ছে। তুমি দেখে শুনে খাসে আদায় করবে, শিখিয়ে দিলাম তোমায়!

সন্ধ্যার পরে আবার অনেকে চণ্ডীমণ্ডপে জড় হইল।

সুরেন এবার যেন এখানকার এই সকল আনন্দস্রোতে নিজেও ভাসিয়া গেল। সাতকড়ির বেহালা ছ'তিনবার ফরমাইশ করিয়া শুনিল, তাঁর ছেলের কীর্তনের তারিফ্ করিল।

সাতকড়ি বলিল—গাঁয়ের সব ছেলেরা আমায় ধরেছে, তোমায় বলতে সাহস করে না, বাবাজী, এবার ওরা একটা শখের দল খুলছে, তোমায় কিছু চাঁদা দিতে হবে।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি লোক হাসিমুখে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া হাত তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল।

সাতকড়ি বলিলেন—এসো মাস্টার বসো। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এলে? সুরেন বাবাজী, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, ইনি পাশের গাঁয়ে স্কুল খুলেছেন; খুব ভালো মাস্টার, নিভাননীকে ইনি একবেলা ইংরাজী পড়ান।

মাস্টার সুরেনের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেনের মনে বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল না। এমন তেল মাখিয়াছে যে কানের পাশ গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ পানে লাল, বোকার মত হাসিটা। হাঁ, ইংরাজীর অধ্যাপক বটে! ভাবী পত্নীর ইংরাজী শিক্ষাটা হইতেছে ভালোই। মাস্টার জুটিয়াছে যখন এমন!

মাস্টার বসিয়া বসিয়া বক্‌বক্ করিতেছিল। নিজের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ কে ছাড়ে? কি করিয়া নিভাননীকে অক্ষর চিনাইল কি করিয়া এ-বি-সি লিখিতে শিখাইল সেই সব বলিল। মাস্টারের কথা শুনিয়া সুরেনের মনে হইল—ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার গল্প তার ইংরেজী-ভাষাজ্ঞান-রূপ সৌধের সর্বোচ্চ। অতএব ছাত্রীর বিদ্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কি করিবে সে। এই দূর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েকেই জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেসের দেনা মিটাইতে না পারিলে আগামী মাসে ছাড়িতে হইবে—চারিধারে বন্ধুবান্ধব-মহলে দেনা, দেনা। কলিকাতায় আর কতদিন টিকিয়া থাকা চলিবে?

ভাগ্যে, সে এই মেয়েটির বাপের এক বন্ধুর নিকট হইতে মেয়ের সন্ধান পাইয়াছিল। তিনিও তাহার মেসেই থাকেন। তাঁহার চিঠি লইয়াই সে এখানে আসিয়াছে মেয়ে দেখিতে। পাল্টি ঘর, দেখিতে সুশ্রী, কলেজে পড়াশুনা করিতেছে—ইহাদেরও আপত্তি হইবার কথা নয়।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

সে-কথা এখনও পর্যন্ত সে কাহাকেও বলে নাই, কারণ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে অতি দরিদ্র, তাহার নিজেদের ঘর বাড়ি পর্যন্ত নাই, তাহার বাবা চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সেকালের ঘর-জামাই। ইঁহাদের কথাবার্তায় সে বুঝিতেছে, যে শিক্ষিত ও শহুরে পাত্রের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে শহর-বাজারে বাসায় থাকিবে, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবে, গহনা-গাঁটি পরিবে—ইহা মেয়ের দিদিমার একটা সাধ এবং সম্ভবতঃ মেয়েরও।

কিন্তু তাহার দ্বারা কোনো সাধই যে পূর্ণ হইবার নহে, সেই কথা খুলিয়া বলা হয় নাই। সে বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কাপড় জামা, চশমা ধার করিয়া আনিয়াছে বলিয়া ও চেহারাটা সুশ্রী বলিয়া উহাদের পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে সে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। ইহারা সন্ধান করিয়াও আসল ব্যাপার বাহির করিতে পারিত না; কারণ তাহার মামারা সত্যই অবস্থাপন্ন। তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনের সে-বাড়িতে স্থান যে বাড়ির চাকর-বাকরের চেয়েও নিচু, তাহা ইহারা বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে কি—বিশেষতঃ, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোক এরা!

নানা দিক ভাবিয়া সে এখানে আসিয়াছিল। মেসের ভদ্রলোকটির মুখে সে সবই শুনিয়াছে। মেয়ে-জামাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাঁড়াইবে, সত্য বটে। সে এখন নয়, বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে যদিও—তবুও সারাজীবনের অন্নসমস্যার মীমাংসা বিবাহের সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে যদি অবস্থা গোপন করিয়া বিষয়ের লোভে এখানে বিবাহ করে, যদি সে কাহাকেও কিছু না ভাঙে, হয়তো ইহারা কোনো অনুসন্ধান করিবে না তাহার বিষয়, হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কাজের পরিণাম ভালো নয়। ইহার পর স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল। নবীন পল্লীপ্রকৃতি একটি রহস্যাবৃত সৌন্দর্যের কুয়াশায় নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

অত্যন্ত সহজেই এ বাড়ি এই গ্রামের মাঠ, বন, তাহার আপনার হইতে পারে।

কি করিবে সে?···

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেদিন সকালে কৈলাস ভট্চায তাহাকে নিজের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছিলেন—সুরেনের আপত্তি তিনি শুনিলেন না। বলিলেন—বাবাজী, ভারী তো খাওয়াবো, দুটো মাছের ঝোল ভাত—তার জন্যে কি তোমার ট্রেন ফেল্ করাবো আমি! সব সকাল সকাল হয়ে যাবে এখন। গাড়ি ধরিয়ে দেবার ভার আমার ওপর! তুমি এখন থেকে আপনার জন হতে চললে, দুটো না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

খাওয়ার আয়োজন সকাল সকালই হইল। দুধ, মাছ, দই সব চাটুয্যে-বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই পুকুরে শেষরাত্রে মাছের জন্য জাল ফেলা হইয়াছিল। চাটুয্যে-গিন্নীও উপস্থিত ছিলেন, কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। ছেলেটিকে সত্যই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিমান, অমায়িক—লেখাপড়া জানা তো বটেই। নিভাননীর অদৃষ্টে এখন এমন বর জুটিলে তো! তেমন কপাল কি সে করিয়াছে!

গরুর গাড়িতে উঠিবার সময়ে তিনি পথে খাইবার জন্যে গাড়িতে ডাব, পেঁপে ও আম তুলিয়া দিলেন। বাড়ির একজন চাকর সুরেনকে জিনিসপত্র সমেত ট্রেনে তুলিয়া দিতে যাইবে, ঠিক হইল।

চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন—দাদাভাই, এ কাজ যাতে বোশেখ মাসের মধ্যে হয় তা তোমাকে করতেই হবে। নিভাননীকে তোমার নিতেই হবে। দেখে শুনে তো সবই গেলে, তোমার বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিও, এসে মেয়ে আশীর্বাদ যেন করে' যান। আমায় কথা দিয়ে যাও, যে এতে তোমার অমত নেই। গিয়েই পত্তর দিও দাদা···

সুরেন চলিয়া গেলে দিন কতক গ্রামে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিল এবং সাতকড়ি ছাড়া অন্য সবাই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করিয়াছে। কৈলাস ভট্‌চায তো সকলের কাছে তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া বেড়াইলেন।

একদিন করিয়া সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। সুরেনের কোনো পত্র বা সংবাদ কিছুই আসিল না। চাটুয্যে-গিন্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন বারো কাটিল। কোনো খবর নাই। চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের ঠিকানায় কৈলাস ভট্‌চাযকে দিয়া লিখাইয়া রেজেস্ট্রী পত্র দিলেন।

আরও দিন কতক কাটিল, সে-পত্রের কোনো জবাব আসিল না।

চাটুয্যে-গিন্নী কৈলাস ভট্‌চাযের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কৈলাসের নিজের বড় ছেলে রাম, পাশের গ্রামের নবীন কাপালির সঙ্গে দিনকতক ভাগে কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াছিল; বার তিনেক কাঁঠালের চালান লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল; সুতরাং তাহাকেই সুরেনের বাসার ঠিকানা দিয়া কলিকাতা পাঠান হইল।

তিন দিন পরে রাম ফিরিল। কলিকাতার মেসের সেই বাবুটি একখানা পত্র দিয়াছেন, সেখানা সে বাবার হাতে দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। সুরেন বাঁচিয়া নাই। এখান হইতে ফিরিয়া দিন-কতক পরে সে নিজের দেশে অর্থাৎ মামার বাড়িতে যায় পিতার সঙ্গে সব কথা খুলিয়া বলিতে, সেখানে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। পরের শ্রাবণেই নিভাননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাড়ার বড় চণ্ডীমণ্ডপটাতে আবার বিস্তৃত বরাসন পাতা হইয়াছে। দুপুরের পর হইতে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা জড় হইয়া ভিড় করিতেছে। গ্রাম-সুদ্ধ সবারই আজ চাটুয্যে-বাড়ি নিমন্ত্রণ—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়াটুকু যে তাহা নয়, শূদ্রভদ্র সবারই। কৈলাস ভট্‌চায ব্যস্ত আছেন; কারণ চাটুয্যেদের পুকুরে সব ছোট মাছ বলিয়া মহিমপুরের নিকারীদের মাছের বায়না দেওয়া হয়েছে, মাছ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বৈকালে বরের দল আসিল। বরের বাড়ি এদিকেই, গোটাদুই স্টেশন পরেই। ইহাদের আনিতে বরের পাল্কী বাদে খান পাঁচছয় গরুর গাড়িও স্টেশনে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধের দলই বেশী, দুই একটি বালকও আছে।

মেয়েরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের ধারে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেটে হাঁড়ীর ভিতর দৃষ্টি-প্রদীপ লইয়া কৈলাস ভট্‌চাযের স্ত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নী একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বরের পাল্কী পাকুড় তলায় নামাইল।

বর পাল্কী হইতে বাহির হইল। বরকে এ-পর্যন্ত এখানকার কেহ দেখে নাই, বরের জ্যাঠামশাই আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া গিয়াছিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দোজপক্ষে বিবাহ করিতেছে, এবং খুব ফরসা না হইলেও কালো নয়, বেশ স্বাস্থ্য, মাথায় সামনের দিকে একটা ছোট টাক।···

চাটুয্যে-গিন্নী অনেকক্ষণ হইতে একদৃষ্টে পাল্কীর দিকে চাহিয়াছিলেন। ঝি-বউরা উলু দিয়া কলরব করিয়া উঠিলে তাঁহার যেন চমক ভাঙিল। তিনি তো জানিতেন সুরেন আসিতেছে না, আসিতে পারে না—তবুও পাল্কী হইতে সুরেনের পরিবর্তে ইহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন কেন—কে জানে।

অভিযাত্রিক

আজ চোদ্দ পনেরো বছর আগের কথা। কি তারও বেশি হবে হয়তো। আমার বন্ধু রমেশবাবু আর আমি দুজনে কলকাতার মেসে একঘেয়ে পড়ে আছি বহুদিন। ভালো লাগে না এ রকম কলকাতায় পড়ে থাকা।

দেশেও তখন যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ছিল। কিন্তু একটু বাইরে না বেরুলে ধুলো আর ধোঁয়ায় প্রাণ তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

রমেশবাবুকে বললুম—চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।

রমেশবাবুর ট্যাঁকের অবস্থাও খুব ভালো নয় আমার চেয়ে। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে বললেন—বেড়াতে যাবো কিন্তু হাতে টাকাকড়ি কই—

—টাকাকড়ি লাগবে না—

—বিনা টিকিটে গিয়ে জেল খাটবো নাকি ?

—রেলে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে—

—কতদূর যাবেন পায়ে হেঁটে ?

তাঁকে বুঝিয়ে বললুম—বেশিদূর মোটেই নয়। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বার হয়ে পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়। কি করবো যখন হাতে পয়সা নেই, সময়ও নেই, এ ছাড়া তখন উপায় কি ? তিনি কি মনে করে রাজি হয়ে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বাগানবাড়িতে আমরা কিছুক্ষণ বসি। বাগানের উড়ে মালী এসে আমাদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে গেল। তাকে দিয়ে আমরা বাগানের গাছ থেকে ভালো কাশীর পেয়ারা পাড়িয়ে আনলুম। সে ডাব পেড়ে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তাতে দেরি হবে বলে আমরা রাজি হইনি।

ডানদিকের একটা পথ ধরে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে দিলুম। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে বার হয়েচি—কতদূর আর এসেচি, না হয় মাইল পাঁচ ছয় হবে—কিন্তু যেন মনে হচ্ছে কতদূর এসে গিয়েচি কলকাতা থেকে—স্বপ্নপুরীর দ্বারে এসে পৌঁছে গিয়েচি যেন। প্রত্যেক বন ঝোপ যেন অপূর্ব, প্রতিটি পাখীর ডাক অপূর্ব, ডোবার জলে এক আধটা লালফুল তাও অপূর্ব।

জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেচি অভিজ্ঞতার ফলে। যে কখনো কোথাও বার হবার সুযোগ পায়নি, সে যদি কালে ভদ্রে একটু-আধটু বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়—যতটুকুই সে যাক না কেন, ততটুকুই গিয়েই সে যা আনন্দ পাবে—একজন অর্থ ও বিত্তশালী Blasé ভ্রমণকারী হাজার মাইল ঘুরে তার চেয়ে বেশি কিছু আনন্দ পাবে না। কাজেই আমার সেদিনকার ভ্রমণটা এদিক থেকে দেখতে গেলে তুচ্ছ তো নয়ই—বরং আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সেদিনটির আনন্দ। কারণ, আসলে দেখে চোখ আর মন।

যখন ওই দুটি ইন্দ্রিয় বহুদিন বুভুক্ষু, তখন যে কোনো মুক্ত স্থান, সামান্য একটা বাঁশঝাড়, একটি হয়তো ধানের মরাইওয়ালা গৃহস্থবাড়ি, আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নদী, কোথাও একটা বনের পাখীর ডাক—মধুর, স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

পয়সা যাদের আছে, খুব ঘুরে বেড়াতে পারে তারা—ভালো কথাই, কিন্তু Blasé হবার ভয়ও যথেষ্ট। তখন ভীম নাগের সন্দেশও মুখে রোচে না।

পরবর্তী কালে জীবনে অনেক বেড়িয়েচি, এখনও বেড়াই—পাকা Blasé টাইপ অনেক দেখেচি, যথাস্থানে তাদের গল্প করবো।

সেদিনকার প্রভাতের নবীন আলোর মুখ চিনে Blasé কারা তা ভাববার অবকাশ মাত্র পাইনি—সোজা চলেছিলুম দুই বন্ধুতে পথ বেয়ে ঘর থেকে বার হবার আনন্দে বিভোর হয়ে।

হঠাৎ একটা গ্রামের পথে উপস্থিত হয়ে গিয়েচি কোন্ সময়, খেয়াল করিনি—সে পথের একদিকে খুব উঁচু লম্বা একটা পাঁচিল। একজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিগ্যেস করতে সে বললে, ওটা চাঁদমারির পাঁচিল।

—কোথায় চাঁদমারি ?

—পাশেই মশাই। সোলজারেরা বন্দুক প্র্যাকটিস—

—বুঝেচি—তা এখন করচে না তো ?

—করলেই বা কি। পাঁচিল তো দিয়ে রেখেচে।

—সামনে ওটা কি গাঁ ?

—নিমতে।

কিন্তু নিমতে গ্রামে ঢুকবার পূর্বে একটা বাঁশবাগান দেখে বড় ভালো লাগলো। খুব বড় বাঁশবন, অজস্র শুকনো বাঁশপাতা ছড়িয়ে আছে—পা দিয়ে মচ্‌কে যাবার সময় কেমন সুন্দর শব্দ হয়, শুকনো পায়ে-দলা বাঁশপাতার গন্ধ বার হয়, মাথার উপর পাখী ডাকে, সূর্য আলো-ছায়ার জাল বোনে বাঁশগাছের ডালে, পাতায়, তলাকার মাটির ওপর।

সেই বাঁশবনে এক রকমের গাছ দেখলুম। শুধুই একটা করে লম্বা ডাঁটা। তার আগার একটা আফোটা বড় কুঁড়ির মতো ব্যাপারের মধ্যে অনেকগুলো ছোট মটরের মতো দানা। গাছের গায়ে হাত দিলে হাত চুলকোয়।

কি ভালোই লেগেছিল সেই গাছগুলো সেদিন! বাঁশবনের ছায়ায় বনকচু-জাতীয় উদ্ভিদ যেন অমৃতফল প্রসব করেচে।

ছায়া ঘন হয়ে আসচে—বিকেল নেমেচে। বাঁশবন পার হয়ে একটা মাঠে আমরা বসলুম। বক্তফুল ও অন্যান্য লতাপাতার ঝোপ মাঠের ধারে সর্বত্র। ঝোপের মাথার মাথায় লতাপাতায় আলোকলতার জাল। দূরে দু'একটা পুরানো কোঠাবাড়ি দেখা গেল। একটা বাড়ির ছাদে একটি পল্লীবধূ চুল শুকোতে বসেচে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সামনের মাঠে হা-ডু-ডু খেলচে।

মাঠ থেকে উঠে নিমতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা। সেখানে মুচি

বাউরিরা বাস করে, তাদের একটা ছোট পাড়া। কিন্তু এরা সকলেই নিকটবর্তী কলে কাজ করে, শহর এসেচে গ্রামের পাশে, শহরের সভ্যতা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী গ্রামের শান্ত গৃহ-কোণে এনে দিয়েচে ব্যস্ততা কোলাহল ও শৌখিনতার মোহ।

একজন বললে—কাছেই পাষাণকালী মন্দির, দেখবেন না? নিমৃতের পাষাণকালী জাগ্রত দেবতা—ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি ভাল চোখে পড়ে না, বড় অন্ধকার ভেতরটাতে। মন্দিরের সামনে একটা পানাভরা পুকুর। পুকুরের ওপারে বাউরিদের ঘাটে বাউরিদের ঝি-বৌয়েরা জল নিতে নেমেচে।

কিছুক্ষণ বাঁধা ঘাটে বসে থাকবার পরে একটি ছোট ছেলে এসে বললে—বাবা আপনাদের ডাকচেন—আসুন আপনারা—

আমরা একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেলুম। ইটের দেওয়াল দেওয়া একখানি খড়ের ঘর। দারিদ্র্যের ছায়া সে বাড়ির সারা অঙ্গে। বাড়ির মালিক হলেন ওই পাষাণকালীর পূজারী—তিনিই আমাদের ডেকেচেন তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে।

অনেকদিনের কথা। পূজারী ঠাকুরের বয়েস বা চেহারা আমার মনে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসচেন?

—কলকাতা থেকে।

—আপনারা?

—আমি ব্রাহ্মণ, আমার এই বন্ধুটি কায়স্থ।

—পুজো দেবেন মায়ের?

আমার মনে হল এখানে দিলে ভালো হয়। লোকটা গরিব, দিলে ওর উপকার করা হয় বটে।

ইতিমধ্যে দেখি একটি বৌ, সম্ভবত পূজারী ব্রাহ্মণটির স্ত্রী, দুখানা আসন আমাদের জন্যে বিছিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাস্তবিক কষ্ট হতে লাগলো—এরা ভেবেচে কলকাতা থেকে পয়সাওয়ালা বাবুরা এসেচে—ভালো ভাবেই পুজো দেবে—দু পয়সা আসবে।

কলকাতার বাবু যে দুটি পয়সা অভাবে হেঁটে সারাপথ এসেছে—সে খবর এরা রাখে না। রমেশবাবু পকেট থেকে দুটি পয়সা বার করলেন, আমার পকেট থেকে বেরুলো একটা পয়সা। পূজারী ঠাকুর বেশি কিছু আশা করেছিলেন, তা হল না, তবুও দুটি নারকেলের নাড়ু প্রসাদ দিলেন আমাদের হাতে।

সন্ধ্যা হয়েচে, বাঁশবাগানের তলায় অন্ধকার বেশ ঘন।

আমরা বেলঘরিয়া স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়ি ধরলুম।

•

আমার বন্ধু নীরদ আমার সঙ্গেই মেসে থাকে।

দুজনেরই অবস্থা সমান। কলকাতা থেকে বেরুনো হয়নি কোথাও অনেকদিন।

নীরদ বললে—চল, কোথাও বেলে বেড়িয়ে আসি—

রেলে কোথায় যাওয়া যায় বেশ ভেবেচিন্তে দেখলুম। দূরে কোথাও যাওয়া চলবে না, তত পয়সা নেই হাতে। সুতরাং আমি পরামর্শ দিলাম, মার্টিনের ছোট রেলে চলো কোথাও যাওয়া যাক। সে বেশ নতুন জিনিস হবে এখন।

হাওড়া ময়দান স্টেশনে ছোট লাইনে চেপে আমরা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে রওনা হলুম।

দুধারে যখন পড়লো ফাঁকা মাঠ আর বাঁশবন, আমবন—আমাদের মন যেন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠলো।

বেলা তিনটের সময় আমরা নামলুম গিয়ে জাঙ্গিপাড়া। দুজনে গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম—বড় বড় বাঁশবন ঝোপঝাড় আর ছোটবড় পানাপুকুর চারিধারে।

বেলা তিনটের মধ্যে এমন ছায়া নেমে এসেচে যেন এখনি সন্ধ্যা হবে হবে। আমরা একটা ময়রার দোকানে বসলুম—ময়রার সম্বল কালো দড়ির জালের পেছনে কলঙ্ক-ধরা পেতলের থালায় সাজানো চিনির ডেলা সন্দেশ, তেলে ভাজা বাসি জিলিপি, কুচো গজা, চিঁড়ে মুড়কি আর বাতাসা।

কলকাতার বাবু দেখে ময়রা খাতির করে বসালে। নীরদ ইংরিজিতে বললে—যেরকম খাতির করলে এরপর নিতান্ত মুড়কি তো কেনা যায় না—উপায় কি?

—এসো একটু চাল দেয়া যাক—তুমিই আরম্ভ করো।

ময়রাকে ডেকে নীরদ বললে—ওহে, ভালো সন্দেশ আছে?

ময়রা করুণদৃষ্টিতে চিনির ডেলা সন্দেশের থালার দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে খুব ভালো হবে না। একটু চিনি বেশি হবে—আপনাদের তা দেওয়া যায় না।

আমি চুপি চুপি বললুম—ময়রা আমাদের কি ভেবেচে হে? দুজনের পকেট এক করলে খাবার খাওয়ার বাজেট কত?

নীরদ উত্তর দিলে—সাত পয়সা। তার মধ্যে একটা পয়সা পান খাওয়ার জন্যে রাখো—ছ'পয়সা।

আমি তখন তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—চিঁড়ে মুড়কিই দাও তবে ছ'পয়সার, ও বরং ভালো, এসব জায়গার বাজে ঘি তেল—

খেতে খেতে ময়রাকে জিজ্ঞেস করা গেল, তোমাদের এখানে এত ডোবা আর জঙ্গল, ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

ময়রা আমাদের জন্যে তামাক সাজতে সাজতে বললে—ম্যালেরিয়ার উচ্ছন্ন গেল সব বাবু, আর আপনি বলেন আছে নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখুন কি অবস্থা গাঁয়ের।

বেলা পড়ে এলে আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম। বাংলার ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত দরিদ্র গ্রামের এমন একখানি ছবি সেই আসন্ন হেমন্তসন্ধ্যায় সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা চিরদিন আমার মনে আঁকা রয়ে গেল। ছবি নিরাশার, দুঃখের, অপরিসীম নিঃসঙ্গতার ও একান্ত দারিদ্র্যের।

সেই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামখানির ওপর ধ্বংসের দেবতা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।

আমাদের মন কেমন দমে গেল—যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। একটা ডোবার ধারে জনৈকা গ্রাম্যবধূকে বাসন মাজতে দেখলুম। পথের ধারে অন্ধকার পুকুরটা—সরু হাতদুটি ঘুরিয়ে মেয়েটি বাসন মাজচে, পরনে মলিন কাপড়, অথচ গায়ের রং দেখে মনে হয় সে উচ্চবর্ণের গৃহস্থের কুলবধূ। বাংলার মেয়েদের শত কষ্টের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখে—বাংলার সমস্ত নিপীড়িতা অভাগিনী বধূদের ও যেন প্রতিনিধি।

এক জায়গায় একটা পাঠশালা বসেচে। তার একদিকে শিবমন্দির। পাঠশালার ছেলেরা ছুটির আগে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে নামতা পড়চে। একটা ছেলেও স্বাস্থ্যবান নয়, প্রত্যেকের মুখ হলদে, পেট মোটা—কারো গায়ে মলিন উড়ানি, কারো গায়ে ছেঁড়া জামা—প্রায় কারো পায়ে জুতো নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখচি দেখে গুরুমশায় নিজে এগিয়ে এসে বললেন—আপনারা কোথেকে আসচেন ?

—বেড়াতে এসেচি কলকাতা থেকে।

তিনি খুব আগ্রহের সুরে বললেন, আসুন না, বসুন, এই বেঞ্চি রয়েচে—

নীরদের বসবার তত ইচ্ছে ছিল না হয়তো—কিন্তু আমার বড় ভালো লাগলো এই গুরু-মশায়টি ও তাঁর দরিদ্র পাঠশালা।

কি জানি, হয়তো আমার বাল্যের সঙ্গে এখানে কোন একটি গ্রাম্য পাঠশালার সম্পর্ক ছিল বলেই। নীরদকে টেনে নিয়ে এসে বসালুম পাঠশালার বেঞ্চিতে।

গুরুমশায়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, শীর্ণ চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তিনি বসেচেন একখানা হাতলহীন চেয়ারে, চেয়ারখানার পিঠটা বেতের কিন্তু বসবার আসনটা কাঠের। মনে হয় সেটাও এক সময়ে বেতেরই ছিল, ছিঁড়ে যাওয়াতে সোজাসুজি কাঠের করে নেওয়া হয়েচে, হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে।

সেদিন ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম এই পাঠশালায় বসে।

আমরা বললুম—আপনার পাঠশালায় কত ছেলে ?

—আজ্ঞে ত্রিশজন, তবে সবাই আসে না—জনকুড়ি আসে।

—ছেলেদের মাইনে কত ?

—চার আনা, আর ছ'আনা—তা কি সবাই ঠিকমত দেয় ? তা হলে আর ভাবনা কি বলুন। গভর্নমেণ্টের মাসিক সাহায্য আছে পাঁচ সিকে, তাই ভরসা।

মাসে পাঁচসিকে আয়ের ভরসা কি সেটা ভালো বুঝতে না পেরে আমরা গুরুমশায়ের মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু লোকটা মনে হল তাতেই দিব্যি খুশী—যেন ও জীবনে বেশ একটু পাকাপোক্ত আয়ের দৃঢ় ভিত্তির ওপর বঁসে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

আমি বললুম—আপনার বাড়িতে ছেলেপুলে কি ?

গুরুমশায় হেসে বললেন—তা মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা। সাতটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে

বিয়ের উপযুক্ত হয়েচে, বিয়ে না দিলেই নয়। তবুও তো একটি আর বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে—সতেরো বছরের হয়েছিল—

বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ কাহিনী। আমরা সেখান থেকে উঠলুম, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে। গুরুমশায় কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না, বললেন—চলুন, আপনাদের গাঁ দেখিয়ে আনি। একটা ছোট্ট মাঠ পেরিয়ে গুরুমশায়ের ঘর। ইটের দেওয়াল, টিনের চালা। বেশ বড় উঠোন, তবে ঘরদোরের অবস্থা খুব ভালো নয়। উঠোনে পা দিয়ে গুরুমশায় বললেন—ওরে হাবু, বাইরে মাদুরটা পেতে দে।

আমরা বললুম—আবার মাদুর কেন, আমরা বসবো না আর।

—না না, তা কখনো হয়? এলেন গরিবের বাড়ি, একটু কিছু মুখে না দিলে—একটু চা।

—ওসব আবার কি, গাঁ দেখাতে নিয়ে বেরুলেন, ওসব কথা তো ছিল না?

আমাদের কোন কথাই শুনলেন না তিনি। মাদুর এল, বসালেনও আমাদের। গুরুমশায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি আবার তামাক সেজে এনে আমাদের হাতে দিতে গেলেন এবং আমরা কেউ তামাক খাইনে শুনে দুঃখিত হলেন। আমরা বললুম—আপনাদের গাঁয়ের ময়রাও ওই ভুল করেছিল, সেও তামাক সাজছিল আমাদের জন্যে।

একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে এই সময় একখানা থালাতে প্রায় আধ কাঠাখানেক মুড়ি, একটা ছোট বাটিতে পোয়াটাক আখের গুড়, অনেকখানি নারকেল কোরা নিয়ে এল। গুরুমশায় বললেন—এই এঁদের সামনে রাখ মা—এই আমার ছোট মেয়ে, এই চোদ্দ হল, এর ওপরে দুই দিদি—যা, চায়ের কতদূর হল দেখ গে—না না ও হবে না—একটু মুখে দিতেই হবে—গরিবের বাড়ি, আপনাদের উপযুক্ত নয়—পাড়াগাঁ জায়গা।

তখন নীরদ মুড়ি নারকেল কোরার বৈজ্ঞানিক ভিটামিনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, এমন চমৎকার পুষ্টিকর জলযোগ বহুদিন আমাদের অদৃষ্টে জোটেনি। মেয়েটি আবার চা নিয়ে এল।

—এইখানে রাখ মা, হয়ে গেলে অমনি দুটি পান আনবি—আর দুটি মুড়ি···?

—আজ্ঞে না, এই খেয়ে ওঠা দায়, এ কি কম দেওয়া হয়েচে?

জলযোগ সবে শেষ হল। মেয়েটি কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ। গুরুমশায় বললেন—এর নাম কমলা—এইটি মেয়েদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমতী। বাংলা যে কোনো বই পড়তে পারে, এর দিদিরা লেখাপড়া জানে না—পড়াশুনোর ঝোঁক খুব এর—কেবল বই পড়তে চাইবে, তা আমি কোথা থেকে নিত্যি নতুন বই দিই বলুন।

আমার হাতে একখানা কি মাসিকপত্র ছিল, ট্রেনে পড়বার জন্যে এনেছিলুম—মেয়েটিকে ডেকে সেখানা তার হাতে দিয়ে বললুম—এখানা প'ড়ো তুমি। নীরদ পিতাপুত্রীর অলক্ষিতে আমার গায়ে একবার চিমটি কাটলে। আমার তখন বয়স তেইশের বেশি নয়—মেয়েটি চোদ্দ বছরের।

মেয়েটি আমার হাত থেকে সেখানা নিয়ে নম্রমুখে একটু হাসলে। তারপর আমাদের থালা ও কাপগুলি নিয়ে চলে গেল।

গুরুমশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—বইখানা দিয়ে দিলেন? বেশ ভালো নতুন বইখানা—অমন বই ও পেয়ে বড় খুশী হয়েচে। এ গাঁয়ে ওসব কে দেবে বলুন।

আমরা গুরুমশায়ের বাড়ি থেকে যখন বার হয়ে পথে পড়লুম তখন বেশ অন্ধকার হয়েচে, বাড়ির সামনে বাতাবী লেবু গাছের ডালে জোনাকি জলচে। গুরুমশায় বললেন—চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই। ট্রেনের এখনো দেরি আছে—সাড়ে আটটায়—আমাদের আড্ডাটা দেখে যাবেন না একবার?

কলকাতায় ক্লাব আছে, সিনেমা আছে, ফুটবল আছে, এখানে লোকে অবসর সময় কি করে কাটায় জানবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি ছিল আমার।

একটা নীচু চালাঘরের সামনে গিয়ে গুরুমশায় বললেন—দেখবেন নাকি? আসুন না?

ঘরের মাটির মেঝেতে আগাগোড়া মাদুর পাতা। জন চারেক লোক বসে আছে মাদুরের ওপর, একজন হুঁকোতে তামাক টানচে। আর তিন জন লোক একেবারে চুপচাপ বসে। আশ্চর্য এই যে, এরা কথাবার্তা বলতে এসে এমনধারা চুপচাপ বসে আছে!

একজন আমার দিকে চেয়ে বললে—কোথেকে আসা হচ্চে?

গুরুমশায় বললেন—ওঁরা কলকাতা থেকে এসেচেন আমাদের দেশ দেখতে, তাই আমার ওখানে—

—বেশ বেশ, বসুন। তামাক চলে? চলে না। তা বেশ—

কথাবার্তার ইতি। এ মজলিসে কেউ কথা বলে না দেখচি। আরও তিন চার জন লোক ঢুকলো—একজন বললে—তেঁতুল কি দর বিক্রি করলে চক্কত্তি?

যে লোকটি হুঁকো টানছিল, সে উত্তর দিলে—বিক্রি করিনি। সাড়ে সাতটাকা পর্যন্ত উঠলো, আর উঠলো না। সামনের হাটে আবার দেখি—

বেশ লাগলো ওদের এই গ্রাম্য কথা। কথাও যদি বলে তো বেশ লাগে। এ যেন কাশ্মীর ভ্রমণের চেয়েও কৌতূহলপ্রদ; যদিও কখনো কাশ্মীর ভ্রমণ করিনি, বলতে পারিনে তার আনন্দ কি ধরনের। আর একজন বললে—আর একবার কুতুবপুরে যাই, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ জুটেচে—পাত্র কুতুবপুরের কাছারিতে নায়েবি করে—

—কুতুবপুরেব নায়েব? হাঁ হাঁ, দেখে এসো, বেশ ছেলেটি, বয়েস বেশি না—

এই সময় একজন ঘরে ঢুকে সকলের সামনে কলার পাতায় মোড়া কি একটা জিনিস রাখলে। সবাই ঝুঁকে পড়লো। এসো হরিশ, ওকি, কি হে এতে?

আগন্তুক লোকটি হাসিমুখে বললে—খাও না, ছাখো না কি। বাড়ির গাছে কথ্‌বেল পেকেছিল, তারই আচার—বলি, যাই আড্ডার জন্যে একটু নিয়ে যাই—

সকলেই ঝুঁকে পড়লো কলার পাতার ওপর। আমাদের হাতেও ওরা একটু তুলে দিলে জিনিসটা। আমাদের কোন আপত্তি টিকলো না।

বেশ আড্ডা। খুব ভালো লাগলো আমার। আমি ভাবলুম, কাছে, মাঝে এক আধ শনিবার কলকাতা থেকে এখানে এসে এই আড্ডায় যোগ দিয়ে গেলে কলকাতা বাসের একঘেয়েমিটা কেটে যায়। কলকাতার ফেরবার ট্রেনের সময় প্রায় হল। আমরা ওদের সকলের কাছে বিদায় নিলাম। গুরুমশায়টি সত্যিই বড় ভদ্র, তিনি উঠে এলেন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্টেশনের রাস্তায় তুলে দিতে।

—আসবেন আবার—কেমন তো? বড় কষ্ট হল আপনাদের—

—কি আর কষ্ট—খুব আনন্দ পেয়েচি। আমি তাহলে—

খানিকটা চলে এসেচি—দেখি গুরুমশায় পেছন থেকে আবার ডাকচেন। নীরদ বললে —ছাতি ফেলে এসো নি তো?

—না, ছাতি আনিই নি—

গুরুমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে আসচেন পথের বাঁকে।

—একটা ভুল হয়ে গিয়েচে—আপনাদের ঠিকানাটা? যদি মেয়েটার বিয়ে টিয়ে দিতে পারি মশায়দের চিঠি লিখবো, আসবেন আপনারা। বড় খুশী হবো। বড় ভালো লেগেচে আপনাদের।

ট্রেনে উঠে নীরদ বললে, বেশ বেড়ানো হল, না?

—বেশই তো।

—গুরুমশায়ের মেয়েটি বেশ—কি বল? তোমাদের পালটি ঘর তো—না?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—তাই বলছিলাম। গরিবের মেয়েটি উদ্ধার করা রূপ মহৎ কাজে—

—কি বাজে কথা বলচো সব! থাক্ ওকথা।

এরপরে আমরা আর কখনো ওই গ্রামে অবিশ্যি যাইনি—কিন্তু পাঁচ ছ বছর পরে বৌবাজারে এক দরজির দোকানে একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তার বাড়িও জাঙ্গিপাড়া। কথায় কথায় তাকে তাদের বৃদ্ধ গুরুমশায়ের কথা জিজ্ঞেস করে জানি তিনি এখনও বেঁচে আছেন, মেয়েগুলির মধ্যে বড়টিকে অতিকষ্টে পার করেচেন কিন্তু অন্য মেয়েগুলির আজও কোনো কিনারা করতে পারেননি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে জীবন সম্বন্ধে—পাড়াগাঁয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো উচিত কিছুদিন, আমার এইরকম ধারণা। দশদিন কাশ্মীরে ঘূর্ণীঝড়ের মতো ঘুরে আসার চেয়ে তা কম শিক্ষাপ্রদ নয়, আনন্দও তা থেকে কম পাওয়া যায় না। এই ধরনের আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এবার বলবো।

পিসিমার বাড়ি যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে।

১৯২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন আমি আছি স্বগ্রামে। আম বট তেঁতুলের ছায়াভরা গ্রাম্য পথ। যে গ্রামে যাবো সেখানে এর আগে একটিবার মাত্র গিয়ে-

ছিলাম বছর কয়েক আগে—কাজেই রাস্তা পাছে ভুল হয়, এজন্তে লোকজনকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে করতে চলেচি।

একজন বললে—বাগান গাঁ যাবেন, তা অত ঘুরে যাচ্ছেন কেন বাবু? কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সবাইপুরের মধ্যে দিয়ে চলে যান না কেন?

তার কথা শুনে ভুল করেছিলুম, পরে বুঝলুম। প্রথম তো যে রাস্তায় এসে পড়লুম—সে হচ্ছে একদম মেঠোপথ—তার ত্রিসীমানায় কোনো বসতি নেই। তার ওপর রাস্তার কিছু ঠিক নেই, কখনো মাঠের আলের ওপর দিয়ে সরু পথ, কখনো প'ড়ো জলা আর নলখাগড়ার বন, কখনো শোলা বন।

মাঠের গায়ে রৌদ্রও প্রচণ্ড। খেয়া পার হয়ে ক্রোশ খানেক অতি বিশ্রী পথ হেঁটে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। দূরে একটা বটগাছ দেখে তার তলায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো বলে সেদিকে খানিকদূর গিয়ে দেখি আমার আর বটগাছের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জলার ব্যবধান। সুতরাং আবার ফিরলুম।

মাঠের মধ্যে একটা রাখাল ছোকরা গরু চরাচ্চে, তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে। তাকে বললুম—সবাইপুর আর কতদূর রে?

—ওই তো বাবু দেখা যাচ্চে—

সে অনেকদূরে মাঠের প্রান্তে বনরেখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। আমি খানিকটা এগিয়ে যেতেই সে আবার ডেকে বললে—কোথায় যাবেন বাবু?

—বাগান গাঁ। চিনিস?

—না বাবু। তা আপনি সবাইপুরের খোঁজ কত্তিছেন কেন তবে?

—ওই তো যাবার পথ—

—ও পথে আপনি কি যাতি পারবেন বাবু? সবাইপুরের বাঁওড় পার হবেন কেমন করে?

সবাইপুরের বাঁওড়ের নাম শুনেচি, কিন্তু সে যে এ পথে পড়ে তা জানতুম না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল খেয়ার নামগন্ধ নেই—সাঁতার দিয়ে পার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ফিরে আসবো ভাবচি, এমন সময় রাখাল ছোকরা আবার বললে—আপনি বাবু এক কাজ করুন, সবাইপুরের বিশ্বেসরা বাঁধল দিয়েচে, সেখেন দিয়ে পার হয়ে যান—

মাছ ধরবার জন্তে বাঁশ বেঁধে যে লম্বা জাল টাঙিয়েছে—বাঁশের ওপর চড়ে অতিকষ্টে বাঁওড় পার হয়ে এপারে এলুম।

কিছুদূরে গাঁয়ের মধ্যে একটা কাদের খড়ের বাড়ি।

আমি গিয়ে বললুম—ওহে একটু জল খাওয়াতে পারো?

একটা লোক বেড়া বাঁধছিল উঠোনের কোণে, সে বললে—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দুহাত জুড়ে প্রণাম করে বললে—তবে হবে না বাবু। আমরা জেলে—

—খেলে তাই কি ? আমার ওসব—

—না বাবু, আমি হাতে করে দিতি পারবো না—তবে ওই কাঁটাল বাগানের মধ্যে টিউকল আছে—আপনি টিউকলে জল খেয়ে আসুন—একটা ঘটি নিয়ে যান, দিচ্ছি। ঝকঝকে করে মাজা একটা কাঁসার ঘটি লোকটা বাড়ির মধ্যে থেকে এনে দিলে। টিউকল অর্থাৎ টিউবওয়েলে জল খেয়ে আবার রাস্তা হাঁটি।

গ্রাম আর বড় নেই, মাঠ আর বনঝোপ। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে মেঘ করে এল—নীল কালবৈশাখীর মেঘ—হয়তো ভীষণ ঝড় উঠবে। কিন্তু তখুনি কিছু হল না, মেঘটা থমকে গেল আকাশে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় পথ বেশ চলতে লাগলুম।

একজায়গায় একটা প্রকাণ্ড জিউলি গাছ। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এই জিউলি গাছের দৃশ্য আমাকে কি মুগ্ধই করলো! দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড গাছের সারা গা বেয়ে সাদা আঠা গলা-মোমবাতির আকারে ঝুলচে—গাছের তলায় কলকাতার রাস্তার ধারের সাজানো পিচের মতো একরাশি আঠা। যেন আমি বাংলা দেশে নেই, আফ্রিকার মত বন্য মহাদেশের অরণ্যপথ ধরে কোন্ অজ্ঞাত সুদূর গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাত্রা করেচি। কি ভালোই যে লাগছিল!

আউশ ধানের ক্ষেতে সবে কচি কচি সবুজ জাওলা দেখা দিয়েচে। চারা ধানগাছের এক ধরণের সুন্দর ঘ্রাণ আসচে বাতাসে।

খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েচি। বেলা এগারোটার কম হবে না কোন রকমে, কিন্তু সেজন্যে আমার কোন কষ্ট নেই। চারিধারে সবুজ আউশের জাওলা যেন বিরাট সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেচে পৃথিবীর কালো মাটির বুকে। নীলকণ্ঠ আর কোকিলের ডাক আসচে মাঠের চারিদিক থেকে—মেঘ থম্‌কানো আকাশের নীলকৃষ্ণ শোভা আর অবাধ মুক্তির আনন্দ —সব মিলে এরা আমায় যেন মাতাল করে তুলেচে।

বৃষ্টি এল—একটা বড় বটতলায় আশ্রয় নিলুম। টপ্ টপ্ করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডাল ভেদ করে মাঝে মাঝে গায়ে পড়তে লাগলো। বৃষ্টিতে বড় মাঠগুলো ধোঁয়ার মতো দেখাচ্চে।

বটতলায় একটা ছোট রাখাল ছেলে আমার মতো আশ্রয় নিলে। তার বয়েস দশ বারো বছরের বেশি নয়। হাতে পাঁচন, মাথায় তালপাতার টোকা।

—বড্ড পানি এয়েল বাবু—

—হ্যাঁ, তাই তো—বোস্ ওখানে—বাড়ি কোথায় ?

—সুন্দরপুর বাবু। ওই যে দেখা যাচ্চে—

বৃষ্টি থামলে সুন্দরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম। গ্রামের মধ্যে দিয়েই পথ। বড় বাড়ি দুচারখানা চোখে পড়লো, খুবই বড় বাড়ি—বর্ত্তমানে লোকজন আর বিশেষ কেউ থাকে না, পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়েচে। গ্রামের চারিদিকেই বড় বাঁশবন আর আমবন, যেমন এ অঞ্চলের সব গ্রামেই দেখতে পাওয়া যাবে।

একটা খুব বড় বাড়ি দেখে তার সামনে দাঁড়ালুম। এক সময়ে খুব ভালো অবস্থার গৃহস্থের বাড়ি ছিল এটা, নইলে আর এত বড় বাড়ি তৈরি করতে পারেনি। এখন যারা থাকে, তাদের অবস্থা যে খুব ভালো নয়, এটা ওদের দোতলার বারান্দাতে পুরোনো চাঁচের বেড়া দেখে আন্দাজ করা কঠিন হয় না। করোগেট টিন জোটেনি তাই বাঁশের চাঁচ দিয়েচে।

একজনকে জিগ্যেস করলুম—এটা কাদের বাড়ি বাপু?

—বাবুদের বাড়ি। এ গাঁয়ের জমিদার ছেলেন ওঁয়ারা—

—এখন কেউ নেই?

—থাকবেন না কেন বাবু, কলকাতায় থাকেন। বাবুদের ছোট সরিকেরা এখন থাকেন এ বাড়িতে। তেনাদের অবস্থা ভালো নয়। বাবুরা সব উকিল, মোক্তাগার, অনেক পয়সা রোজগার করেন, এখানে আর আসেন না।

অথচ যখন সুন্দরপুরের বাইরে এলুম, তখন মুসলমান ও কাঙালী পাড়ার অবস্থা দেখে চোখ জুড়ুলো। ওরা প্রায়ই বাস করে ফাঁকা মাঠে, বাড়ির কাছে বনজঙ্গল কম, খড়ের বাড়ি হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধানের গোলা দুতিনটি অনেকের বাড়িতেই চোখে পড়ে, তরিতরকারির বাগান করে রেখেচে বাড়ির পাশেই, দুপাঁচটা গোরু সকলেরই আছে।

এদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়—যারা খেটে খায় এমন লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া হতে বেশি দেখিনি—ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, ব্লাডপ্রেসারের নামগন্ধ নেই সেখানে।

ওরা যখন মরে, তখন বেশির ভাগ মরে কলেরাতে। শীতের শেষে বাংলার পাড়াগাঁয়ে চাষাপাড়া মরে দুলধাবাড় হয়ে যেতে দেখেচি কলেরাতে—অথচ ভদ্রলোকের পাড়ায় এ রোগ খুব কম ঢুকতে দেখেচি।

তবে আজকাল গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসবার ফলে ম্যালেরিয়া যতটা না কমুক, কলেরার মড়ক অনেক কমেচে। নলকূপের জল বারোমাস ব্যবহার করে, অথচ বারোমাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে জীর্ণ শীর্ণ, এমন লোক বা পরিবার অনেক দেখেচি।

কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছিলুম—

পায়ে হেঁটে বাংলার অনেক গ্রামেই ঘুরেচি, সর্বত্রই দেখেচি, সমান অবস্থা—ভদ্রলোকের পতন, মুসলমান ও অনুন্নত জাতির অভ্যুদয়। ভদ্রলোকের পাড়ায় ভগ্ন অট্টালিকা, মজাপুকুর, ভগ্ন দেবালয়, ঘন বনজঙ্গল—আর চাষাপাড়ায় ক্ষেতভরা তরিতরকারি, গোয়ালভরা গোরু, ধানের মরাই, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপক্ষীর পাল। হলফ নিয়ে অবিশ্যি বলতে পারব না যে সব চাষারই এই অবস্থা—তবে অনেকেরই বটে।

ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম, তারা থাকে বিদেশে শহরে, আর ঝড়তি-পড়তি মাল যেগুলি, তারা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে গ্রামে, শিক্ষিত ও প্রবাসী জ্ঞাতিদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরে।

এরা বেলা বারোটা পর্যন্ত কোনো গাছতলায় কি কারো বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টানে আর বাজে গল্প ও পরচর্চা করে, সন্ধ্যাবেলা বসে তাস খেলে, কিংবা শখের যাত্রার দলে

আখড়া দেয়। এ অঞ্চলে থিয়েটার বড় একটা দেখিনি কোথাও—ওটা হল কলকাতা-ঘেঁষা জায়গার ব্যাপার।

এই সব ভদ্রবংশের লোকের না আছে খাটবার ক্ষমতা, না আছে উদ্যম উৎসাহ কোনো কাজে। কোনো নবাগত উৎসাহী লোক জনহিতকর কোন কাজ করতে চাইলে এরা তাদের বুঝিয়ে দেবে যে ও রকম অনেক হয়ে গেছে, ও করে কোনো লাভ নেই। কুঁড়ে লোকেরা সর্বজ্ঞ হয় সাধারণত।

শুধু সুন্দরপুর নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঠিক এই রকম দেখেচি এবং পল্লীগ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়েচি। আর পঞ্চাশ বছর এইভাবে চললে, গ্রাম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এখনই যেতে শুরু করেচে।

সুন্দরপুর ছাড়িয়ে একটা বড় বাঁওড় পড়লো সামনে, নদীর মতো চওড়া, জলও বেশ স্বচ্ছ, পার হবো কি করে বুঝতে পারচি নে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল। সে নীচু হয়ে জলের ধারের কলমির বন থেকে কচি কলমি শাক তুলে আঁটি বাঁধছিল।

জিগ্যেস করতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে বললে—সামনে দিয়ে যাও বাবা, ওইদিকি আগাড় পড়বে।

বাঁওড়ের আগাড় মানে বাঁওড়ের একদিকের প্রান্তসীমা, যেখানে গিয়ে বাঁওড় শুকিয়ে বা মজে শেষ হয়ে গেল—সুতরাং ঘুরে পার হওয়া যায় সেখানটাতে।

আধ মাইলের কিছু বেশি যেতে আগাড় দেখা গেল—সেখানে একটা বড় বট গাছের তলায় কি একটা হচ্চে দূর থেকেই দেখতে পেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি ওপারে বাঁওড়ের ধারে একটা বট গাছের তলায় কারা কলের গান বাজাচ্চে, আর তাই শুনবার লোভে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে-মেয়ে ঝি-বৌ একত্র জড় হয়েচে। বাঁওড়ের ঘাটে জল নিতে এসে বউয়েরা শুনচে, সবই চাষা লোক, এ সব গ্রামে ভদ্রলোকের বাস আদৌ নেই।

বেলা প্রায় একটা হবে। আমিও একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যে বটতলার ছায়ায় গিয়ে বসলুম। কলের-গানওয়ালারা গাছের উঁচু শেকড়ের ওপর বসেচে, আমায় ভদ্রলোক দেখে ওরা লাজুক মুখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সস্তা খেলো গ্রামোফোনের টিনের লম্বা চোঙের মুখ দিয়ে কর্কশ, উচ্চ, অস্বাভাবিক ধরনের গলার আওয়াজ বেরুচ্চে। বাজে হালকা সুরের গান বা ভাঁড়ামির রেকর্ড সবই—আমি জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের ভালো কিছু আছে?

—বাবু, আপনাদের যুগ্যি কনে পাবো, এ সব এই চাষা-ভুলোনো—

—তোমরা যাবে কোথায়?

—আমাদের বাড়ি ওই নাভারনের কাছে। কুলে রণঘাটের মেলায় কলের গান নিয়ে যাচ্চি বাবু, যদি দু চার পয়সা হয়—আপনাদের শুনবার যুগ্যি এ জিনিস নয়, সে আমরা জানি।

—তোমরা কি এমনি মেলায় মেলায় বেড়াও ?

—হ্যাঁ বাবু, ইদিকির সব মেলা, ওই ডুমোর মেলা, হল্‌দা-সিঁদরিনীর চড়কের মেলা, গাঁড়াপোতায় চড়কের মেলা, গোপালনগরের বারোয়ারির মেলা, বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের মেলা—সব জায়গায় আমরা যাই। আমাদের এতেই পয়সা রোজগার—

—কি রকম রোজগার হয় ?

—তা বাবু আপনার কাছে আর বলতি কি, আগে এক একটা মেলায় ত্রিশ চল্লিশ করে পাতাম। পাটের দর একবারে উঠিছিল আটাশ টাকা। সেবার সব মেলা বেড়িয়ে পাঁচ ছ-শো টাকা পাই। পাটের দর যেবার কম থাকে, সেবার এত দেবে কে। চাষার হাতে পয়সা থাকলি তো দেবে। চাষার হাতেই নক্ষি বাবু—আসুন বাবু একটা বিড়ি খান—শোনবেন গান ? ওরে আলি, একখানা সেই বাজনার রেকর্ট ছেলো যে, সেখানা দে—বাবু ওসব গানের আর কি শোনবেন—

এরা অশিক্ষিত মুসলমান, কিন্তু এদের যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখেচি, শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানের তার অর্ধেকও থাকলে বেকার সমস্যা এত জটিল হয়ে দেখা দিত না। এদের সঙ্গে মনে মনে হিন্দু ভদ্রসন্তানের তুলনা করবার সুযোগ এবারই আমার ঘটেছিল, সে কথা পরে বলচি। আমি সেখান থেকে উঠে আর মাইল দুই ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে এমন এক জায়গায় পড়লুম, যেখানে কাছে কোন গ্রাম নেই।

মাঠের মধ্যে একটা চমৎকার বটগাছ তার বড় ডালপালা মাটিতে লুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো দিকে আছে কিনা দেখে একটা মোটা নীচু ডালে চড়ে বসলুম।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, বেলা দুটো বাজে, এখন পিসিমার বাড়ি গিয়ে পড়লে তিনি রান্না চড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—সে কষ্ট আর কেন তাঁকে দেওয়া—তার চেয়ে আর ঘণ্টাখানেক পরে গেলে বলতে পারবো যে কোথাও থেকে খেয়ে এসেচি।

আধঘণ্টাও হয়নি, এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—এখানে কি কচ্চেন বাবু ?

পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ধামাতে খুব বড় একটা তেলের ভাঁড়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হল বৈকি, তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি ডালটা থেকে। একটু হেসে বলি—এই একটু হাওয়া খাচ্চি, বড্ড গরম—

যেন হাওয়া খেতে হলে গাছের ডালে চড়াই প্রশস্ত উপায়।

—কোথায় যাবেন আপনি ?

—বাগান গাঁ—কতদূর জানো ?

—চলুন বাবু, আমি তো সেই গাঁয়েই থাকি—কাদের বাড়ি যাবেন ?

—মুখুজ্জেদের বাড়ি।

লোকটা যে ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলো তাতে আমার মনে হল আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়।

এই গ্রামে আমি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলুম—তখনই বেশ জঙ্গল দেখে গিয়েচি, সে

জঙ্গল এখন সুন্দরবনকে ছাড়িয়ে যাবার পাল্লায় মেতেচে। এমন বন যে এ'কে অরণ্য নামে অভিহিত করা চলে অনায়াসেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কি করে মানুষ বাস করে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

দু-তিন দিন সে গ্রামে ছিলুম। তিনঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস, তিনঘরই ব্রাহ্মণ—তা বাদে কামার, কলু, কাঙালী আজ আছে হিন্দুর মধ্যে—বাকি চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর মুসলমান। সাধারণতঃ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভালো।

সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা হিন্দুভদ্রলোকের। তাদের স্বাস্থ্য নেই, অর্থ নেই। মুখুজ্জেরা এককালে এ গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন তাঁদের ভাঙা কোঠাবাড়ি আর নারকেল গাছের লম্বা সারি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই—গোলায় পিঁড়ি পড়ে আছে, গোলা বহুকাল অন্তর্হিত, সংস্কার অভাবে অট্টালিকার জীর্ণ দশা, কাটলে বট অশ্বত্থের গাছ, সাপের খোলস।

যে ক জন ছেলে-ছোকরা এই তিন বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় তারা মুখুজ্জেবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বড় তাসের আড্ডা বসায়—দাবাও চলে। এরা কোনো কাজ করে না, লেখা-পড়ার ধারও ধারে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এদের মধ্যে যা ছিল, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। দিন কতক পরে এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য প্রকৃতির বেকার হয়ে পড়বে।

পল্লীবাসী হিন্দু ভদ্রলোকের এই সমস্যা সর্বত্রই উগ্রমূর্তিতে দেখা দিয়েচে। অর্থ নেই বলেই এদের স্বাস্থ্যও নেই—মনে স্ফূর্তি নেই, পঁচিশ বছরের যুবকের মন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের মতো নিস্তেজ।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি তা এর চেয়েও সর্বনাশজনক। পল্লীগ্রামে এই ধরনের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে পানদোষ অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়েচে। প্রায় সকলেরই এ দোষটি আছে, যে মদ পয়সা অভাবে না জোটাতে পারে, সে সস্তার তাড়ি খায়। এর সঙ্গে আছে, গাঁজা ও সিদ্ধি।

আমি এই গ্রামেই একটি লোককে দেখলুম সে বর্তমানে একেবারে ঘোর অকর্মণ্য ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েচে। পূর্বে সে কোথায় চাকরি করতো, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে বসে প্রথমটাতে মহা উৎসাহে চাষ-বাস আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষিকার্যের সাফল্যের মূলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা তার ছিল না, ফলে হাতের টাকাগুলি নষ্ট হতে দেরি হয়নি। এখন বাড়ি বসে গাঁজা খায় এবং নাকি হরিনাম করে।

এ গেল পুরুষদের কথা। মেয়েদের জীবন আরও দুঃখময়। তাদের জীবনে বিশেষ কোনো আনন্দ-উৎসবের অবকাশ নেই, ধানভানা,, রান্না, সংসারের দাসীবৃত্তি এই নিয়েই তাদের জীবন। অবসর সময় কাটে পরের বাড়ির চালচলনের নিন্দাবাদে। এতটুকু বাইরের আলো যাবার ফাঁক নেই ওদের জীবনে কোনো দিক থেকেই। অথচ তারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। তারা ভাবচে, তারা বেশ আছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এই বারেই হয়েছিল।

পাশের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ, পিসিমার সম্পর্কে তাঁরাও আমার আত্মীয়। সেই বাড়িরই একটি বধূ, ত্রিশের মধ্যে বয়স, দেখতে শুনতে নিতান্ত খারাপ নয়—আমার খাবার সময় পরিবেষণ করলে। তারপর বাড়ির ছেলে-দুটি বললে—আসুন একটু দাবা খেলা যাক। আমি দাবা খেলা জানলেও ভালো জানি না, ওরা সে আপত্তি কানে তুললে না—অগত্যা ওদের মধ্যে গিয়ে বসলুম ওদের সঙ্গে।

বধূটি আমায় পান মশলা দিতে এল।

আমি বললাম,—বৌদি, বসুন না—

—না ভাই, বসলে চলে, কত কাজ—তোমরা থাকো শহরে, পাড়া-গাঁয়ের কিই বা জানো—

—আচ্ছা, বৌদি, আপনি কখনো শহর দেখেননি?

—দেখবো না কেন, কেষ্টনগর গোয়াড়ি দু দুবার গিয়েচি। সে অনেকদিন আগে। ভালো কথা, আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো?

—বলুন না—কেন করব না?

—আমার মেয়ে বীণার একটা পাত্র দেখে দাও না, কত জায়গায় তো ঘোরো—

—সে কি বৌদি, কতটুকু মেয়ে ও! এগারো-বারো বছরের বেশি নয়, এখুনি ওর বিয়ে দেবেন? ও লেখাপড়া শিখুক তার চেয়ে, কেষ্টনগরে আপনার মামার কাছে ওকে রেখে দিন। এ গাঁয়ে থাকলে তো পড়াশুনোর আশা কিছুই দেখচি নে।

—কি হবে ভালো লেখাপড়া শিখে? সেই বিয়ে করতেই হবে, শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে—হাঁড়ি ধরতে হবে। মেয়েমানুষের তাই ভালো। এই যে আমি আজ ষোল বছর এই গাঁয়ে এদের বাড়ি এসেচি, খাটচি উদয়াস্ত দেখচো তো—আসবার দশদিনের মধ্যে হেঁসেলের ভার দিলেন শাশুড়ি, তার পর তিনি মারা গেলেন, আর সেই হেঁসেল এখনও আগলে বসে আছি।

—বেশ ভালোই লাগে?

—কেন লাগবে না ভাই। তোমরা এখন পুরুষমানুষ, উড়ু উড়ু মন। এ আমার নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে, কেন খারাপ লাগবে বলো। লেখাপড়া করে কি দুটো হাত বেরুতো?

—আচ্ছা কোনো কিছু দেখতে আপনার ইচ্ছে করে না? কোনো বই পড়তে, কি কোথাও বেড়াতে?

—তা কেন করবে না—নবদ্বীপে রাসের মেলায় একবার যাবো ভেবে রেখেচি। বই কোথায় পাচ্চি এ পাড়াগাঁয়ে, আর পেলেও পড়বার সময় আমার নেই। আমরা কি মেম-সাহেব যে বসে বসে সব সময় বই পড়বো?

—বীণাকে একটুও লেখাপড়া শেখাননি? ক খ জানে তো?

—তা জানে। ডেকে জিজ্ঞেস করো না! রাঁধতে জানে, ধান ভানতে শিখেচে, চিঁড়ে কুটতে পারে, আমার সঙ্গে থেকে থেকে শিখেচে—সব দিক থেকে মেয়ে আমার—

তবে ওই দোষ, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলো—পেটজোড়া পিলে, হাবুল ডাক্তারের ওষুধ ডুশিশি খাইয়ে এখন একটু—

বাগান গাঁ থেকে চলে আসবার পথে আমার কত বার মনে হয়েচে পল্লীজীবনের এই সব গুরুতর সমস্যার কথা। এসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলতে পারে কিন্তু এ সমস্যার সমাধান করবে কে? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

এবারের ভ্রমণ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা আমার বড় মনে আছে। ফিরিবার পথে একটা সাঁকোর ওপর বসেচি, বেলা তিনটে—জ্যৈষ্ঠমাসের খর রৌদ্র মুখের ওপর এসে পড়েচে, একটি বৃদ্ধা কাঠ কুড়িয়ে ফিরচে। আমার দিকে চেয়ে সে আমার সামনে দাঁড়ালো। তারপর মায়ের মতো স্নেহসিক্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—বাবা, বড্ড রদ্দুর লাগচে মুখটাতে, উঠে এসো—

বৃদ্ধার গলার সুরে আন্তরিক স্নেহ ও দরদের পরিচয় পেয়ে আমি চমকে উঠলুম যেন। সে আবার বললে, উঠে এসো বাবা, ওখানটাতে বোসো না—পড়ন্ত রদ্দুরটা—

হয়তো আমি উঠে গিয়েছিলাম অন্যত্র, হয়তো তার সঙ্গে আমার আরও কি কথা হয়ে থাকবে—কিন্তু সে সব আর আমার মনে নেই। সে লিখতে গেলে বানানো গল্প হয়ে যাবে। এতদিন পরেও ভুলিনি কেবল বৃদ্ধার সেই মাতৃমূর্তি, তার সেই দরদভরা উদ্বিগ্ন গলার সুর।

আমি চাকুরি উপলক্ষে একবছর পূর্ববঙ্গ ও আরাকানের মাংড়ু অঞ্চলে যাই। সে সময় রেলে স্টীমারে আমার অনেক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। অন্য কোনো ভাবে এদের বলা যায় না, এক এই ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া। তাই এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবো। গোড়া থেকেই কথাটা বলি।

কলকাতায় বসে আছি, চাকরি নেই—যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।

একটি মাড়োয়ারী ফার্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের। বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি শুনে আপিসের দারোয়ান আমায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সামনেই বসে ছিলেন কেশোরাম পোদ্দার, তখন অবিশ্যি চিনতুম না।

কেশোরাম পোদ্দার হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি পাস?

বললুম, বি এ পাস করেচি ও বছর।

—কি জাতি?

—ব্রাহ্মণ

—বক্তৃতা দিতে পারেন?

কিসের বক্তৃতা? ভালো বুঝতে পারলুম না, কিন্তু চাকুরির বাজার যেমন কড়া, তাতে কোনো কিছুতেই হঠলে বা ভয় খেলে চাকুরি-প্রাপ্তির যা-ও বা সম্ভাবনা ছিল তাও তো গেল। এ অবস্থায় বক্তৃতা তো সামান্য কথা, কেশোরামজি যদি জিজ্ঞেস করতেন "আপনি নাচতে জানেন?" তা হলেও আমার মুখ দিয়ে হাঁ ছাড়া না বেরুতো না।

সুতরাং বললুম, জানি।

—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কাল বেলা দশটার সময় আসবেন।

পরদিন দশটার সময় কেশোরামবাবুর আপিসে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমার মতো আরও পঞ্চাশ ষাটটি বেকার কেশোরামবাবু খাস বাইরের হলে অপেক্ষা করচে। এরা সবাই বক্তৃতা দেবে আজ এখানে। বুঝলুম, সবারই মরিয়া অবস্থা। বক্তৃতা বক্তৃতাই সই।

আমার পূর্বে একে একে আট দশ জন লোকের ডাক পড়লো। এদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব রকমের লোকই আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম কেউ দু'মিনিট পরে ফিরে আসচে, কেউ আসচে পাঁচ মিনিট পরে—কেউ বা ঢুকবা-মাত্র বেরিয়ে আসচে।

অবশেষে আমার ডাক পড়লো। কেশোরামজি দেখলুম তাঁর খাস কামরায় নেই, ওদিকের বারান্দার দূর কোণে একখানা চেয়ারে তিনি বসে।

কাছে যেতেই বললেন, আপনি কিছু বলুন—

—ইংরিজিতে না বাংলাতে?

—বাংলায় বলুন—

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খানিকটা মুখস্থ করেছিলুম, মনেও ছিল। সামনের থামের দিকে চেয়ে মরিয়ার সুরে তাই আবৃত্তি করে গেলুম। কেশোরাম খুশী হলেন। চাকুরি আমার হয়ে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে ট্রেনে কুষ্টিয়া গিয়ে নামলুম। কলকাতার কাছে কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলার একটা মহকুমা। এখানে কি থাকবে? কিন্তু আমার কাছে একটা দেখবার জিনিস ছিল। আমার মাতামহ সেকালের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, গোরাই নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজ তিনি তৈরি করেন এ গল্প অনেকদিন থেকে মাতুলালয়ে শুনে আসচি।

ঘুমের ঘোরে ভালো দেখতে পেলুম না ব্রিজটা।

জীবনে চাকুরি উপলক্ষে সেই প্রথম বিদেশে যাওয়া। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলুম, তিন-দিন মাত্র এখানে থাকতে হবে।

পথে বেরিয়েচি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, কলেজে তার সঙ্গে পড়েছিলুম। সে আমায় দেখে তো অবাক। ধরে নিয়ে গেল তাদের বাসাতে একরকম জোর করেই—আমার কোনো আপত্তি শুনলে না।

আমি তাকে বললুম—ভাই, গোরাই নদীর ব্রিজটা দেখাবি?

—সে আর বেশি কথা কি, চলো আজই।

বনজঙ্গল আর কচুবন ঠেলে ঠেলে গোরাই নদীর ধারে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। গোরাই নদীর উভয় তীরের মাঠে, জঙ্গল বাঁশবনের শোভা দেখে সত্যি আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কত কাল কলকাতায় পড়ে আছি, বেরুতে পারিনি কোথাও।

বন্ধুকে বললুম—ভাই, বসি একটু—

—এখানে কেন? চলো এগিয়ে—

—ভাই, বেশ লাগচে। তুমিও বোসো না—

—নাঃ, এসব কবিদের নিয়ে কোথাও বেরুনোই দেখচি দায়। বোসো তবে।

উঁচু পাড়ের নীচেই বর্ষার গোরাই নদী। সাদা সাদা এক রকম ফুল ফুটে আছে জলের ধারে। গাছপালায় শ্যামলতার প্রাচুর্য দেখে মন যেন আনন্দে নেচে ওঠে। তখনকার দিনে আমার একটা বড় বাতিক ছিল, নতুন জায়গায় নতুন কি কি বনের গাছ জন্মায় তাই লক্ষ্য করা। গোরাই নদীর ধারের মাঠে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, যশোর জেলাতেও যা, এখানেও প্রায় সেই গাছ, সেই শেওড়া, ভাঁট, কালকাসুন্দে, ওল, বনচালতে। বেশির মধ্যে এখানে দু একটা বেতসঝোপ নদীর ধারে, আমাদের দেশে বেতগাছ চোখে পড়ে না।

বেলা ন টার সময় গোরাই নদীর পুল দেখে বাড়ি ফিরে এলুম। আমার বন্ধু বললে—চলো, এখানকার এক কবির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—

ভদ্রলোকের নাম তারাচরণবাবু বোধ হয়, আমার ঠিক মনে নেই। গোরাই নদীর ধারেই তাঁর বাড়ি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অমন অমায়িকস্বভাব লোক বেশি চোখে পড়ে না। আমি তখন ছোকরা আর তিনি আমার বাপের বয়সী। কিন্তু তাঁর আচারব্যবহারে কথাবার্তায় এতটুকু পরিচয় দিলেন না যে তিনি বয়সে বা জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক বড়। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মতো জ্ঞানপিপাসু লোক মফস্বলের ছোট শহরে ক্বচিৎ দু-একটি দেখা যায় কি না যায়। যতক্ষণ রইলুম, তিনি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কিন্তু তা যেন কত সঙ্কোচের সঙ্গে। যেন পাছে আমি একটুও মনে করি যে তিনি আমার সামনে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করচেন। মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল এখানেই অবস্থিত, ভেবেছিলুম দেখবো, কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠলো না।

পথে পড়ে গেলুম বিপদে, ট্রেনের যে কামরায় উঠেচি সে কামরায় আর দুজন বন্দুকধারী সেপাই টাকার থলে পাহারা দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্চে।

আমাকে ওরা প্রথমে বারণ করেছিল সে গাড়িতে উঠতে। কিন্তু গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল বলে আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের কামরায় উঠতে হল। গাড়ি তো ছাড়লো—মাঝ রাস্তায় তারা কি বলাবলি করলে। একজন চলন্ত গাড়ির ওদিকের দরজা খুললে—আর একজন আমার হাত ধরে টানতে লাগলো—ওরা গাড়ি থেকে আমায় ফেলে দেবে।

আমি প্রথমটা ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। কারণ এ ধরনের ব্যাপার ধারণা করা শক্ত—আমি নিরীহ রেলযাত্রী, আমাকে তারা কেন ফেলে দেবে, এর যুক্তিসঙ্গত কারণও তো একটা খুঁজে পাইনে।

ওদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার প্রথম সন্দেহ হল গাড়ির ওদিকের দরজা খুলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হাত ধরে টানতে। ওদের সঙ্গে জোরে পারবো না বেশ বুঝলাম—তখন আর একটা স্টেশনে না আসা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক আমার রেলগাড়ির মধ্যে থাকতে হবে।

আমি ওদের বললুম—কেন তোমরা আমাকে এ রকম করচো ?

ওরা সে কথার কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাত ধরে টানে। ওরা সে রাত্রে আমার

নিশ্চয়ই ফেলে দিতো—কিন্তু ওদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়ালো গাড়ির দরজাটা। দরজা যদি বাইরের দিকে খোলা থাকতো তবে দুজনে মিলে ঠেলতে পারতো বা ওই রকম কিছু। কিন্তু এটা ভিতর দিকে খোলা যায়, সেই ধরনের দরজা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা কেবল ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—সুতরাং একজনকে ধরে থাকার দরকার সেটাকে।

আমি ওদের সঙ্গে কোনো চেঁচামেচি কি গোলমাল করচিনে—মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা করে রেখেছি, কারণ আমার মনে হল ক্রমে যে এরা মাতাল হয়েচে—এরা কি করচে এদের জ্ঞান নেই। ঝগড়া কি চেঁচামেচি করলে মাতাল অবস্থায় রেগে চাই-কি আমায় খুন করেও বসতে পারে।

ট্রেনের বেগও কমে না, কোনো স্টেশনেও আসে না। শেকল টানবার উপায়ই নেই—কারণ যে দরজা দিয়ে তারা আমায় ফেলে দেবে, শেকল টানতে গেলে তো সেই দরজার কাছেই যেতে হয়—দরজার মাথার ওপর শেকল টানার হাতল।

আমি ওদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করচি, একজনকে মেরে ফেলে তাদের লাভ কিছু নেই—বরং তাতে পুলিসের ভীষণ হাঙ্গামে পড়ে যেতে হবে। তা ছাড়া, নরহত্যা মহাপাপ, রামচন্দ্রজি ওতে যে রকম চটেন অমন আর কিছুতেই চটেন না। স্বর্গে যাবার অতবড় বাধা আর নেই। তুলসীদাসের দোঁহা এক আধটা মনে আনবার চেষ্টা করলুম—কারণ 'রামচরিত-মানস' আমার পড়া ছিল—কিন্তু বিপদের সময় ছাই কি কিছু মনে আসে!

এমন সময়ে গাড়ির বেগ কমে এল—কোনো এক স্টেশনে আসচে এতক্ষণ পরে। মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই কি স্টেশন, লাইন ক্লিয়ার দেওয়া নেই সিগন্যালে। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমায় ছেড়ে দিলে। আমিও একটি কথাও বললুম না। মাতালকে চটিয়ে কোনো লাভ নেই।

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো একটু পরেই। আমি আমার জিনিসপত্র সামান্য যা ছিল, নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলুম। রাত তখন এগারোটা কি তার বেশি। একবার ভাবলুম গার্ডকে ঘটনাটা জানাই—কিন্তু ছোট স্টেশন, অন্ধকার রাত—গার্ডের গাড়ি অনেক পেছনে, যেতে যেতে ট্রেন ছেড়ে দেবে।

মনে মনে ভাবলুম, রাজবাড়ি স্টেশনে ট্রেন এলে রেলপুলিসকে বলবো—কিন্তু রাজবাড়ি নেমে আর গোলমালের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হল না। মাতালদের সঙ্গে একগাড়িতে ওঠা আমারই ভুল হয়েছিল।

এর পরে যেখানে গিয়ে নামলুম, সেটা হল ফরিদপুর।

নাম শুনে আসচি চিরকাল, অথচ কখনো দেখিনি ফরিদপুর—কি ভালো লেগে গেল জায়গাটা।

এখানে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার সর্বপ্রথম ঘটেছিল। কি জানি কেন তখনও মনে হয়েছিল এবং আমার আজও মনে হয় পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উদারতায়, নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তায় ও মনের ঐশ্বর্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। লেখাপড়ার দিক থেকেও পূর্ববঙ্গের মেয়েরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষিতা।

এমন সব পরিবার দেখেছি তারা আর কিছু না পড়ালেও অন্তত ম্যাট্রিক পাস করিয়ে রাখে। ম্যাট্রিক পাস লেখাপড়া শেখার বড় মাপকাঠি না হতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, এটুকুও তো তা থেকে বোঝা যায়।

ফরিদপুর ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠবার আগে আমার মনে পড়লো আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে যে অমুক বাবু থাকতো, তার বাড়ি ফরিদপুর. দেখি তো খোঁজ করে।

দেখা পেলাম এবং ভদ্রলোক (বন্ধু ঠিক নন, কারণ এর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সামান্যই) আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মা আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এমনভাবে আলাপ করলেন, যেন আমি কত কালের পরিচিত।

তিনদিন সেখানে ছিলুম, কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে স্টীমারে ফরিদপুর থেকে বেরুবো, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে বাসায় জিনিসপত্র তুলতে এলাম।

বাইরের যে ঘরটাতে থাকি, সেটাতে ঢুকে দেখি বন্ধুটির দিদি আমার বিছানাটা বেশ ভালো করে ঝেড়ে পেতে দিচ্ছেন। মশারিটা টান টান করে টাঙিয়ে দেবার চেষ্টায় আপাতত তিনি খুব ব্যস্ত।

আমি বন্ধুর দিদির সঙ্গে তত বেশি আলাপ করিনি ইতিপূর্বে। তিনি বিধবা, বয়েসও খুব বেশি নয়। তাঁকে দেখে আমি সমীহ করে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছি, উনি বললেন—চা না খেয়ে যেন আর কোথাও বেরুবেন না।

আমি বললুম—দিদি, আমি গাড়ি এনেচি ডেকে, টেপাখোলা গিয়ে স্টীমার ধরবো।

তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন—আজই ? কেন ?

হেসে বলি—পরের চাকুরি দিদি, থাকবার কি যো আছে—

দিদি স্নেহের সুরে জোর-গলায় বললেন—আজ ভরা অমাবস্যে, আজ আপনার যাওয়া হতেই পারে না—আজ থাকুন—

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চাইলুম নিজের বোনের মতো সহজ সরল দৃঢ় আত্মীয়-তার সুর।

কোথাকার কে আমি, নাম ধাম জানা নেই, দুদিনের মেসের বন্ধু ওঁর ভাইয়ের—তাও কতদিন আগের !

যেতে মন সরলো না। গাড়ি সেদিন ফিরিয়ে দিলুম।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল মাদারিপুর ডাকবাংলোতে।

ফরিদপুর থেকে গিয়েচি মাদারিপুর। হাতের পয়সা-কড়ি ফুরিয়ে যেতে কেশোরামজিকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছু টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন খরচপত্রের জন্যে। ডাক-বাংলোয় থাকি, পাঁচ ছ-দিন মাত্র আছি, কেউ আমাকে চেনে না মাদারিপুরে, পোস্টমাস্টার আমার মনিঅর্ডার বিলি করতে অস্বীকার করলে। যার নামে মনিঅর্ডার, সেই লোক যে আমি, তা সনাক্ত করবে কে ?

এদিকে পাঁচ দিনের ডাকবাংলোর ভাড়া বাকি, হাতে বিশেষ কিছুই নেই, বিষম মুশকিলে পড়তে হল।

সেই সময় ডাকবাংলোয় আমার পাশের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক কাজ উপলক্ষে এসে দিন-তিনেক ছিলেন। তাঁর নাম আমার মনে নেই—মাদারিপুর থেকে কিছু-দূরে কোনো স্থানের তিনি জমিদার। ডাকবাংলোর চৌকিদারের মুখে তিনি আমার বিপদের কথা সব শুনেছিলেন। একদিন আমায় ডাকিয়ে বললেন—আপনি কলকাতায় থাকেন?

বললাম—হাঁ, তাই বটে, কলকাতায় থাকি।

তিনি বললেন—আমি সব শুনেচি আপনার বিপদের কথা। এখানে আপনাকে টাকা ওরা দেবে না—আমি আপনাকে সনাক্ত করতে পারতাম, কিন্তু তাতে মিথ্যে কথা বলা হবে, সত্যিই আমি আপনাকে চিনি না। আমার প্রস্তাব এই যে, কলকাতার ভাড়া আপনাকে আমি দিচ্চি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না—পথিক ভদ্রলোক বিপদে পড়েচেন, অমন বিপদে সকলেই পড়তে পারে। আপনি আপনাদের আপিস থেকে গিয়ে টাকা নিয়ে আসুন, আমার নাম-ঠিকানা রাখুন, আমার টাকাটা আমায় সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।

তিনি আমার কলকাতার ভাড়া দিলেন—তাই নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরি। কেশোরামজি শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তবেই আপনি আমাদের কাজ করেচেন! মনিঅর্ডার ধরতে পারলেন না, তবে আপনি কি বারই কি টাকা নিতে কলকাতায় আসবেন নাকি?

আমি বললুম—এবার থেকে নোট রেজেস্ট্রি খামে পাঠাবেন, নইলে বিদেশে এই রকমই কাণ্ড। মুসলমান ভদ্রলোকের ঠিকানাতে কেশোরামজি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেই তাঁর টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

কতদিনের কথা, ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত মনে নেই—কিন্তু তাঁর সে উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না। বিশেষ করে আজকাল হিন্দু-মুসলমানের এই বিবাদের দিনে সে কথা বেশি করে আমার মনে পড়ে।

বরিশালে গেলুম মাদারিপুর থেকে স্টীমারেই।

আড়িয়ল খাঁ নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার কিছুদূর গিয়ে পড়ে কালাবদর নদীতে, তারপর মেঘনার মুখ দিয়ে ঘুরে যায়। পূর্ববঙ্গের নদীপথের শোভা যাঁরা দেখচেন, তাঁদের চোখের সামনে সেই সুন্দুরিবন দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলির ছবি আবার ভেসে উঠবে এ গাঁয়ের কথা উল্লেখ করলেই। আমি সেই একটিবার মাত্র ওপথে যাই, আর কখনো যাইনি—কিন্তু মনের পটে সে সৌন্দর্য আঁকা হয়ে গিয়েচে চিরকালের জন্যে। কত রোমান্সের এরা স্বপ্ন জাগায়—কত নতুন সৃষ্টির সাহায্য করে। মানুষের অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিরাজির সন্ধান যেন মেলে এদের শ্যামল পরিবেশের মধ্যে; যত অপরিচয়, ততই স্ফূর্তি, ততই আনন্দ। দিনে রাতে, সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় এদের নিয়েই স্বপ্ন-পসারীর কত কারবার!

তবে কথা এই, সন্ধ্যাবেলায় নৌকা ভিড়লো গ্রামের ঘাটে, বেসাতি করি কখন? কত ধান ক্ষেত, খেজুর গাছ, তারাভরা রাত। সন্ধ্যায় গ্রামের বধূরা কলসী কাঁকে জল নিতে এসে

গা ধুয়ে নিলে, জলের আলপনা এঁকে চলে গেল বাড়ি ফিরে। কত কথা বলে এই মাঠঘাট, কতদিনের জনপদবধূদের চরণচিহ্ন আঁকা নদীর ঘাটের পথটি, বৃদ্ধ বকুল কি বটগাছ—আর এই সুপুরির সারি, অদ্ভুত শোভা এই সুপুরি বাগানের! শুধু চোখ-চেয়ে বসে থাকা স্টীমারের ডেকে, খাওয়া নয়, ঘুমানো নয়, শুধু জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত ডেকে বসে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।

আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের স্টীমারেই আলাপ হল। তিনি আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। বরিশালে স্টীমার লাগলো যখন, তখন তাঁর অনুরোধ ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠলো—তিনি আমার জিনিসপত্র তাঁর কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলেন। কাউনিয়াতে তাঁর বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, জমিদার লোক, দেখেই বোঝা গেল।

ভদ্রলোকের দাদা বাড়ি পৌঁছলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বরিশালে দুজন লোক আমার বড় ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে ইনি একজন। শুধু ভালো লেগেছিল বললে এঁর ঠিক বর্ণনা দেওয়া হল না—ইনি একজন অদ্ভুত ধরনের লোক। পাড়াগাঁয়ের শহরে এমন একজন লোক দেখবো এ আমি আশা করিনি।

তাঁর মস্ত বাতিক শেক্সপিয়ারের ভুল বার করা। এই নাকি তাঁর জীবনের ব্রত। কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শেক্‌স্‌পিয়ারে, কি চমৎকার পড়াশোনা! কীর্তনখোলা নদীর ঝাউবনের ধারে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন এবং ওর মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কি অসঙ্গতি তাঁর চোখে লেগেচে সেগুলো ব্যাখ্যা করে গেলেন। কখনও 'রোমিও জুলিয়েট', কখনও 'হ্যামলেট', কখনও 'টেম্পেস্ট'—এটা থেকে আবৃত্তি করেন, ওটা থেকে আবৃত্তি করেন—সে এক কাণ্ড আর কি। স্মৃতিশক্তি কি অদ্ভুত!

কিন্তু খানিকটা শুনেই আমার মনে হল শেক্সপিয়ারের সৌন্দর্য উপভোগ করা এঁর উদ্দেশ্য নয়। এমন কি, ভালো সমালোচনাও নয়—শেক্‌স্‌পিয়ারের খুঁত বার করে তিনি একখানা বইও লিখেছিলেন—আমায় একখানা উপহার দিলেন বরিশাল থেকে আসবার সময়। আমার আরও ভালো লাগতো এই ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার ও ভদ্রতা। আমার তখন বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। তাঁর বয়স তখন অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সতীর্থের মতই কথাবার্তা বলতেন, দোতলার ঘরে আমায় নিয়ে একসঙ্গে খেতে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না।

তিনি খুব হাসাতে পারতেন, সামান্য একটা কি কথার সূত্র ধরে এমন হাসির মশলা তা থেকে বার করতেন, আমার তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার উপক্রম হত। আমার মনে আছে একদিন কে তাঁকে বললে আমার সামনেই—ভেরিওরাম শেক্‌স্‌পিয়ারের নোটগুলো দেখেচেন?

ভদ্রলোক দুটি আঙুল নিজের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—আরে, ভেরিওরাম লাগবো না (বরিশালের ইডিয়ম), আত্মারাম আছেন, আত্মারাম!

আমি তো হেসে গড়িয়ে পড়ি আর কি! কি বলবার ভঙ্গি, আর কি হাত নাড়ার কায়দা!

বড় শ্রদ্ধা হয়েছিল এই লোকটির ওপর আমার—এমন নির্বিরোধ, নিস্পৃহ, সদানন্দ, জ্ঞানতপস্বী চোখে বড় একটা তখনও পর্যন্ত দেখি নি—বইয়েতে টাইপ হিসেবে অবিশ্যি অনেক পড়েছিলুম। আমার বেশ মনে হয় আজও পর্যন্ত সে ধরনের মানুষ আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি।

প্রায়ই বিকেলবেলা আমায় নিয়ে তাঁর বেড়াতে যাওয়া চাই-ই। কোনোদিন কলেজের দিকে, কোনোদিন নদীর দিকে। বরিশাল শহরে আমি নতুন গিয়েচি—আমাকে জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তিনি। আর মুখে মুখে চলত শেক্‌স্‌পিয়ারের শ্রাদ্ধ। শেক্‌স্‌পিয়ার ভুলে ভরা, পাতায় পাতায় ভুল। এতদিন সমালোচকদের চোখে ধুলো দিয়ে লোকটা মহাকবি সেজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু আর চলবে না। শেক্‌স্‌পিয়ারের জারিজুরি সব বেরিয়ে গিয়েচে। মিথ্যে ক-দিন টেঁকে?

আমার খুব ভালো লাগতো এই সদানন্দ বৃদ্ধের সঙ্গ। শেক্‌স্‌পিয়ারের ভ্রম-প্রমাদ সম্বন্ধে তাঁর অত ব্যাখ্যাসহ বক্তৃতা সত্ত্বেও আমি কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতুম না তাঁর কথা। কলেজ থেকে সবে বেরিয়েচি, বড় বড় শেক্‌সপিয়ারী সমালোচকদের নাম শুনে এসেচি সন্ত, তাঁদের অনেকের কাণ্ড দেখে এসেচি কলেজের লাইব্রেরিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর ধারে উড়ানি গায়ে দেওয়া বৃদ্ধের মতবাদ আমার কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবুও অবিশ্যি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেতুম।

আর একজন লোককে এই বরিশালেই দেখেছিলাম।

তাঁর নাম কুঞ্জবাবু। গলির মোড়ে একটি বাড়ির বারান্দায় প্রতিদিন বিকালে কুঞ্জবাবু বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মমূলক গল্প শোনাতেন। আমি একদিন শুনেছিলাম তিনি প্রহ্লাদের গল্প শোনাচ্ছেন ওদের।

এমন সুন্দর বলবার ক্ষমতা যে, রাস্তার লোক কুঞ্জবাবুর গল্প শোনার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেতো। সে গল্প শোনবার মতো জিনিস। যখনই আমি কুঞ্জবাবুকে দেখতাম, সব সময়েই একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতো।

কুঞ্জবাবুর সঙ্গে একদিন আলাপ হল অমনি এক রাস্তার ধারে। আমি তাঁকে বললুম—আপনার নাম আমি শুনেচি, বড় ভালো লাগে আপনার গল্প।

কুঞ্জবাবু দেখলুম লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম—কলকাতা থেকে আপিসের কাজে এসেচি, আবার দু-চারদিন পরে চলে যাবো।

—এখানে আছেন কোথায়?

—কাউনিয়াতে আছি—এক বন্ধুর বাড়িতে—

আমায় সঙ্গে করে তিনি একটি নীচু গোহছর গোলপাতার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঠিক জানিনে সে ঘরটাতে তিনি সব সময় থাকতেন কিংবা তাঁর আলাদা কোথাও বাসা ছিল। ঘরের মধ্যে বসিয়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভক্তিমূলক কথাবার্তা কইলেন। আমায় একটা ছোট্ট রেকাবি করে বাতাসা আর শশাকাটা খেতে দিয়ে বললেন—ঠাকুরের প্রসাদ, মুখে দিন একটু। সরল-বিশ্বাসী ঈশ্বরভক্ত লোক। তাঁর পাণ্ডিত্য ততটা ছিল না, যত ছিল

ভগবানে বিশ্বাস ও ভালোবাসা; যতদিন বরিশালে ছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ পেতাম।

দুঃখের বিষয় আমি বরিশাল থেকে চলে আসবার অল্প কয়েক মাস পরেই উপরোক্ত দুই ভদ্রলোকই পরলোকগমন করেন। কলকাতায় বসে এ খবর আমি কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলুম। আমার যতদূর মনে আছে শেক্‌সপিয়ারের সমালোচক ভদ্রলোকের নাম অমূল্য-বাবু। অমন আত্মভোলা ধরনের পণ্ডিত লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

বরিশাল থেকে খালপথে উজীরপুর বলে একটা গ্রামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি গেলুম বেড়াতে। একটা খালের মধ্য দিয়ে গিয়ে আর একটা খালে পড়লুম, সেখান থেকে আর একটা খাল—সারা রাত্রিই চলচে নৌকো। রাত এগারোটার সময় ইসলামকাটি বলে একটা বাজারে নৌকো থামিয়ে মাঝিরা খেতে গেল।

বরিশালের মাঝিদের কথা ভালো বুঝিনে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলুম, কত দেরী হবে রে রেঁধে খেতে? ওরা কি একটা বললে, আমি ধরে নিলাম দুঘণ্টা দেরি হবে। অন্ধকার রাত, আমি নৌকো থেকে নেমে ইস্‌লামকাটির বাজারে বেড়াচ্চি, ক্রমে বাজারের পেছনের পথ দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেচি।

আমার মনে তখন নতুন দেশ দেখার তাজা নেশা, যা দেখচি তাই ভালো লাগে। পথের ধারের বন্য শঠি ঝোপ, তাই যেন কি অপূর্ব দৃশ্য! নতুন এক হিসেবে বটে, কারণ শঠিগাছ আমাদের দেশে না থাকায় কখনো চোখে দেখিনি এর আগে।

পুজোর ষষ্ঠী সেদিন, বন্ধুর সঙ্গে কলেজে একত্র পড়তুম, সে আমায় বলেছিল, বরিশালে যদি যাও তবে আমাদের গ্রামে অবিশ্যি করে যেও পুজোর সময়। সেই উপলক্ষে যাওয়া। কখনো এদিকে আসিনি, বরিশাল জেলার নামই শুনে এসেচি এতদিন—কতদূর এসে পড়েচি কলকাতা থেকে, কতদূর এসে পড়েচি নিজের গ্রাম থেকে—জগতে এত আনন্দ ও এত বিস্ময়ও আছে!

কে কবে ভেবেছিল একদিন আবার ইস্‌লামকাটি বলে একটা বহুদূর অজ্ঞাত স্থানে বুনো শঠিগাছের ঝোপ দেখবো রাত্রিবেলা!

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌছাই সকালবেলা।

সে গ্রাম আমার ভালো লাগেনি—ছোট কর্দমাক্ত খাল বাড়ির সামনে, তার আবার বাঁধা ঘাট, আমাদের দেশের নদীর সৌন্দর্য অন্য ধরনের এবং এর চেয়ে কত ভালো কেবল সেই কথা মনে হচ্ছিল। গ্রামের লোকের কথা ভালো বুঝতে পারিনে—কথার উচ্চারণের মধ্যে মিষ্টত্ব ও সরসতা আদৌ নেই, কতকগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-রীতি কর্ণকে পীড়া দেয়।

এ রকম আমার মনে হবার একটি কারণ, সেই আমার প্রথম পূর্ববঙ্গে যাওয়া—তখন আমি ওখানকার গ্রাম্যকথা শুনতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলাম না—এখন কানে অনেকটা সয়ে গিয়েচে। একটি ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের

অঞ্চলে শহরের টানে ক্রিয়াকর্মের খাওয়ানো ব্যাপারে যে সব শৌখিনতা ও বিলাসিতা এসে পড়েচে, বরিশাল জেলার একটি সুদূর পল্লীগ্রামে সে সব থাকবার কথা নয়. সন্দেশ রসগোল্লার পরিবর্তে তাই এখানে নারিকেলের নাড়ু আর পক্কান্ন মেঠাই দিলেও নিন্দা হয় না। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম ওখানে, প্রায় সকলেই ছাঁদা নিয়ে যায় এবং যেতে অভ্যস্ত, তাতে কোন সঙ্কোচ নেই কারো—প্রায় প্রত্যেকেই বসে যে পরিমাণ খেলে, সেই পরিমাণ মেঠাই নাড়ু গামছায় কি চাদরে বেঁধে নিয়ে এল।

আমাদের দেশে এ প্রথা আগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, এখন আর কেউ ছাঁদা বাঁধে না—শহরের টানে এ প্রথা একেবারে উঠে গিয়েচে।

পূর্ণিমার রাত্রে আবার খালপথে ওখান থেকে এলুম বরিশালে—সারারাত্রি জ্যোৎস্না-লোকিত মাঠ, তারা আর শঠির বনের শোভা দেখতে দেখতে ফিরলুম।

ঝালকাঠি বলে একটা বড় গঞ্জ আছে বরিশাল জেলার মধ্যে। এখান থেকে একটা স্টীমার ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত যায় সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে। আমার যাওয়ার কথা ছিল মরেলগঞ্জ। অনেকে বললে ওখানে সুন্দরবনের অনেকখানিই দেখা যাবে।

ঝালকাঠিতে এলুম সেই উদ্দেশ্যে। বরিশাল অঞ্চলে এমন জায়গাকে বলে 'বন্দর'। বাংলাদেশের গৃহস্থাপত্য কোনো কালেই ভালো নয় বলে আমার ধারণা, আজকাল কলকাতা বা ছোট-বড় শহরে আধুনিক গৃহ-স্থাপত্যের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাদের ছাঁচ এ-দেশী নয় সকলেই জানেন। ঝালকাঠিতে এসে এখানকার বাড়িঘর দেখে মন এমন দমে গেল—এতটুকু সৌন্দর্যবোধ থাকলে কেউ এ ধরনের বাড়ি করে না।

এত বড় গঞ্জ, কিন্তু এখানে প্রায় সব বাড়িই করোগেট টিনের—কি ব্যবসা বাণিজ্যের গুদামঘর, কি গৃহস্থবাড়ি। ফলে দোকান, গুদাম ও ভদ্রাসন বাড়ির একই মূর্তি। তারপর অবিশ্যি লক্ষ্য করেচি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এই টিনের ছাউনির চলন হয়েছে আজকাল। খড়ের ঘরের যে শান্ত শ্রী আছে, টিনের ঘরের তা নেই, বরং টিনের চেয়ে লাল টালির ঘরও অনেক ভালো দেখতে। ঝালকাঠিতে বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িও দেখেছি টিনের ছাউনি।

বাড়ির সামনে এক-আধটু ফুলের বাগান কি সুদৃশ্য দু-একটা গাছপালাও কেউ শখ করে করেনি। টিনের ঘরের পাশে তা থাকলেও অন্তত বাড়ির কর্কশ রুক্ষতা একটু দূর হয়—কিন্তু ফুলের বালাই নেই কোন বাড়িতে।

এক জায়গায় কেবল আছে দেখেছিলুম, তাও কলকাতার টানে।

নদীর ধারে ভূকৈলাসের জমিদারদের প্রকাণ্ড কাছারিবাড়ি আছে—খুব বড় বড় থামওয়ালা সেনেট হাউসের মত চওড়া ধাপওয়ালা বাড়ি—এই টিনের ঘরের রাজ্যে এ বাড়িখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঝালকাঠি আমার ভাল লেগেছিল অন্য দিক থেকে। আমাদের গ্রামে নেপাল মাঝি বলে একজন লোক ছিল আমার ছেলেবেলায়, সে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা করে হাতে বিলক্ষণ দুপয়সা করেছিল। তার মুখে ঝালকাঠির কথা খুব শুনতাম।

নেপাল মাঝি একবার ঝালকাঠি বন্দরে নৌকো লাগিয়েছিল, তখন সে অপরের নৌকোতে মাঝিগিরি করতো—সে সময় বন্দরে আগুন লাগে।

একজন লোক একটা কাঠের হাতবাক্স নিয়ে জলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বলে—মাঝি, বাক্সটা ধরে রাখো তো—আমি আসচি—

এরপরে লোকটা আর নাকি ঠিক করতে পারেনি কার হাতে বাক্সটা দিয়েছিল, নেপালও স্বীকার করেনি। সেই হাতবাক্সটি সে আত্মসাৎ করে। অনেক টাকা পেয়েছিল বাক্সের ভেতর, সেই টাকায় ব্যবসা করে নেপাল অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল।

এ গল্প অবিশ্যি নেপাল মাঝির মুখে শুনিনি, নেপালের শত্রুরা বলতো এ কথা। তিনখানা বড় মহাজনী নৌকোতে সুপুরি আর বালাম চাল বোঝাই দিয়ে সে ঝালকাঠি থেকে, আমাদের দেশে যেতো প্রতি বছর।

আমি ঝালকাঠি বাজারের একটা বড় আড়তে নেপালের নাম করতেই আড়তের মালিক তাকে চিনতে পারলে। বললে—সে অনেকদিন আসে না, বেঁচে আছে কি জানেন?

এতদূরে এসে যদি দেশের লোকের কথা শোনা যায় অপরের মুখে, আমার বাল্যকালের নেপাল মাঝির সন্ধান রাখে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সত্যিই বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনদিন পরে স্টীমারে বরিশাল থেকে চাটগাঁ রওনা হই।

ছোট স্টীমার, লোকজনের ভিড়ও বেশি নেই—ডেকচেয়ার পেতে সামনের ডেকে বসে দূরের তীররেখা ও ঘোলা জল দেখে সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যায়! ভোলা বলে বরিশালের একটা বন্দরে স্টীমার লাগলো পরের দিন সকালে।

এই ভোলার নামও করতো আমাদের গ্রামের নেপাল মাঝি। কি দুঃসাহসিক লোকই ছিলো, ধনপতি সদাগর কি ভাস্কো ডা গামা জাতীয় লোক ছিল আমাদের নেপাল, ছেলেবেলায় কি তাকে ভালো করে চিনতাম? কোথায় আমাদের সেই ছোট্ট নদী, নদীতীরে বাঁশবনে ছায়া, কুঁচলতার ঝোপটি—আর কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের বন্দর ভোলা!

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সন্দীপের উপকূলে স্টীমার গিয়ে নোঙর করলে আর স্টীমার থেকে সব লোক নেমে চলে গেল—এমন কি খালাসীগুলো পর্যন্ত নেমে গেল। সন্দীপের উপকূলে এই সন্ধ্যাটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমার একদিকে বঙ্গোপসাগর, তার কূলকিনারা নেই—আসলে যদিও এটা সন্দীপের খাড়ি, ঠিক বহিঃসমুদ্র নয়, কিন্তু দৃষ্টি যখন কোথাও বাধে না, তখন আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সমুদ্রের যে রূপ ফুটে উঠেচে তার সঙ্গে কি বঙ্গোপসাগর, কি ভারত মহাসমুদ্র—কারো কোনো তফাতই নেই।

অদূরের তীরভূমি অপূর্ব সুন্দর, তাল আর নারকেল সুপারির বনে ঘন সবুজ। সন্ধ্যায় যখন সবাই নেমে গেল, আমি স্টীমারে একেবারে একা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম শেষ

বৈকালের ক্রমবিলীয়মান রৌদ্র পীত থেকে স্বর্ণাভ, ক্রমে রাঙা হয়ে কি ভাবে তালীবন-রেখার শীর্ষদেশে উঠে গেল, আকাশ কি ভাবে পাটকিলে, তারপর ধূসর, ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল।

অনেক দিন আগের সেই সন্ধ্যায় যে সব কথা আমার মনে এসেছিল—তা আমার আজও মন থেকে মুছে যায়নি, সন্দীপের সমুদ্র-উপকূলের বহুবর্ষ আগেকার সেই সন্ধ্যাটির ছবি মনে এলে, কথাগুলোও কেমন করে মনে পড়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে স্টীমার ছাড়লো।

চট্টগ্রামের যাত্রীদল শেষরাত্রে ডিঙি করে এসে স্টীমারে উঠলো—তাদের হৈ-চৈ আর গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। ডেকে ভিড় জমে গেল খুব, তার ওপর বস্তা বস্তা শুঁটকি মাছ এসে জুটলো, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো মাছের দুর্গন্ধে।

সকালে যখন সূর্যোদয় হল, তার আগে থেকেই দক্ষিণদিকে কূলরেখাবিহীন জলরাশি, বামে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের ক্ষীণ তীররেখা আর কিছুদূর গিয়েই নীল শৈলমালা। সন্দীপ চ্যানেল ছেড়ে স্টীমার অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে বা'র সমুদ্রে পড়ল—তার পরেই কর্ণফুলির মোহনায় ঢুকে ডবল মুরিংস্‌এ নোঙর ফেললে।

চট্টগ্রাম সুন্দর শহর, তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার পল্লীও আছে শহরের মধ্যেই। একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, কলকাতার বাইরে সব শহরের এক মূর্তি। সেই সংকীর্ণ ধূলোয় ভর্তি রাস্তা, গলিঘুঁজি, খোলা ড্রেন, টিনের ঘরবাড়ি!

কেন জানিনে, এ সব ছোট শহরে দিনকয়েক থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—দীর্ঘকাল এখানে যাপন করা এক রকম অসম্ভব। তবুও চাটগাঁ বেশ সুদৃশ্য শহর একথা স্বীকার করতেই হবে। শহরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় পাহাড়; এর যে কোনো পাহাড়, বিশেষ করে কাছারির পাহাড়ের ওপর উঠলে একদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে বহুদূরে আরাকানের পর্বতমালার নীল সীমারেখা চোখে পড়ে।

এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে পড়েছিল।

আমি স্টীমার থেকে নেমেই এদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। বাড়ির কর্তার নামে আমাদের সমিতির একখানা চিঠি ছিল।

কখনো এদের চিনিনে, চাটগাঁয়ে এই আমার প্রথম আগমন।

বেশ বড় বাড়ি, ঢুকে বাইরের ঘরে দুজন চাকরের সঙ্গে দেখা—জিজ্ঞেস করে জানলুম বাড়ির কর্তা কাছারিতে বেরিয়েছেন, আসতে প্রায় চারটে বাজবে।

সুতরাং বসেই আছি, কাউকেই জানিনে এখানে, কর্তার সঙ্গে দেখা করবার পরে যাবো, না হয় একটু বসি।

বাড়ির মধ্যে থেকে এসে চাকরে জিজ্ঞেস করলে—মা জিজ্ঞেস করচেন, আপনি কি স্নান করবেন?

বললুম—স্নানাহার করবার কোনো দরকার নেই এখন। আমার আসল দরকার শেষ হলে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—না, তা হবে না বাবু, আপনাকে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, মা বলে দিলেন।

বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অমান্য করতে মন উঠলো না। স্নানাহার সেখানেই করলুম এবং কর্তা কাছারি করে বাড়ি ফিরে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার পরে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, এখানেই থাকুন না কেন?

আমি আপত্তি করলুম—ডাকবাংলোয় যাবো ভেবেচি, কেন মিছে আপনাদের কষ্ট দেওয়া?

আমার আপত্তি গ্রাহ্য হল না। বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় আমার থাকবার জায়গা হল এবং এর পরে দিন দশেক কাজের খাতিরে চাটগাঁয়ে ছিলুম—অন্য কোথাও আমায় ওঁরা যেতে দিলেন না।

বড় উদার পরিবার, দু পাঁচ দিনের মধ্যে আমি যেন তাঁদের বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেলুম। বাড়ির মধ্যে গিয়ে রান্না-ঘরের মধ্যে খেতে বসি, মেয়েরা পরিবেষণ করে, কাউকে দিদি কাউকে মাসিমা বলে ডাকি। তাঁরাও আমায় স্নেহের চোখে দেখেন। বারো দিন পরে যখন আমি চাটগাঁ ছেড়ে কক্সবাজার গেলুম, তখন সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন, বার বার বলে দিলেন, আমি যেন ফিরবার সময় আবার এখানে আসি।

কক্সবাজারে যাবার পথে মহেশখালি চ্যানেল নামে ক্ষুদ্র সমুদ্রের খাড়ি পড়ে।

দূরে চর কুতুবদিয়াতে লাইট হাউস ও আদিনাথ পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে আমি এদের কথা কতবার ভেবেচি। এতদূর বিদেশে যে আত্মীয়-বন্ধু লাভ করবো, তাদের ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হবে, তারাও চোখের জল ফেলবে আমার আসবার সময়ে—এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে তখন নতুন, তাই বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্তী জীবনে কতবার এ অভিজ্ঞতা আমার যে হয়েচে। পর কতবার আপন হয়েচে, এমন কি আমার বিশ্বাস পর যত সহজে আপন হয়, আপনার লোকে তত সহজেও হয় না এবং তত আপনও হয় না।

কক্সবাজারে একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

জীবনের সে এক বিপদ্জনক অভিজ্ঞতা—প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারতো সেদিন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে, সাগরবেলায় জোয়ার নেমে গেলে কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি কত পড়ে থাকে; বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ এসে কূলে তাল দেয়। জ্যোৎস্না-পক্ষের রাত্রি, কত রাত পর্যন্ত সেখানে একা চুপ করে বসে থাকি, যশোর জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে কতদূর যেন চলে এসেচি, সেখানকার ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কথা মনে পড়ে, ইছামতীর দুপাড়ের বাঁশবনের কথা ভুলতে পারিনে, এত দূরে বসে দেশের স্বপ্ন দেখতে কি ভালোই যে লাগে।

কাউখালি বলে ছোট্ট একটি নদী বা খাল কক্সবাজারের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়েচে। একদিন একখানা সাম্পান ভাড়া করে কাউখালি থেকে বার হয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলুম।

মাঝি মাত্র একজন, চাটগাঁয়ের বুলিতে বললে, কতদূর যাবেন বাবু?

—অনেকদূর চলো সমুদ্রের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ফিরবো—

—আদিনাথ যাবেন?

একটা ছোট পাহাড় সমুদ্রগর্ভ থেকে খাড়া উঠেছে—তার মাথায় আদিনাথ শিবের মন্দির। এ অঞ্চলের এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, অনেক দূর থেকে লোকে আসে আদিনাথ দর্শন করতে, শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। কাউখালি নদী যেখানে এসে সমুদ্রে পড়লো, তার ডাইনে প্রায় মাইল দুই দূরে আদিনাথ পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেচে, আর ঠিক সামনে অদূরেই একটা বড় চড়ার মতো কি দেখা যাচ্ছে। মাঝিকে বললুম—ওটা কি চড়া পড়েচে?

মাঝি বললে—না বাবু, ওটা সোনাদিয়া দ্বীপ। ভাঁটার পরে ওখানে অনেক কড়ি, শাঁক, ঝিনুক পড়ে থাকে।

শুনে আমার লোভ হল। মাঝিকে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে বললুম।

মাঝি একবার কি একটা আপত্তি করলে, আমি ভালো বুঝলুম না ওর কথা।

সাম্পান সাগর বেয়ে চলেচে, বিকেল পাঁচটা, সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুবুডুবু, হু-হু খোলা হাওয়া কাউখালির মোহানা দিয়ে ভেসে আসচে, আদিনাথ পাহাড়ের মাথায় অস্ত-সূর্যের রাঙা রোদ। মনে হয় যেন কত কাল ধরে সমুদ্রের বুকে ভাসচি, দূরের সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাগরবেলা, যা ছবিতে ছাড়া কখনো দেখিনি—তাও যেন অনেক নিকটে এসে পৌঁছেচে—তাদের শ্যাম নারিকেলপুঞ্জের শাখাপ্রশাখার সঙ্গীত যেন শুনতে পাই।

সোনাদিয়া দ্বীপে যখন সাম্পান ভিড়লো তখন জ্যোৎস্না উঠেচে।

ছোট্ট চড়ার মতো ব্যাপারটা, গঙ্গার বুকে বালি হুগলি শহরের সামনে অমন ধরনের চড়া কত দেখেচি ছেলেবেলায়। একটা গাছপালা নেই, বাড়িঘর তো নেই-ই, শুধু একটা বালির চড়া—জল থেকে তার উচ্চতা কোথাও হাত খানেকের বেশি নয়।

কিন্তু সে কি সুন্দর জায়গা! অতটুকু বালির চড়া বেষ্টন করে চারি ধারে অকূল জলরাশি, জ্যোৎস্নালোকে দূরের তটরেখা মিলিয়ে গিয়েচে। আদিনাথ পাহাড়ও আর দেখা যায় না, সুতরাং আমার অনুভূতির কাছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে যে-কোনো জনহীন দ্বীপই বা কি, আর কক্সবাজারের সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র দু মাইল দূরের সোনাদিয়া দ্বীপই বা কি, আমাদের গ্রামের মাঠে বসে বৈকালে আকাশের দিকে চেয়ে মেঘস্তূপের মায়ায় রচিত তুষারমৌলী হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ কি ত্রিশূল কতদিন প্রত্যক্ষ করিনি কি!

মনে কল্পনায় এই জগৎকে আমরা অহরহ সৃষ্টি করে চলেচি—আমরা নিজেরাই তার স্রষ্টা। প্রত্যেক মানুষটি স্রষ্টা; যার যেমন কল্পনা, যার যেমন ধারণাশক্তি, যেমন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—সে তেমনি সৃষ্টি করে।

বই-লেখা, উপন্যাস-লেখাই শুধু সৃষ্টি নয়। প্রতিদিনের ধ্যান ও স্বপ্ন আমাদের চারপাশে মায়াজালের যে বুনুনি রচনা করে তাও সৃষ্টি। তারই বাহ্যপ্রকাশ হয় সঙ্গীতে, কথাশিল্পে, ছবিতে, নাটকে, কথাবার্তার মধ্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে। কোন্ মানুষ স্রষ্টা নয়?

ঝিনুক ও কড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে সারা চড়ার ওপরে। আর আছে এক ধরনের লাল কাঁকড়া, বালির মধ্যে এরা ছোট ছোট গর্ত করে গর্তের মুখে চুপ করে বসে আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক কেটে থাকবে—এমন সময় সাম্‌পানের মাঝি বললে—বাবু, শীগ্‌গির নৌকোয় উঠে বসুন—জোয়ার আসচে।

ওর গলায় ভয়ের সুর। বিস্মিত হয়ে বললুম—কেন, কি হয়েচে?

মাঝি বললে—সোনাদিয়া দ্বীপ জোয়ারের সময় ডুবে যায়—সাঁতার জানলেও অনেকে ডুবে মরেচে। একটু তাড়াতাড়ি করুন কর্তা—

বলে কি! শেষকালে বেঘোরে ডুবে মরতে রাজি নই। একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই সাম্‌পানে উঠলুম। বড় বড় ঢেউ এসে সোনাদিয়ার চড়ায় আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো—তার আগেই আমরা চড়া থেকে দূরে চলে এসেচি।

কিন্তু যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা ঘটলো এর ঠিক পরেই—জোয়ারে ডুবে মরবার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা কম বিপদ্‌জনক নয়।

খানিক দূর এসে সমুদ্রের মধ্যে কুয়াশা নামলো। কোনোদিক দেখা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াশার বর্ণনা মনে পড়লো। কুয়াশা এমন ঘন যে অত বড় আদিনাথ পাহাড়টা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে পড়েচে।

মাঝে মাঝে সাম্‌পানের দাঁড় ফেলার সময় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্চে তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকি পোকার মতো কি জ্বলে জ্বলে উঠচে—বসে বসে লক্ষ্য করচি অনেকক্ষণ থেকে। সমুদ্রের আলোকোৎক্ষেপী উর্মিমালার কথা বইতেই পড়েছিলুম এর আগে, এইবার চোখে দেখলুম।

ঘণ্টাখানেক সাম্‌পান চলেচে—কূলের দেখা নেই।

মাঝি কখনো বলে, ওই সামনে ডাঙা দেখা যাচ্চে—কখনো বলে, আদিনাথ পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়চি। আমার ভয় হল সে দিক ভুলে আদিনাথ পাহাড়ের দিকেই যাচ্চে—আদিনাথের নীচে সমুদ্রের মধ্যে দু-চারটি মগ্নশৈল থাকা অসম্ভব নয়, তাতে ধাক্কা মারলে সাম্‌পান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বেশি দেরি লাগবে না।

যদি বা'র-সমুদ্রে পড়ি, দিক ভুল হয়ে, তবে বিপদ আরও বেশি। একবার কাগজে পড়েছিলুম, সুন্দরবনের কি একটা জায়গা থেকে কয়েকটি লোক একখানা ডিঙি নৌকো করে কোন্ দ্বীপে কুমড়ো আনতে যায়। ফিরবার পথে তারা দিক ভুল করে বা'র-সমুদ্রে গিয়ে পড়ে—সমুদ্রে কি করে নৌকো চালাতে হয় তাদেরও তা জানা ছিল না—এগারো দিন পরে ব্রহ্মদেশের উপকূলে যখন তাদের ডিঙি গিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিড়লো, তখন মাত্র একজন জীবিত আছে। এ সময় হঠাৎ সে কথাটাও মনে পড়লো।

মাঝিও যেন একটু বিপন্ন হয়ে পড়েচে। সে বললে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? সাম্‌পানে মশাল আছে, একটা ধরিয়ে নিই।

তাকে বললুম, মশাল কি হবে ?

—মশাল জ্বালা দেখে অন্য নৌকো কি স্টীমার আমাদের পাবে। একটা বিপদ আছে বাবু, এই পথ দিয়ে বড় জাহাজ রেঙ্গুন কি মংডু থেকে চাটগাঁ যায়—কুয়াশার মধ্যে যদি ধাক্কা লাগে তবে তো সাম্‌পান ডুবে যাবে—আর একটা বিপদ বাবু, মাঝে মাঝে বয়া আছে, সমুদ্রের মধ্যে, তাদের মাথায় আলো জ্বলে—যদি কুয়াশার মধ্যে আলো টের না পাই তবে বয়ার গায়েও ধাক্কা লাগতে পারে—

—ঠিক সেই কারণে তো আমাদের মশালও না দেখা যেতে পারে অন্য নৌকো বা স্টীমার থেকে ?

মাঝি সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। আমি দেশলাই বার করে মাঝির হাতে দিতে যাবো, এমন সময় কি একটা শব্দে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম—কিসের শব্দ মাঝি ?

মাঝির গলার সুর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেচে—সে বলে উঠলো, বাবু, সাম্‌পানের কাঠ আঁকড়ে ধরুন জোর করে—সামনে পাহাড়—

একমুহূর্তে বুঝে ফেললুম আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব। সামনে আদিনাথ পাহাড়, দিক ভুল করে মাঝি সাম্‌পান নিয়ে এসেচে উত্তর-পূর্ব দিকে—কিছুই চোখে দেখা যায় না, শুধু সাগরের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ানোর শব্দে বোঝা যায় যে পাহাড় নিকটবর্তী। কিন্তু আরও দশ মিনিট কেটে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের শব্দ তখনও সামনের দিকে, কিন্তু সাম্‌পান যেন সে শব্দকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে।

ব্যাপার কি। মাঝিও কিছু বলতে পারে না!

হঠাৎ আমার মনে হল ঠিক সামনেই কাউখালি নদী সমুদ্রে পড়চে ; কুয়াশা তখনও খুব ঘন, এ সব কুয়াশা ক্রমে ক্রমে পাতলা হয় না, অতর্কিতে এক মুহূর্তে চলে যাবে। আমি মাঝিকে বললুম—মাঝি, নদীর মোহানা সামনে—

মাঝি বললে—বাবু, ও কাউখালি নয়, আদিনাথের ঝরনা, কুয়াশার মধ্যে ওই রকম দেখাচ্ছে, আমরা উত্তর দিকে যাচ্চি ভেসে। এ জায়গাটা আরও ভয়ানক—

মাঝি আমাকে যাই বলুক, ভয়ের চেয়ে একধরনের অদ্ভুত আনন্দই বেশি করে দেখা দিয়েচে মনে। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বো এ তো বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল ; নাই বা হল খুব বেশি দূর—মাত্র চট্টগ্রামের উপকূল—সমুদ্র, সব জায়গাতেই সমুদ্র, মাথার ওপরকার আকাশ সব জায়গাতেই নীল, কল্পনা সর্বত্রই মনে আনে নেশার ঘোর। কিন্তু আমার অদৃষ্টে বেশি ঘটলো না। আদিনাথের নীচে কয়েকখানা জেলেডিঙি বাঁধা, আমাদের সাম্‌পানের আলো দেখতে পেয়েছিল। তাদের লোক মাঝিকে ডাক দিয়ে কি বললে, সেখানে অতি সহজেই আমাদের নৌকো ভিড়লো।

আরও আধঘণ্টা পরে কুয়াশা কেটে গেল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষে সাম্‌পান ছেড়ে আমরা এসে পৌঁছলুম কাউখালি মোহানায়। দূরের সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ, তটভূমির

ঝাউয়ের সারির মধ্যে নৈশ বাতাসের মর্মরধ্বনি ; বড় বড় ঢেউ যখন এসে ডাঙায় আছড়ে পড়চে, তখন তাদের মাথায় যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলচে।

কক্সবাজার থেকে গেলুম মংডু।

'নীলা' বলে একখানা ছোট স্টীমার চাটগাঁ থেকে কক্সবাজারে আসে, সেখানা প্রতি শুক্রবারে তখন মংডু পর্যন্ত যেতো। শুঁটকি মাছ স্টীমারের খোলে বোঝাই না থাকলে এ সব ছোট জাহাজের ডেকে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। উপকূল আঁকড়ে জাহাজ চলে, সুতরাং একদিকে সব সময়েই সবুজ বনশ্রেণী, মেঘমালা, জেলেডিঙির সারি, কাঠের বাড়ি, বৌদ্ধ মন্দির, মাঝে মাঝে ছোট নদীর মুখ, কখনো রৌদ্র কখনো মেঘের ছায়া—যেন মনে হয় সব মিলিয়ে সুন্দর একখানি ছবি।

কিছুদূর গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিসের কারখানা আছে, চর থেকে কলের চিমনির ধোঁয়া উড়চে দেখা যায়। স্টীমারের লোকে বললে—করাতের কল, বনের কাঠ চিরে ওখান থেকে জাহাজে বিদেশে রওনা করা হয়।

বিকেলে মংডুতে স্টীমার ভিড়লো। মংডু একেবারে ব্রহ্মদেশ। সেখানে পা দিয়েই মনে হল বাংলা দেশ ছাড়িয়ে এসেচি। বর্মী মেয়েরা মোটা মোটা এক হাত লম্বা চুরুট মুখে দিয়ে জল আনতে যাচ্চে, টকটকে লাল রেশমী লুঙি পরা যুবকেরা সাইকেলে চড়ে সতেজে চলাফেরা করচে, পথের ধারে এক এক জায়গায় ছোট ছোট চালাঘর, সেখানে পথিকদের জলপানের জন্তে এক কলসী করে জল রাখা আছে।

এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয় পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় খুব অদ্ভুত ভাবে। একদিন মংডুর পুরনো পোস্টাপিসের পেছনের রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাচ্চি, একটি বৃদ্ধ চাটগেঁয়ে মুসলমান মাল্লা আমায় বললে, বাবু, আমায় মেহেরবানি করে একটা কাজ করে দেবেন, একখানা দরখাস্ত লিখে দেবেন ইংরিজিতে ?

তারপর আমাকে সে একটা টিনের বাংলো ঘরে নিয়ে গেল। বাংলোর ভেতরটাতে কারা আছে তখন জানতুম না, বাইরের একসারি ছোট ঘরে অনেকগুলো জাহাজী মাল্লা বাসা করে আছে বলে মনে হল। আমার হাতে তখন পয়সার সচ্ছলতা নেই, দরখাস্ত লিখতে ওরা আট-আনা পারিশ্রমিক দিলে, আমিও তা নিয়েছিলাম।

দরখাস্ত লিখে চলে আসচি, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ মাল্লাটি বললে, বাবু, ওই বর্মী সাহেব আপনাকে ডাকচে, ভেতরের ঘরে থাকে ওরা।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। অপরিচিত স্থানে যেতে মন সরল না, কি জানি কার মনে কি আছে। কিছুক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধ বর্মী ভদ্রলোক আমায় হাসিমুখে বাঁকা চাটগাঁয়ের বুলিতে বললেন—আসুন বাবু, আপনাকে একটু দরকার আছে।

যে ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন, সে ঘরে তিন চারটি সুবেশা তরুণী বসে ছিলেন, সকলেই দেখতে বেশ সুশ্রী। প্রত্যেকের সামনে একটা ছোট বাটি, তাতে সাদা মতো

কি গুঁড়ো, একটু ঢুকেই চোখে পড়লো ; ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলে আমি আর ওঁদের দিকে চাইনি। ভদ্রলোক আমায় বাংলায় বললেন—একটু চা খাবেন ? আমার বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটেনি, আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মেয়েরা ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, আপনাকে ডেকেচি কেন বলি। আমি কাঠের ব্যবসা করি, বাজারে আমার কাঠের আড়ৎ আছে। একজন বাঙালী বাবু আমার আড়তে ইংরিজি চিঠিপত্র লিখতো আর আমার মেয়ে তিনটিকে ইংরিজি পড়াতো, সে চলে গিয়েচে আজ দুমাস। আর আসে না, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না, অথচ আমার জরুরী চিঠি দু-তিনখানার উত্তর না দিলে নয়। আপনি মোবারক খালাসির দরখাস্ত লিখছিলেন শুনে আপনাকে ডাকলুম। যদি দয়া করে লিখে দেন, আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক যা হয় আমি দেবো।

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলুম। আমি যে-কদিন এখানে থাকবো, তিনি আমায় দিয়ে তাঁর চিঠি লিখিয়ে নিতে পারেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই।

একটু পরে ওঁর মেয়েরা চা নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সকলেই বাংলা বলতে পারেন বটে কিন্তু তাঁদের বাংলা বোঝা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছিল প্রতিবার। কথাটা তাঁদের বিনীত ভাবে বুঝিয়ে বললুম। আমার বাড়ি কলকাতায়, চট্টগ্রামের ভাষা ভাল বুঝি না, তার ওপরে বিকৃত চট্টগ্রামের বুলি তো আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইংরিজিতে যদি বলেন তবে আমার সুবিধে হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথাগুলি বললুম বটে, কিন্তু মেয়েদের উদ্দেশ করে। মেয়েরা আমার বাংলা বোঝেন না, তাঁদের বাবা বর্মিজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন আমার বক্তব্য।

আমি বাটিতে সাদা গুঁড়ো দেখিয়ে বললুম—ওটা কি কোনো খাবার জিনিস ?

মেয়েরা ভদ্রতার খাতিরে অতি কষ্টে হাসি চেপে গেলেন, বুঝলুম, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হল।

বড় মেয়েটি বললেন—ওটা তানাখা, চন্দনকাঠের পাউডার, মুখে মাখে।

গম্ভীর ভাবে বললুম—ও !

মেয়েটি আমায় বললেন, তাঁরা ইংরিজি কথা বলতে পারেন না। বাঙালী বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ, এমন একটি ইংরিজিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সামনে তাঁরা তাঁদের বাজে ইংরিজির নমুনা বার করতে পারবেন না, ভারি লজ্জা করবে।

ওদের বাবা বললেন—আপনি এখানে ক-দিন থাকবেন ?

—দিন পনেরো বোধহয় আছি।

—দয়া করে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে আসুন না কেন ? এখানে চা খাবেন আর আমার মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইবেন। ওদের শেখা হয়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে আমার আড়তের চিঠিপত্রও তা হলে লিখিয়ে নেবো। এক টাকা করে পাবেন এজন্যে—কি বলেন ? আমি আসতে রাজি হলুম। এক টাকাই দেবেন, আমার

কোনো আপত্তি নেই। তবে দু-ঘণ্টার বেশি আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না, কারণ আমার নিজের আপিসের কাজও রাত্রে আমার করতে হবে।

একদিন খুব বৃষ্টি হল।

আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি চট্টগ্রামবাসী সুকবি ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ ধর সেখানে আপন মনে এক জায়গায় চুপ করে বসে। সুরেনবাবু আমার বিশেষ বন্ধু, এবার চট্টগ্রামে যে-কদিন ছিলাম, কর্ণফুলির ধারে একসঙ্গে মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতুম।

সুরেন ধর খামখেয়ালী ও ভবঘুরে ধরনের লোক। বললেন—চলো হে আমার সঙ্গে, কাল বন বেড়াতে যাই—

আমারও খুব উৎসাহ, বললুম—বেশ চলুন, কোন দিকে যাবেন?

—আরাকান ইয়োমা রেঞ্জ, যেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে নিবিড় টিক-উড ফরেস্ট। চলো ওদিকে যাবো—

সুরেনবাবুর জীবনে পায়ে হেঁটে এরকম বেড়ানো অভ্যেস অনেকদিন থেকেই আছে জানি, তাঁর কথায় তখনি সম্মতি দিলুম। বললুম—এখানে কবে এলেন?

—এখানে আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার, তাঁর ওখানে বেড়াতে এসেছিলুম, প্রায় দশ দিন আছি। শরীরটা ভালো ছিল না, এখন একটু সেরেচে। যদি বেরুতে হয়, এইবার—এই হপ্তার মধ্যেই।

আমি সন্ধ্যাবেলা বর্মী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে তিনি আমার অনেক ভয় দেখালেন। আরাকান ইয়োমা পর্বতশ্রেণী বন্যজন্তু-সঙ্কুল, দুষ্প্রবেশ্য ও প্রায় জনহীন। তা ছাড়া, সামনে যে পর্বত দেখা যায়, ওটা আসল রেঞ্জ নয়, ওর ত্রিশ বত্রিশ মাইল পেছনে যে ধোঁয়ার মতো পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে, ওখানে তাঁদের ফরেস্ট ইজারা করা আছে, কার্যোপলক্ষে অনেকবার তিনি সেখানে গিয়েচেন, অত্যন্ত দুর্গম জায়গা। দুজন মাত্র লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ভদ্রলোকের নাম মৌংপে। কাঠের ব্যবসা করে দুপয়সা করেচেন, তা তাঁর বাড়ির আসবাবপত্র দেখেই বোঝা যায়।

মৌংপে বললেন—আমার এই বড় মেয়েটি আমার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিল—

আমি বিস্ময়ের সুরে বললুম—গাড়ি যায় নাকি সেখানে? কিসে গেলেন?

—হাতীর পিঠে। কাঠ বয়ে আনবার জন্যে আমাদের হাতী আছে জঙ্গলে, আমার নিজের ছ'টা হাতী আছে—আপনাকে হাতীর সুবিধে করে দিতে পারি, কিন্তু নদী পেরিয়ে সে সব হাতী এদিকে তো আসে না। চিঠি লিখে আনাতে গেলে পনেরো দিন দেরি হয়ে যাবে।

মৌংপের বড় মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় আগ্রহ তারই বেশি। প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে যে একটা জিনিস আছে—মংডু শহরের মধ্যে সে-ই একমাত্র বর্মী মেয়ে, যে এ খবর রাখে।

তার বাবা উঠে গেলে সে আমায় বললে—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

—বেশিদিন না। দশ বারো দিন যদি থাকি খুব বেশি।

—তবে আপনি আরাকান ইয়োমা দেখবার আশা ছাড়ুন—পায়ে হেঁটে যাবেন বলচেন,

তাতে এক মাসের মধ্যে ওখান থেকে ফিরতে পারবেন না। আমি আপনাকে আর একটা পথ বলে দিই—একটা রাস্তা আছে, দেবাং আর আরাকান ইয়োমার মাঝখান দিয়ে চীনদেশ পর্যন্ত গিয়েচে—এ পথে গভর্নমেন্টের ডাক যায় মংডু থেকে। আপনি মেলভ্যানে সিংজু পর্যন্ত যান, সেখান থেকে হেঁটে যাবেন—আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো। কিন্তু দুজন লোক নেবে না মেলভ্যানে।

আমি বললুম, তাহলে আমারও যাওয়া হবে না, কারণ বন্ধুকে ফেলে তো যেতে পারিনে!

মেয়েটি বড় ভালো। ওর এক মামা ডাক-বিভাগে কাজ করেন, তাঁকে দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মেলভ্যানে নিতে রাজি হল না দুজনকে।

সুরেনবাবুও পিছিয়ে গেলেন। তিনি এগারো টাকা ভাড়া দিয়ে মেলভ্যানে যেতে রাজি নন। হেঁটে যতদূর হয় যেতে পারেন।

এর কিছুদিন পরে সুরেনবাবু মংডু থেকে চলে গেলেন এবং আমি একা মেলভ্যানে সিংজু রওনা হলুম।

মংডু ছাড়িয়ে প্রথম পঞ্চাশ ষাট মাইল যেতে যেতে মনে হয় বাংলাদেশের নোয়াখালি বা ময়মনসিং জেলার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেচি। এমন কি, আম-কাঁটালের বাগানও চোখে পড়ে। তার পর নিবিড় জঙ্গল, আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণীর বহু নীচু শাখা-প্রশাখা পথের দুপাশে দেখা যেতে থাকে।

ছোটবড় গ্রাম সর্বত্র, নিবিড় বন কোথাও নেই, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ও সেগুন গাছের সাজানো বাগান। বৌদ্ধমন্দির প্রত্যেক গ্রামেই আছে, আর আছে ছোটখাটো দোকান-পশার-ওয়ালা বাজার। দু তিনটি চা-বাগানও পথে পড়ে।

সিংজু পৌঁছে গেল প্রায় সন্ধ্যার সময়। ডাকগাড়ির চালক হিন্দুস্থানী, তার সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব ভাব করে নিয়েছিলুম, রাত্রে তার তৈরী মোটা হাতে-গড়া রুটি খেয়ে তার ঘরেই শুয়ে রইলুম।

পরদিন সে বললে—চলুন বাবুজি, এখান থেকে মেলপিওন ডাকব্যাগ নিয়ে জঙ্গলের পথে অনেকদূর যাবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, তার সঙ্গে যাবেন।

সকাল আটটার সময় সিংজু থেকে বার হয়ে আকিয়াব-গামী বড় রাস্তায় পড়লুম। এখান থেকে আরাকান ইয়োমা পর্বতের উচ্চ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্বতমালা সমুদ্রোপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আকিয়াব থেকে প্রায় রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত।

পিতাং এ অঞ্চলের একটি বড় নদী, এই নদীর শাখাপ্রশাখা অনেকবার পার হতে হয়, আকিয়াব রোডের ওপর অনেকগুলি সেতু আছে, এই নদীর বিভিন্ন শাখার ওপরে।

এদিকের আরণ্য প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক এক গাছের গুঁড়ির গায়ে এত ধরনের পরগাছার জঙ্গল আর কোথাও কখনও দেখিনি। অনেক পরগাছে অদ্ভুত রঙিন ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝে পার্বত্য ঝরনা, বড় বড় ট্রি ফার্ন, এ বনের চেহারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ ধরনের বন বাংলাদেশের কুত্রাপি দেখিনি, কিন্তু বহুদিন পরে আসাম অঞ্চলে

বেড়াতে গিয়ে শিলং থেকে সিলেট যাওয়ার মোটর রোডের দুধারে বিশেষ করে ডাউকি প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে, অবিকল অরণ্যের এই প্রকৃতি আমার চোখে পড়েচে।

বাংলাদেশের পরিচিত কোনো আগাছা, যেমন শেওড়া, ভাঁটা, কাল-কাসুন্দে প্রভৃতি এদিকে একেবারেই নেই। এদিকে উদ্ভিজ্জসংস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাতেই বোধ হয় যা দেখি তাই যেন ছবির মতো মনে জাগায় অপূর্ব সৌন্দর্যের অনুভূতি। সর্বত্র অসংখ্য সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক। বড় বড় বেত-ঝোপ। কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মাঝে মাঝে।

এই পথে প্রথম রবারের বাগান দেখি।

আগে রবারের বাগান বলে বুঝতে পারিনি, বড় বড় গাছ, অনেকটা কাঁটাল পাতার মতো পাতা। গাছের গায়ে নম্বর মারা—কোনো কোনো বাগান কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, কোনো কোনো বাগান বেষ্টনীশূন্য ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে—শুনেছিলাম অনেক বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এক জায়গায় ডাকপিয়াদার থাকবার জন্যে বনের মধ্যে ছোট খড়ের ঘর।

আমার সঙ্গে যে পিয়াদা এসেছিল, সে এর বেশি আর যাবে না। রাত্রে আমরা সেই খড়ের ঘরেই রইলুম, সকালে অন্যদিকের পিওন এসে এর কাছে থেকে ডাকব্যাগ নিয়ে যাবে, এ পিয়াদা ওর ব্যাগ নিয়ে চলে আসবে সিংজুতে।

আমরা যখন সে ঘরে পৌঁছুলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে।

ডাকপিয়াদার ঘরে যাপিত সেই রাত্রিটি আমার জীবনে মনে করে রাখবার মতো। দুধারে আরাকান ইয়োমার উন্নতকায় শাখা-প্রশাখা, সারা পর্বত-সানু নিবিড় অরণ্যময়। অরণ্যের সান্ধ্য স্তব্ধতা ভঙ্গ করেচে পার্বত্য ঝরনার কুলকুল শব্দ, অন্ধকার বনের দিক থেকে কত কি পাখীর ডাক আসচে; যদিও স্থানটির মাইলখানেকের মধ্যে খুব বড় একটা রবারের বাগান, তবুও সন্ধ্যায় যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীর প্রান্তসীমায় এসে পড়েচি দুজনে, জনমানুষ নেই বুঝি এর কোনোদিকে।

বেশি রাত্রে ডাকপিয়াদা এসে পৌঁছুলো।

নবাগত ডাকপিয়াদার নাম কাচিন, একটু একটু ইংরিজি জানে; লোকটির চেহারা এমন কর্কশ ও রুক্ষ যে পথে-ঘাটে দেখলে ডাকাত বলে ভুল হবার কথা। তার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে হবে বলে প্রথমটা ইতস্তত করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সকালবেলা তার সঙ্গেই নতুন পথে পা দিলাম।

এবার পথ নিবিড় অরণ্যময়।

আমরা ক্রমশ এক মহারণ্যে প্রবেশ করলুম। দুধার বড় বড় বনস্পতিতে সমাচ্ছন্ন। মানুষ নেই, জন নেই, গৃহ নেই, পল্লী, মাঠ নেই, এতটুকু ফাঁকা স্থান নেই। কেবল নিবিড় জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে আকিয়াব থেকে প্রোমে যাবার রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেচে।

ছোটবড় নানা রকমের গাছ, শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করে যেন এ ওর গায়ে এলোমেলো ভাবে পড়ে। বড় গাছগুলির মাথা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে—এক একটা গাছ প্রায় দেড়

শো ফুট উঁচু। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, এমনটি কোথাও দেখেচি বলে মনে হল না।

প্রকৃতি এখানে যেন ভৈরবীর বেশে দর্শকের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়।

সম্মুখে একটি নদী। পাহাড়ী নদী, বালুময়, চড়া, ক্ষীণ নদীস্রোত উপলরাশির ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইচে, নদীর এপারে ওপারে সুবিশাল অরণ্য, স্তরে-স্তরে ক্রমোন্নত বৃক্ষশ্রেণী। বৃক্ষশ্রেণীর পেছনে সুদূরবিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, তাও স্তরে স্তরে সাজানো।

নদী হেঁটে পার হওয়া গেল—হাঁটু পর্যন্ত জল, তার তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডে পা কেটে যেতে পারে বলে আমরা একটু সাবধানে জল পার হই। আবার ঢুকে পড়ি বনের মধ্যে, বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু শাখা-প্রশাখার এমন নিবিড় জড়াজড়ি মাথার ওপরে যে, অত বেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকেনি বনের পথে।

এইবার প্রোম রোড পাহাড়ের ওপর উঠেচে। খুব বড় বড় ঘাস, হোগলা বা নল-জাতীয়, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথের মতো সরু রাস্তা—মাঝে মাঝে আবার খুব চওড়া হয়ে এসেচে।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা বললে—খুব সাবধানে চলো, এখানে বুনো হাতীর ভয় খুব।

ওরই মুখে শুনলুম এই বনের মধ্যে গবর্নমেণ্টের হাতী-খেদা আছে; বছরে অনেক হাতী নাগা পাহাড়ের নিচু উপত্যকা থেকে এখানে আসে ব্রহ্ম ও আসাম সীমান্তের পাহাড়শ্রেণী ডিঙিয়ে—হাতীর নাকি অগম্য স্থান নেই, কোনো উঁচু পাহাড়ই তার পথ রোধ করতে পারে না।

এখান থেকে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে বনের মধ্যে পেট্রলের খনি আছে, ওরই মুখে শুনলুম। আকিয়াব-প্রোম রোড থেকে তারা রাস্তা বের করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খনিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচে।

আমি ওকে বললুম—হাতীর কথা তো শুনচি, কিন্তু এ বনে বাঘ থাকা তো বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার নয়—তুমি কি বল?

সে বললে, বাঘের ভয় এখন নয়, সন্ধ্যার পরে। তার আগে আমরা আশ্রয় পাবো। হাতী দিনের আলো মানে না।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতে সে বনে সন্ধ্যা হয়ে এল। দুপুর থেকে চারটের মধ্যে আমরা কিন্তু খুব বেশি পথ অতিক্রম করিনি, বড় জোর আট মাইল, সকাল থেকে এ পর্যন্ত পনেরো মাইলের বেশি আসিনি।

খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে বলে বনের মধ্যে পথ মোটে এগোয় না।

পাঁচটার সময় রীতিমত অন্ধকার নামলো। আমাদের খড়ের ঘর এখনও কতদূরে তার ঠিকানা নেই, অথচ ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আমার সঙ্গী বলচে সামনেই ঘর।

এ পথে ডাকপিয়াদা সশস্ত্র চলে তাই কতকটা রক্ষে। আমার সঙ্গী দেখতে বেঁটে-খাটো লোকটি, কিন্তু তার দেহ যেন ইস্পাতে তৈরী, যেমন নির্ভীক, তেমনি আমুদে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কত রকমের হাসির গল্প করতে করতে আসচে সারাপথ।

বনের মধ্যে যখন পথ আর দেখা যায় না, তখন আশ্রয় মিললো।

নিবিড় বনপর্বতের মধ্যে খড়ের ঘর। এত বড় নির্জন বনের মধ্যে আমরা মোটে দুটি প্রাণী।

রাত্রে রান্না হল শুধু ভাত। অন্য কোনো উপকরণ নেই, নুন পর্যন্ত না, এদেশের লোকের দেখলুম নুন না হলেও চলে। এর আগেও অনেক বার দেখেছি, নুনকে এরা রন্ধনের একটা অত্যাবশ্যক উপকরণ বলে আদৌ মনে করে না। সমস্ত দিন পথ হাঁটার পর শুধু ভাতই অমৃতের মতো লাগলো আমাদের মুখে।

বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে আমি একবার বাইরে গিয়ে অরণ্যানীর নৈশরূপ দেখতে চাইলুম, ডাকপিয়াদা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করলে।

তারপর সে একটা গল্প বললে।

মান্দালে থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে কোথায় গবর্নমেণ্টের রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। সেখানে একজন নতুন ফরেস্ট রেঞ্জার এসে একবার ডাকবাংলোয় উঠলো। ডাকবাংলোটির চারিধারে নিবিড় বন, সঙ্গের কুলিরা বলে দিলে সন্ধ্যা হলেই সাহেব যেন আর বাইরে থাকে না, ডাকবাংলোর দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে দেয়, আর বেশ ভালো করে রোদ উঠবার আগে যেন দরজা খুলে বারান্দাতে না আসে।

রেঞ্জার ছিল মাদ্রাজী মুসলমান, খুব সাহসী, ত্রিশের মধ্যে বয়স। সন্ধ্যা হবার একটু আগেই সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরেই তার মনে পড়লো তামাক খাওয়ার পাইপটা বারান্দায় টেবিলে ফেলে রেখে এসেচে। তখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি—সাহেবের সঙ্গে যে আরদালি ছিল সেও এ সব অঞ্চলে নতুন লোক। আরদালি ভাবলে চট করে দরজা খুলে পাইপটা নিয়ে আসবে। বাইরে গেল কিন্তু সে ফিরলো না; তার দেরি হতে দেখে সাহেব বারান্দায় গিয়ে কোনোদিকে আরদালির চিহ্ন দেখতে পেলে না। বাংলোর বাইরে কিছু দূরে কুলিদের থাকবার ঘরে আট দশজন কুলি ছিল, সাহেবের চীৎকারে তারা মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে জড় হল। বারান্দার ও প্রান্তে দেখা গেল বাঘের পায়ের থাবার দাগ। পরদিন দূর বনের মধ্যে হতভাগ্য আরদালির দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এ ধরনের গল্প আমি কিন্তু এর আগে সুন্দরবন সম্বন্ধে শুনেছিলুম। সুতরাং এ গল্পে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বনের মধ্যে খড়ের ঘরের কোণে শুয়ে মন্দ লাগে না শুনতে এ ধরনের কাহিনী।

আমি ওকে বললুম—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথায়?

ডাকপিয়াদা বললে—প্রোমের মিশনারী স্কুলে।

—তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—কেউ নেই, আজ দশবছর হল মা মারা গিয়েচেন, তারপর বাড়িও নেই। ডাক-পেয়াদার কাজ করি, সিংজুতে বাসা নিয়ে থাকি।

লোকটাকে বেশ লাগলো। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর সঙ্গে গল্প করলুম। ওর ইচ্ছে বিয়ে করে, কিন্তু সামান্য মাইনে পায় বলে সাহসে কুলোয় না।

আমি বললুম—কেন, তোমাদের দেশে তো তোমার চেয়ে অনেক কম মাইনে পেয়েও লোকে বিয়ে করচে? মণ্ডুতে তো সামান্ত ফিরিওয়ালাকে সস্ত্রীক জিনিস ফিরি করতে দেখেচি?

—বাবু, ওরা লেখাপড়া জানে না, তাই অমনি করে। আমি ইংরিজি স্কুলে তিন চার বছর পড়ে তো আর ওদের মতো ব্যবহার করতে পারিনে!

আরও জিজ্ঞেস করে জানলুম ওখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। মেয়েটি সিংজুতে চুরুটের কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহে দুটাকা করে মাইনে পায়।

আমি বললুম—সে কি বলে?

—সে বলে বিয়ে করো। আমি সাহস পাইনি কিন্তু, কোথায় রাখবো, কি খেতে দেবো। এই তো সামান্ত মাইনে।

—তার বাপ মা নেই?

—কেউ নেই, আমারই মতো অবস্থা।

ডাকপিয়াদা আসলে বড় প্রেমিক, যেমন তার প্রণয়িনীর কথা উঠলো, সে আর অন্ত কথা বলে না প্রণয়িনীর কথা ছাড়া। মেয়েটি নাকি বড় ভালো, তাকে খুব ভালোবাসে, চুরুটের কারখানায় কাজ করে যা পায়, নিজের খাওয়া পরা বাদে সব জমিয়ে রাখে ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের জন্তে, একটি পয়সা বাজে খরচ করে না।

অত বড় বনের মধ্যে কিন্তু রাত্রে কোনো রকম শব্দ শুনলাম না বন্তজন্তুদের। একটি শেয়াল পর্যন্ত ডাকলো না। খানিক রাত্রে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে এদিকের ডাকপিয়াদা এল। ঠিক করাই ছিল যে আমি তার সঙ্গে মোংকেট পর্যন্ত উনিশ মাইল পথ হেঁটে যাবো।

কিন্তু আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা কথায় কথায় রাত্রেই আমায় বলেছিল যে, পাহাড় জঙ্গলের পথ এখানে শেষ হয়ে গেল, এরপর আর বেশি জঙ্গল নেই, কেবল পড়বে রবারের বাগান আর ধান ক্ষেত। আবার জঙ্গল আছে মান্দালে ছাড়িয়ে গোয়েটেক্ সেতু পার হয়ে উত্তর-পূর্ব ব্রহ্ম-সীমান্তে। সেদিকের বন অত্যন্ত নিবিড়, সে পথ অনেক বেশি দুর্গম।

আমি ডাকপিয়াদাকে বললুম, এই নতুন লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো কতদূর আর জঙ্গল পড়বে; ততদূর ওর সঙ্গে যাবো—

নবাগত ডাকপিয়াদা খাস বর্মিজ ছাড়া অন্ত কোনো ভাষা জানে না, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় আমার। আমার পূর্ব সাথী বললে—বাবু, ও বলচে সাত মাইল পর্যন্ত এই রকম জঙ্গল আর পাহাড়, তারপরে আবার বর্মা রবার কোম্পানির বড় একটা বাগান পড়বে দুতিন মাইল, তারপরে ধানের ক্ষেত আর বস্তি।

এই সাত মাইল আমি ওর সঙ্গে গেলুম।

প্রভাতের সূর্যালোক বনের ডালে ডালে বাঁকাভাবে পড়েছে কারণ পাহাড়ের পূর্বদিকের অংশটা খুব নীচু।

অনেক রকমের পুষ্পের মধ্যে সাদা সাদা কি এক ধরনের ফুল ছোট-বড় সব গাছের মাথা ছেয়ে রেখেচে ; কোনো লতার ফুল হবে, কিন্তু লতা আমার চোখে পড়লো না। খুব ঘন সুগন্ধ সে ফুলের, যে যে গাছের মাথায় সে ফুলের মেলা, তার তলা দিয়ে যাবার সময় উগ্র সুবাসে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করে, আমি ইচ্ছে করে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে দেখেচি- মনে হয় যেন শরীর টলচে।

একটি জায়গায় সৌন্দর্যের ছবি মনে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েচে।

পথের ধারে একটি পাহাড়ী নদী, মাথার ওপর সেখানে আকাশ দেখা যায় না, বড় বড় বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখার মেলা, মোটা লতা ঝুলে জলের ওপর পর্যন্ত পৌছেচে, বাঁদিকের বন এত ঘন যে কালো-মত দেখাচ্চে, ডানদিকে জলের ওপরে শিলাখণ্ডের অগ্রভাগ জেগে আছে।

রাস্তাটা ওপার থেকে এসেচে টেরচা ভাবে, বনের মধ্যে ঘুরে ফিরে নদীর ধারে এসে যেন হঠাৎ খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে নদীগর্ভে ঢুকেচে। সেই দিকটা এপার থেকে দেখাচ্চে যেন চীনা চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবির মতো। একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসে সেই দৃশ্য কতক্ষণ উপভোগ করলুম একমনে, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা এখানে জলে স্নান করতে নামলো।

নদী চওড়া হবে হাত-কুড়ি কি বাইশ। হেঁটে পার হতে হয় অবিশ্যি, হাঁটুজলের বেশি নেই কোথাও। আমরা যখন বসে, তখন ওপার থেকে পাঁচ ছ-জন লোক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে সিডান চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এসে জলে নামলো।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা সিডান চেয়ার কখনো দেখেনি, হাঁ করে চেয়ে রইল। শুনলুম এদেশে এ জিনিসের প্রচলন নেই, রবার-বাগানওয়ালা ধনী লোকেরা চীন ও মালয় উপদ্বীপ থেকে এর আমদানি করেচে।

মহিলাটি যখন জল পার হলেন চেয়ারে বসে, তখন লক্ষ্য করলুম সাধারণ বর্মিজ মেয়ের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দরী। এমন কি, আমার মনে হল, গায়ের রং বর্মিজদের মতো নয়, গোলাপী আভা ধপধপে সাদার ওপর।

আমার সঙ্গী জলে নেমে স্নান করছিল, সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়লো।

এ ধারে এসে সিডান চেয়ারের বাহকেরা চেয়ার নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে। মহিলাটি এবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমিও চেয়ে দেখলুম; বেশ সুন্দর মুখশ্রী।

পরে সিংজুতে জিজ্ঞেস করে আমি জেনেছিলুম তিনি বর্মিজ নন, সান্ দেশীয় মেয়ে। সান্ মহিলারা সাধারণত ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী। মহিলাটি জনৈক ইউরোপীয় রবার-বাগানের মালিকের বিবাহিতা পত্নী, অনেক টাকার মালিক ওঁর স্বামী।

ওঁরা প্রায় আধঘণ্টা খেয়াঘাটে বসে রইলেন, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা আরও দূরে গাছপালার আড়ালে গিয়ে স্নান সেরে এল।

সেদিনই ওখান থেকে সিংজুর দিকে ফিরলাম।

আবার সেই বনানী, আগের দিনের সেই খড়ের ঘরে রাত্রিযাপন।

মংডুতে ফিরে মিঃ মৌংপের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম সন্ধ্যাবেলা। ওরা সকলেই খুব খুশী হল আমায় দেখে। মেয়ে-দুটি রোজ বর্মিজ গান গাইতেন, বড় মেয়েটির গলা বেশ সুরেলা বলে মনে হত আমার কাছে, যদিও গানের অর্থ এক বর্ণও বুঝতুম না। এদিন ওঁরা দুজনেই অনেকগুলি গান গাইলেন, বনের অনেক গল্প শুনলেন, শেষে রাত্রে তাঁদের ওখানে খেতে বললেন।

ব্রহ্মদেশীয় পরিবারে একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, যাকে তারা একবার বন্ধুভাবে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেচে, তার সঙ্গে ওদের ব্যবহার নিঃসঙ্কোচ ও উদার আত্মীয়তাতে ভরা। ব্রহ্মদেশীয় খাদ্য কখনও খাইনি, আমার ভয় ছিল হয়তো এমন সব খাবার জিনিস টেবিলে আসবে যা মুখে তোলা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওঁদের ব্যবহার এত সুন্দর—এমন কোনো আহার্য তাঁরা আমার সামনে স্থাপিত করলেন না, যা আমার অপরিচিত। মিষ্টি পোলাও, মাংস, মাছ, মংডুর বাঙালী ময়রার দোকানের সন্দেশ ও রসগোল্লা।

আমি বড় মেয়েটিকে বললুম—আপনাদের বাড়ির রান্না ভারি চমৎকার—বাংলাদেশের রান্নার মতই ধরন তো অবিকল।

বড় মেয়ে মৌংকেট হেসে বললে, এ যা খেলেন, আমাদের দেশের খাবার কিন্তু এ নয়। হয়তো সে আপনি খেতে পারতেন না।

—তাই কেন খাওয়ালেন না?

—আপনার মুখে ভালো লাগতো না। আপনি শুটকি মাছ খেয়েচেন কখনো?

—খাইনি কখনো। তবে একবার খেয়ে না হয় দেখতুম। আর নাপ্পি? সেটা বাদ গেল কেন?

—নাপ্পি সব সময় বা সকল ভোজে খায় না। ও একধরনের চাটনি হিসেবেই খাওয়া হয়। নাপ্পি টেবিলে দিলে আপনি উঠে পালাতেন।

—বাঙালী-রান্না আপনারা জানেন?

—আমাদের রান্না একটাও নয়। বাঙালী বাবুর্চি দিয়ে সব রাঁধানো। আমরা পোলাওটা রাঁধতে পারি। মংডু বাংলা দেশের কাছে, অনেক বাঙালী এখানে থাকেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া অনেকটা বাঙালী ধরনের হয়ে গিয়েচে।

হাসিগল্পের মধ্যে দিয়ে খাওয়া শেষ হল।

পরদিন আমি ওঁদের একটি বাঙালী হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালুম। ওঁদের সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গিয়েছিল এ-কদিনে যে, সাতদিন পরে যখন মংডু ছেড়ে চলে আসি তখন সত্যিই বড় কষ্ট হয়েছিল ওঁদের ছেড়ে আসতে। আসবার সময় মিঃ মৌংপে মেয়েদুটিকে নিয়ে জাহাজঘাটে আমায় বিদায় দিতে এলেন। মৌংকেট একটা সুদৃশ্য চন্দনকাঠের ছোট বাক্স ভর্তি সমুদ্রের কড়ি, ঝিনুক আমায় উপহার দিলেন। দুঃখের বিষয় এই বাক্সটি সেইবারেই ঢাকা আসবার সময় ট্রেনে খোয়া যায়।

মংডু থেকে চাটগাঁ ফিরে আমার পূর্বপরিচিত সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠলুম। এই উপলক্ষে একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। চট্টগ্রাম আমার কাছে তো বহুদূর বিদেশ, কিন্তু যখন ডবল মুরিংস্ জেটি থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে ওদের বাড়ি যাচ্ছি, তখন মনে হল যেন অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরলুম।

ওদের সেই বৈঠকখানার পাশেই মুলী বাঁশের চাঁচে ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানি আমার কত প্রিয় পরিচিত হয়ে উঠেছিল, যেন আমার কতদিনের গৃহ সেটি। উঠানের বাতাবিলেবু গাছের ছায়া যেন কতকালের পরিচিত আশ্রয়।

পথে পথে অনেকদিন বেড়িয়ে এই ব্যাপারটি আমি লক্ষ্য করেছি, মন যেখানে এতটুকু আশ্রয় পায় সেইখানেই তার আঁকড়ে ধরে থাকবার কেমন একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে। সে আশ্রয় যখন চলে যায় তখন মন আশ্রয়ান্তরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অত্যন্ত সহজে ও অবলীলাক্রমে।

একটা ছবি আমার এই সম্পর্কে বহুদিন মনে ছিল।

যখন চাটগাঁ আসচি স্টীমারে, দূর থেকে দেখতে পেলাম কর্ণফুলির মোহনার বাইরে সমুদ্রের মধ্যে একখানা বড় পালতোলা জাহাজ নোঙর করা আছে। নীল সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর থেকে জাহাজখানা দেখাচ্চে যেন একটি দ্বীপের মতো, যেন অকূল সমুদ্রের কূলে দুঃখসুখবিজড়িত একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ, তার সাদা ভাঁজকরা গোটানো পালগুলো, লম্বা লম্বা মাস্তুলগুলো আর মস্ত বড় কালো খোলটা আমার মনে বহুদিন স্থায়ী রেখাপাত করেছিল।

চাটগাঁয়ে ওদের বাড়ি আসতে ওরা আমাকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা করলে—মুলী বাঁশে ছাওয়া সেই ছোট ঘরটাতে আবার বিছানা পেতে দিলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে মংডু থেকে বর্মিজ পুতুল ও খেলনা এনেছিলুম—তারা সেগুলো পেয়ে খুব খুশী।

একদিন বাড়ির কর্তা বললেন, চলুন সীতাকুণ্ড যাবেন? আপনি তো চন্দ্রনাথ যাননি, অমনি চন্দ্রনাথও ঘুরে আসবেন, এ অঞ্চলে এসে চন্দ্রনাথ না দেখলে বাড়ি ফিরে লোককে বলবেন কি?

পরদিন সকালের ট্রেনে দুজনে গিয়ে নামলুম সীতাকুণ্ডে।

বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম আসবার পথে একদিন এই চন্দ্রনাথ পাহাড়কে দূর থেকে দেখেছিলুম, তখন মনে ভেবেছিলুম চাটগাঁ পৌঁছেই আগে চন্দ্রনাথ দেখতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা আর তখন হয়ে ওঠেনি।

আজ দেরাং আর আরাকান ইয়োমা পর্বত-শ্রেণী ও অরণ্যভূমি বেড়িয়ে এসে চন্দ্রনাথ পর্বতকে নিতান্ত উইটিবির মতো মনে হচ্চে। হাজার দেড় কি সতেরো শ' ফুট উঁচু পাহাড় আবার কি একটা পাহাড় নাকি! কিন্তু এ ভুল আমার পরে ভেঙেছিল, সে কথা বলচি।

সীতাকুণ্ড গ্রামের মধ্যে কর্তার পরিচিত এক পাণ্ডার বাড়ি গিয়ে দুজনে উঠলাম। আমার সঙ্গী এ অঞ্চলে একজন বিখ্যাত লোক ও জমিদার, সীতাকুণ্ড গ্রামে তাঁর নিজের একখানা

বাগানবাড়ি আছে, অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে বলে সেখানে ওঠা হয়নি—এই পাণ্ডাটি এঁর আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তি, তাই এখানেই ওঠা হল—তীর্থ করে পুণ্য অর্জন করবার জন্যে নয়।

পাণ্ডাঠাকুর অবশ্যি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমায় বললে,—পাহাড়ে উঠবেন না? চলুন নিয়ে যাই—

আমার সঙ্গী হেসে বললেন—তোমায় নিয়ে যেতে হবে না ঠাকুর মশাই। উনি নিজেই যেতে পারবেন, অনেক পাহাড় জঙ্গল ঘুরেচেন একা—তোমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একা যেতে আটকাবে না ওঁর।

পাণ্ডাঠাকুরের প্রাপ্য তাহলে মারা যায়—সে তা ছাড়বে কেন। আমাকে নিয়ে সে পাহাড়ে উঠলো। চন্দ্রনাথের বৃক্ষলতার শোভা আমার মন মুগ্ধ করলে ওঠবার পথে, বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়েই। অনেক বড় লোক পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েচে নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে, মার্বেল পাথরের ফলকে তাদের নাম ধাম লেখা আছে, আমার তো খুব ভালো লাগছিল প্রত্যেকখানি মার্বেল পাথরের ফলক পড়তে, ওঠবার সময় অনেক দেরি হয়ে গেল সেজন্যে।

বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়ে অনেক দূর উঠে একটা পাহাড়ী ঝরনা নেমে আসচে, সেখান থেকে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে দুদিক দিয়ে ওপরে উঠচে। এই পর্বতে উঠে হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়েই দেখি নীল সমুদ্র ও সন্দ্বীপের অস্পষ্ট সবুজ তটরেখা।

সেখানে বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে বসে রইলুম খানিকটা। সামনের পার্বত্য ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি, বন-ঝোপের ছায়া, বন-কুসুমের সুবাস ও দূরের নীল সমুদ্রের দৃশ্য যেন চোখের সামনে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে, উঠতে ইচ্ছে হয় না।

পাণ্ডা বললে, বড় দেরি হয়ে যাবে বাবু, চলুন ওপরে।

আবার দুজনে ওপরে উঠতে লাগলুম। নিবিড় মূলী বাঁশের বন, গাছ পাতা ও লতা ঝোপের বিচিত্র সমাবেশ। মাঝে মাঝে ঝরনা নেমে আসচে বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে, মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, মাঝে মাঝে আড়াল পড়চে বন-ঝোপের।

চন্দ্রনাথে পাহাড়ের দৃশ্য এদিক দিয়ে অন্য অনেক পার্বত্য দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অন্য সব জায়গায় পাহাড় আছে, কিন্তু হয়তো বনানী নেই; যদিও বন থাকে তবে একঘেয়ে বন। একই গাছের, ইংরেজিতে যাকে বলে homogenous forest, যেমন আছে সিংভূম, মানভূম, সারেণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে। সে বনের বৈচিত্র্য নেই, মনকে তত আনন্দ দেয় না, চোখকে তত তৃপ্তি দেয় না।

আরাকান ইয়োমা পর্বতের বনভূমি যে প্রকৃতির, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বনও সেই একই প্রকৃতির, বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই; কেবল মাত্র এইটুকু যে, পূর্বোক্ত অরণ্যে বনস্পতিজাতীয় ফার্ণ যথেষ্ট, চন্দ্রনাথের বনে ও-জাতীয় ফার্ণ আদৌ নেই।

তাছাড়া এমন পাহাড়, বনানী ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যাবে না

বাংলাদেশে। ভারতবর্ষেও দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের কয়েকটি স্থান ও মালাবার উপকূল ছাড়া আর কোথাও নেই।

অনেকে ভাবেন চন্দ্রনাথ ছোট একটি পাহাড় হয়তো; আসলে চন্দ্রনাথ একটি পাহাড় নয়, পাহাড়-শ্রেণী। দৈর্ঘ্যে ষাট মাইলের কম নয়। পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত এর চারটি থাক্ আছে, সামনের গুলি তেমন উঁচু নয়; সকলের পেছনের থাক্‌টির উচ্চতা গড়ে দেড় হাজার ফুট।

চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণী আসলে পূর্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা, যেমন আরাকান ইয়োমা বা সমগ্র উত্তরব্রহ্ম, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরার ছোট-বড় সকল শৈল-শ্রেণীই হিমালয়ের দক্ষিণ বা পূর্বমুখা শাখাপ্রশাখার বিভিন্ন অংশ। সেই একই নগাধিরাজ হিমালয় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্তিতে পরব্রহ্মের বহু অবতারের মতো এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এদিন পাণ্ডাঠাকুরের তাড়ায় বেশিক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় বসা সম্ভব হল না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে এই বনে, সারা পথে একটাও লোক নেই।

সেদিন নেমে এলুম বিকেলের দিকে।

ওদের সুপুরি বাগানের মধ্যে ছোট্ট চাঁচের আর টিনের বাড়ি, পথের ধারে পাটি-পাতার গাছ আর বেতবন। পাটিপাতার গাছ থেকে শীতল পাটি বোনা হয়—এ অঞ্চলের সর্বত্র এ গাছ বনে-জঙ্গলে দেখা যায়; ঘন সবুজ চওড়া পাতা, অনেকটা আমাদের দেশের বন-চালতে গাছের মতো ডাল-পালার আকৃতি।

সেদিন সন্ধ্যায় সুপুরি বনের মধ্যে, ছোট ঘরে একা চুপ করে বসে আছি, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলচে, বাইরে তারাভরা আকাশ, দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড় শ্রেণীর কৃষ্ণ সীমারেখা।

কতবার দেখেছি এমন সব সময়ে যেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতির্লোকের গ্রহতারা এক হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে উঠে চাঁদের বাতির তলায় নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রূপ দেখে কতবার অবাক হয়ে গিয়েচি—খানিকটা চিনি, খানিকটা চিনি না একে।

কি বিরাট ইঙ্গিত সমগ্র ছায়াপথের, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনির, শান্ত জ্যোৎস্নালোকের ঝিল্লীমুখর নিশীথরাত্রির!—

পথের ধারে শুধু ওদের ডাক, বহুদূর পথ ব্যেপে। ঘর থেকে অন্য রকম শোনাবে, পথ থেকে অন্য রকম।

তারপর যা বলছিলুম—

ঘরের মধ্যে বসে আছি, এমন সময় একটি তরুণী বধূ ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার সামনে একবাটি মুগের ডাল আর একটু কি গুড় রাখলেন। কোনো কথা বললেন না। আমি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না—হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে মুগের-ডাল-ভিজে কি রকম জলখাবার!

ভাবলুম—হয়তো এখানে এইরকমই খায়। পরের বাড়ি অতিথি, আহার্য সম্বন্ধে নিজের মতামত এখানে চলবে না আমার। ডাল-ভিজে কিছু খেয়ে যখন বাটিটা রেখে দিয়েচি, তখন

বধূটি একবাটি গরম দুধ এনে সামনে রাখলেন। এবার আমার সন্দেহ হল, আমি বললুম—এখন দুধ কেন মা? সন্ধ্যেবেলা আমি তো দুধ খাইনে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় নিম্নস্বরে কি বললেন ভালো বুঝলাম না। যাইহোক, ভাবলাম দুধ খাওয়ানোর জন্য যখন এত পীড়াপীড়ি, না হয় দুধটা খেয়েই নিই।

পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী দু-টুকরো হর্তুকি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলেন। ব্যাপার কি, আমায় কি এরা সন্ন্যাসী ভেবেচে?···সবাই খাচ্চে পান, আমার বেলা হর্তুকি কিসের? রাত্রে আমার সাথীর খাবার ডাক পড়লো, আমায় কেউ ডাকলে না—আমি তো অবাক ব্যাপার, কিছু বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গী খেতে গেলেন, কারণ তিনি বেড়িয়ে ফিরেছিলেন অনেক রাত্রে, ভাবলেন আমি বোধহয় খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। খিদে বেশ পেয়েচে, এত লম্বা রাত না খেয়ে কাটাই বা কি করে? বড় মুশকিলে ফেলেচে এরা।

অবশেষে শুয়ে পড়লুম রাত্রে। সকালে উঠে আমার সঙ্গীর চা এল, আমাকে কেউ চা দিলে না। বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, এরা বড় অভদ্র, এদের এখান থেকে চলে যাবো, বড়লোক দেখে ওঁর খাতির করচে খুব, আর আমাকে কাল রাত্রে খেতে দিলে না, সকালে একটু চা পর্যন্ত দিলে না—আজই চলে যাবো।

আমার সঙ্গী বললেন, চলুন বেড়িয়ে আসি—

পাণ্ডাঠাকুর ইতিমধ্যে একটা পুঁটুলি, খান-দুই কুশাসন, একটা ঘটি হাতে এসে আমায় বললেন—চলুন যাই, এর পরে বেলা হয়ে যাবে—

আমি অবাক হয়ে বলি, কোথায় যাবো?

—শ্রাদ্ধের কাজগুলো সকাল সকাল সারি—

—কার শ্রাদ্ধ?

—আপনি মা-বাপের শ্রাদ্ধ করবেন তো।

—কে বললে আমি শ্রাদ্ধ করবো?

পাণ্ডাঠাকুরের মুখ দেখে মনে হল জীবনে তিনি কখনো এত বিস্মিত হন নি, আমায় বললেন—সে কি! আপনি কাল রাত থেকে সংযম করে আছেন কেন তবে? আমার স্ত্রী বললেন—

আমার এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল—কাল রাত্রের গোটা ব্যাপারটার অর্থ এতক্ষণে বুঝলুম। আমি ওঁর স্ত্রীর কথা বুঝতে পারিনি, তা থেকেই সমস্ত ভুলটার উৎপত্তি। আমার সঙ্গী সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হো হো করে হেসে উঠলেন। পাণ্ডাঠাকুর মহা অপ্রতিভ। তিনি বাড়ির মধ্যে স্ত্রীকে গিয়ে তিরস্কার আরম্ভ করলেন—আমি তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলুম।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে যথেষ্ট ত্রুটি স্বীকার করলেন, কাল রাত্রে না খেতে দিয়ে রেখে

দিয়েচেন সেজন্তে খুব লজ্জিত হলেন।—সংযম করবেন আপনি সে কথা ভেবেই আমার স্ত্রী দুধ আর মুগের ডাল ভিজে খেতে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

আমার সাথী আমাকে বললেন—আপনিই বা বললেন না কেন, যে আপনি শ্রাদ্ধ করবেন না? আপনি তো দিব্যি শুধু দুধ খেয়েই বসে রইলেন—

আমি বললুম—তা কি করে জানবো? আমি কি ছাই মায়ের কথা কিছু বুঝলুম?

—বেশ, বেশ! কথা না বোঝার দরুন আপনাকে উপোস করতে হল সারারাত—

পাণ্ডাঠাকুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বড় ভালো লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই; আর বড় নিরীহ। এই ব্যাপারে দুজনে এত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন যে তারপরে যে দুদিন ওখানে ছিলাম, ওঁরা যেন নিতান্ত অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে রইলেন আমার কাছে।

একটু বেলা হলে আমি বললুম—আজ আমি একা বাড়বাকুণ্ড আর সহস্রধারা যাবো—

পাণ্ডাঠাকুর বললেন—দুটো দুদিকে—আজ একদিকে যান; সহস্রধারা কিন্তু একা যেতে পারবেন না—বাড়বাকুণ্ড যাওয়া সহজ। রাস্তা বলে দেবো, চলে যাবেন।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথ। এবার সম্পূর্ণ একা চলেচি। লোক সঙ্গে থাকলে প্রকৃতিকে ঠিক চেনা যায় না, বোঝা যায় না আরাকান ইয়োমার পথে দেখেচি, সঙ্গে লোক থাকলে এত বক্ বক্ করে যে মন কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারে না।

বাড়বাকুণ্ডের পথের দুধারে ঘন জঙ্গল, সমস্ত পথের পাশে কোথাও একটি লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে বন্য পেয়ারা ও বন্য-কদলীর বন, করবীফুলের সমারোহে শৈল সজ্জিত। কোথাও বা একটি পাহাড়ী ঝরনা সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে; আশেপাশে বন-ঝোপের শান্ত, শ্যামল সৌন্দর্য।

পথের ধারে দু-জায়গায় পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নীলবর্ণ অগ্নিশিখা বার হয়ে সমস্ত শৈলশ্রেণীর আগ্নেয় প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্চে।

বাড়বাকুণ্ড পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। এর প্রধান কারণ আমি একটানা পথ হাঁটিনি, মাঝে মাঝে বনগাছের ছায়ায় শৈলাসনে বসে বিশ্রামের ছলে চারিপাশের অনুপম গিরিবনরাজির শোভা উপভোগ করছিলুম। এক এক জায়গায় শৈলসানুতে এত বন্য-কদলীর বন, প্রথমটা মনে হয় সেখানে কেউ কলার বাগান করে রেখেচে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মানুষের বসতি নিকটে কোথাও নেই, ওগুলি পাহাড়ী বনকলার গাছ।

পরে এই পাহাড়ী কলা খেয়ে দেখেচি, অনেকটা বাংলাদেশের দয়া কলার মতো বীচি-সর্বস্ব। তেমন সুমিষ্টও নয়। বাড়বাকুণ্ড স্থানটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, গরম জলের সঙ্গে সধূম অগ্নিশিখা বার হচ্চে, জলে ও আগুনে ভীষণ গন্ধকের গন্ধ। পাণ্ডাঠাকুরেরা নিজেদের সুবিধের জন্তে জায়গাটা বাঁধিয়ে রেখেচে—যাত্রীরা গিয়ে দাঁড়ালেই তারা নানারকমে পয়সা আদায় করবার চেষ্টা করে, আমাকেও তারা ঘিরে দাঁড়ালো।

আমি বললুম—আমি যাত্রী নই, পথিক, পুণ্য করতে আসিনি, দেখতে এসেচি।

তারা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন অদ্ভুত কথা যেন জীবনে কোনোদিন শোনেনি।

বললে—কোথা থেকে আসচেন ?

—কলকাতা থেকে—

—হিন্দু না খ্রীষ্টান ?

—হিন্দু।

একটি অল্পবয়সী পাণ্ডাঠাকুর আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমি সস্তায় আপনার কাজ করিয়ে দেবো—পাঁচসিকে পয়সা দেবেন আমায়। আমি বড় গরিব, বাবা মারা গিয়েচেন আজ দুবছর হল, সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেচে। আমায় যা দেবেন, তাই নেবো।

ছেলেটির ওপর মমতা হল। আমি বললুম—বেশ, তোমায় আমি একটা টাকা দেবো—কিন্তু কোনো কাজকর্ম করার দরকার নেই আমার। তোমার প্রণামী স্বরূপ টাকাটা নাও—

ও বললে—আমার বাড়ি এবেলা খেয়ে যান—দুপুর ঘুরে গেল, না খেয়ে গেলে কষ্ট হবে।

দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরের ঘরবাড়ি দেখবার আগ্রহেই আমি তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। পাহাড়ের একপাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র মূলী-বাঁশের ঘর, তারই একখানাতে সে আর তার বিধবা মা বাস করে।

আমি যেতে ওর মা বার হয়ে এসে হাসিমুখে আমার জন্যে একখানা মোটা বুনুনির শীতল-পাটি পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে একটা টাকা তাঁর পায়ে রাখলুম।

পাণ্ডাঠাকুরের মায়ের খাঁটি দেহাতী চাটগাঁয়ে বুলি আমার পক্ষে ভীষণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

তিনি বললেন—বাবা, তুমি কি চা-পানি খাও ?

—না মা, এত বেলায় আর চা খাব না।

—আমাদের বাড়ি চা নেইও। যদি অসুবিধে হয় তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতাম, তোমরা কলকাতার লোক কিনা, চা না খেলে হয়তো কষ্ট হতে পারে, তাই বলচি।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, চা খেয়ে আমি সীতাকুণ্ড থেকে রওনা হয়েচি সকালে, এখন না খেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তারপর আহারের ব্যবস্থা।

আমি নগদ একটাকা প্রণামী দিয়েচি বলে আমার খাতির করতে তাঁরা বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়লেন—কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অনেক চেষ্টাতেও কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। কিছু পরেই সে কথা বুঝলুম।

খাবার এল ভাত আর ডাল, এর সঙ্গে আর কোনো ভাজাভুজি পর্যন্ত নেই। আমি প্রথমে ভাবলুম ডাল দেবার পরে আরও কিছু দেবে। এদেশে তাই করে থাকে। ডালই এদেশে একটা পৃথক তরকারির মধ্যে গণ্য।

বরিশাল থেকে শুরু করে কক্সবাজার পর্যন্ত দেখেচি সর্বত্র এই একই নিয়ম।

প্রথমে বরিশালে যেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে বসেচি, শুধু দিয়ে গেল ভাত আর এক বাটি ডাল, তখন আমি তো অবাক। অতিথিকে শুধু ডাল দিয়ে ভাত দেওয়ায় আমি প্রথমটা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারিনি, কিন্তু তারপর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবার পরে অন্যান্য অনেক ব্যঞ্জন একে একে আসতে শুরু করলে। এখানে অবিশ্যি তা হল না।

ডালের পরে অন্য কোনো ব্যঞ্জন এসে পৌছলো না দেখে শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল।

সন্ধ্যার দিকে আবার বাড়বাকুণ্ড থেকে চন্দ্রনাথের পথে উঠলুম।

আসবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের মা আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন, পুনরায় আসতে বার বার অনুরোধ করলেন। দেখলুম, তিনি এমন খুশী, যেন খুব একজন বড়লোক যজমান পেয়ে গিয়েছেন, এবার থেকে যেন তাঁর সকল দুঃখ ঘুচবে। কষ্ট হল ভেবে যে এই দরিদ্র পরিবার আমার কাছে যে আশা করেচেন, আমার দ্বারা তা কতটুকু পূর্ণ হবে! হায়রে মানুষের আশা।

সন্ধ্যার কিছু পরে সীতাকুণ্ড গ্রামে ফিরে এসে দেখি আমি যাঁর সঙ্গে এসেছিলুম, তিনি জরুরী চিঠি পেয়ে চাটগাঁ চলে গিয়েচেন। আমায় আরও তিনদিন এখানে থাকতে বলেচেন, তিনি আবার আসবেন তিনদিন পরে। পাণ্ডাঠাকুর আমাকে যত্ন করে ভালো বিছানা পেতে দিয়েচে বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে।

আমি যেতেই বললে, বাবু, আপনার জন্যে চায়ের জল চড়ানো রয়েচে, বসুন বেশ আরাম করে। আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েচি, বাবুর সামনে বেরুবে, কথা বলবে, তাতে কি! উনি তো আমাদের যজমান, বাড়ির লোক।

আমি বললুম—ঠিক, উনি তো মায়ের মতো। আমার সামনে আসবেন, এ আর বেশি কথা কি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়েস তেইশ চব্বিশ, একহারা গৌরবর্ণা মেয়ে। মোটা লালপাড় শাড়ি পরনে। আমার চাটগাঁয়ের বুলিতে যা বললেন তার মর্ম এই যে, আমি রাত্রে ভাত খাই, না রুটি খাই?

আমি বললুম—যা-ইচ্ছে করুন মা, আমার খাওয়ার কিছু বাঁধাবাঁধি নেই।

আর কিছু না বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। যেন কত সঙ্কুচিত, লজ্জিত হয়ে আছেন নিজেদের আতিথ্যের ত্রুটির জন্যে। বাড়বাকুণ্ডতে দেখেচি, এখানেও দেখলুম এই সব দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরেরা অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র। সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে বলে এরা নিতান্ত অনাড়ম্বর, সরল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর এরা রাখে না। একটু পরেই সেটা কি চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছিল পাণ্ডাঠাকুরের কথাবার্তার মধ্যে।

রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা এ অঞ্চলে সব জায়গায় যেমন দেখেচি তেমনি।

প্রথমে শুধু ভাত আর এক বাটি ডাল। অন্য কিছুই নেই এর সঙ্গে।

ডাল দিয়ে মেখে কিছু ভাত খাওয়ার পরে এল বেগুন ভাজা। শুকনো ভাত দিয়ে বেগুন

ভাজা খেতে হবে। তারপর শুঁড়ি কচুর তরকারি, কিন্তু তাতে এত সাংঘাতিক ঝাল দেওয়া যে আমার পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব হল না। খাওয়ার পর্ব এখানেই শেষ।

রাত্রে পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে বসে নানারকম কথা বলছিলেন। আমি কলকাতা থেকে যখন এসেছি, তখন তাঁদের কাছে যেন কোনো অদৃষ্ট-পূর্ব জীব। কলকাতায় যারা বাস করে, তারা সবাই খুব বিদ্বান্ আর খুব ধনী। বোধ হয় আমি কোনো ছদ্মবেশী ক্রোড়পতি হবো।

আমায় বললেন, আপনি কলকাতায় কোন্ জায়গায় থাকেন ?

—শেয়ালদ'র কাছে।

—কোথায় কাজ করেন বাবু ?

—কেশোরাম পোদ্দারের আপিসে।

—কতটাকা মাইনে পান ?

—তিনশো টাকা।

কথার মধ্যে সত্য ছিল না। মাইনে পেতুম পঞ্চাশ টাকা।

—বাবু বেশ বড়লোক।

আমি বিনীত হাস্যের সঙ্গে মাথা নীচু করে রইলাম।

—বাবুর কি কলকাতায় বাড়ি ?

—হুঁ।

—ক-খানা বাড়ি আছে ?

—তা আছে খান পাঁচেক। ভাড়াও পাই মাসে মাসে প্রায় তিনশো টাকা।

—উঃ!

আমার মুখে পুনরায় লজ্জা ও বিনয়ের হাস্যরেখা ফুটে উঠলো।

—বাবু, আপনি যখন আমার বাড়ি এলেন, তখন আপনার চাল-চলন ধরন-ধারন দেখে আমার স্ত্রী বলেছিল, এই বাবু খুব বড়লোকের ছেলে। আমরা বাবু, দেখলেই মানুষ চিনতে পারি।

সে বিষয়ে অবিশ্যি কোনো সন্দেহ রইল না।

—বাবু, আপনি বিয়ে করেছেন ?

—ওঃ, কোন্ কালে। তিন চারটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেল।

—তাহলে খুব অল্প বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল ?

—হাঁ, তখন আমার বয়স আঠারো। আমার শ্বশুর একজন বড়লোক। কলকাতায় মস্ত ব্যবসা।

—তা তো হবেই বাবু, তা আপনি যখন আমার যজমান হলেন, যদি কখনো কলকাতায় যাই, আমার একটা থাকবার জায়গা হল।

—নিশ্চয়। আমার বাড়িতে গিয়েই দয়া করে উঠবেন।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কথায় খুশী হয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওগো শোনো, বাবু কি বলচেন।

আমি বিপদে পড়লুম, মেয়েদের কাছে বাজে কথা বলি কি করে? কিন্তু ভগবান আমায় সে-বার দায় থেকে মুক্ত করলেন; পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী এসেই আমাকে বললে, আপনি যদি কাল কুমারী পূজো করেন তবে আমায় বলবেন, আমি যোগাড় করে রেখে দিয়েচি দুজনকে।

আমি বললুম, কাল আমি বাড়িয়াডাল যাবো, ওদিকের পাহাড় আর জঙ্গলগুলো দেখে আসি, কাল আমার দরকার হবে না।

এদের আমার বড় ভালো লেগেছিল। অত্যন্ত সরল এরা, যা বলেচি, সব এরা বিশ্বাস করে নিয়ে খুশী হয়ে উঠেচে।

প্রতিদিন বেলা পড়লে আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলায় একটি ঝরনার ধারে বেড়াতে যেতুম। সন্ধ্যাবেলায় স্থানটি একটি অপরূপ শ্রী ধারণ করতো। গাছপালার শ্যামলতা, বনকুসুমের শোভা, সম্মুখের শৈলশ্রেণীর গম্ভীর উন্নত সৌন্দর্য, বনের পাখীর ডাক, ঝরণার কুলু-কুলু শব্দ—আর সকলের ওপরে স্থানটির নিবিড় নির্জনতা আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে যেতো সেখানটিতে।

চুপ করে বসে থাকবার মতো জায়গা বটে।

দুঘণ্টা বসে থেকেও আমার যেন তৃপ্তি হত না। সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর পর্যন্ত, ঝরনাটার ওপরে একটা ছোট কাঠের পুল আছে সেখানে বসে থাকতুম।

কোনো স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার একটি বিশেষ টেকনিক আছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি সে টেকনিক অর্জন করেচি, তাতে হয়তো অপরের উপকার নাও হতে পারে। আমার মনে হয় প্রত্যেক প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের টেকনিক নিজেই আবিষ্কার করেন।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতি-রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে।

সে সব চিন্তার সঙ্গে কখনোই পরিচয় ঘটে না লোকালয়ের ভিড়ে।

এমন কি, সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট মেটে জ্যোৎস্না উঠে সে বনপর্বতের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে তুলতো, কি একটা বনফুলের সুবাস ছড়াতো বাতাসে, মনে হত সমগ্র পৃথিবীতে আমি ছাড়া যেন আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, সমস্ত পৃথিবী আমার, গোটা তারাভরা আকাশটা আমার। অলস স্বপ্নাতুর মনের অবকাশ-ভরা এক-একটি দিন, এক-একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা, যেন সহস্র সহস্র বর্ষজীবী কোনো দেবতার জীবনে এক-একটি পল বিপল।

অন্য সময়ে সেখানে কখনো যাইনি, যেতুম শুধু সন্ধ্যাবেলা—যখন সে পথে লোক চলাফেরা করতো না, মানুষজনের কণ্ঠস্বর কোনোদিকে শোনা যেতো না।

একদিন সেখানে বসে আছি, এমন সময়ে পথের দিকে কাদের কথাবার্তা শোনা গেল।

চেয়ে দেখি কয়েকজন লোক লণ্ঠন জ্বেলে এইদিকেই আসচে। তাদের হাতে বড় বড় লাঠি।

আমাকে দেখে বিস্ময়ের সুরে বললে—এখানে কি করেন বাবু এত রাত্রে ?

আমি বললুম—এই বসে আছি।

তারা দস্তুরমত অবাক হয়ে গেল। বললে—এখানে একা বসে আছেন। বাড়ি কোথায় বাবুর ?

—কলকাতায়—

—আমরাও তাই ভেবেচি, বিদেশী লোক।

—কেন বল তো ?

—বাবু, এখানকার কোনো লোক এখানে এই সময় একা বসে থাকবে ? বিদেশী লোক আপনি, কিছুই জানেন না, তাই দিব্যি বসে আছেন। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বড় বাঘের ভয়। বিশেষ করে এই যে ঝরনার ধারে আপনি বসে আছেন, সন্ধ্যার পরে বাঘে এখানে জল খেতে নামে। প্রতি বছর দু-তিনটি মানুষকে বাঘে নিয়ে থাকে চন্দ্রনাথে। আপনি এখন আমাদের সঙ্গে চলুন—

—কোথায় যাবেন আপনারা ?

—আমরা চন্দ্রনাথের মন্দিরে আরতি করতে যাচ্চি, এই দেখুন আমরা চারজন লোকে আলো নিয়ে লাঠি নিয়ে যাচ্চি—রাত্রে ফিরবো না। সকালে পাহাড় থেকে নেমে আসবো—আপনিও চলুন, একা গাঁয়ে যাবেন না এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলুম। বন পাহাড়ের নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায় ! তবে আমি ওদের বললুম, যাঁর বাড়ি উঠেচি, সন্ধ্যার পরে না ফিরলে তিনি খুব ভাববেন। তারা বললে—আপনার কোনো বিপদ ঘটলে তাঁকে আরও বেশি ভাবতে হবে, আপনি চলুন। ওদের সঙ্গে উঠতে উঠতে একবার পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম—দূরের সমুদ্র জ্যোৎস্নালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায়, সমুদ্র বলে মনে হয় না, সমুদ্র হতে পারে, মাঠও হতে পারে।

সেই বিশাল বনস্পতিদের তলা দিয়ে পথ, জ্যোৎস্নার আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি, রীতিমত অন্ধকার।

আর, কি জোনাকির মেলা ! অন্ধকারে বনের মধ্যে জোনাকির এমন ঘোরাফেরা, এমন ওঠানামা, এমন মেলা আর কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ জোনাকির সে কি বিচিত্র সমারোহ ! আরণ্য প্রকৃতিকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি এই ধরনের অন্ধকার রাত্রে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে যদি অরণ্যের নৈশরূপ না দেখে থাকেন, তবে তিনি একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত আছেন জীবনে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর শাখাপ্রশাখার অন্ধকার চন্দ্রাতপ, মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। সে আকাশকে ঠিক তারা-ভরা বলা চলে না, কারণ, জ্যোৎস্নালোকে নক্ষত্রের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গিয়েচে। তবুও বহু নক্ষত্র দেখা যায় ডালপালার ফাঁকে।

মাঝে মাঝে মূলী বাঁশের বন। নৈশ বাতাসে বাঁশপাতার মধ্যে সরসর শব্দ। রাত-জাগা কি পাখীর ডাক বাঁশবনের মগডালের দিকে। মাঝে মাঝে দূরের সমুদ্র দেখা যায়—এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যায় জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষ, তবে সন্দীপের তীররেখা চিনে নেবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথের মন্দিরে আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির—এখান থেকে একটা দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখলুম এই রাত্রে। মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালার ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েচে কত নীচে, জ্যোৎস্নামণ্ডিত বনঝোপের মাথাগুলি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়—তারপর নৈশ-কুয়াশায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে।

মনে হয় আমি একা আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পৃথিবীটা—জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র, শৈলশ্রেণী। মন্দিরের চারপাশে বারান্দাতে বসে রইলুম অনেক রাত পর্যন্ত।

চাঁদ অস্ত গেলে আমার পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ভরে গেল।

সে রকম গম্ভীর দৃশ্য দেখবার সুযোগ জীবনে বেশিবার আমার ঘটেনি—দেখে বুঝেছিলাম মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে আরণ্য-প্রকৃতির অন্ধকার রূপ কোনো উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে বসে দেখে, নতুবা সে বুঝতে পারবে না বিশ্বপ্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য।

মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে আমরা শুয়ে রাত কাটাই।

রাত্রে আমার' ভালো ঘুম হল না—একটা বিরাট শৈলারণ্যের মধ্যে আমি শুয়ে আছি এ চিন্তাটা মন থেকে ঘুমের ঘোরেও গেল না, কতবার মনে হয়েচে জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থাকি।

নামবার পথে একটা পাহাড়ী ঝরনায় হাতমুখ ধুয়ে নিলাম।

বড্ড শিশির পড়েচে সারারাত ধরে গাছপালায় বনঝোপে। টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়চে, প্রভাতের সূর্যালোক মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধানো সোপানশ্রেণী ওপর আলোছায়ার জাল বুনচে।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ি এসে দেখি—যা ভেবেচি তাই।

তাঁরা কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমার খোঁজাখুঁজি করেচেন। গ্রামের আট-দশজন লোক একত্র হয়ে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পাহাড়ের তলায় পর্যন্ত এসে অনুসন্ধান করেচেন। আজ সকালে থানায় খবর দেবার আয়োজন করচেন। আমার আকস্মিক অন্তর্ধানে গ্রামের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েচে। তবে শেষ পর্যন্ত অনেকে নাকি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে হঠাৎ কোনো কাজে হয়তো চাটগাঁয়ে চলে গিয়েচি।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি কোথায় ছিলুম, রাত্রি কোথায় কাটালুম—ইত্যাদি।

আমি রাত্রের ঘটনা বলতে ওরা সবাই মিলে, যারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দোষ দিতে লাগলো। না জানিয়ে তাদের এ রকম নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি পাহাড়ের ওপরে।

আমি বললুম—কেন, বাঘ ?

পাণ্ডাঠাকুর বললে—সেকথা কিন্তু ঠিক। বাঘের ভয় বিলক্ষণ আছে ওখানে। আপনি যে সন্ধ্যার সময় ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে বসে থাকবেন তা আমি কি করে জানবো ? আমি ভেবেচি আপনি ইস্টিশানে বেড়াতে যান সন্ধ্যাবেলা ট্রেন দেখবার জন্তে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী আমায় বললেন এর পরে—আমি আপনার জন্তে ভাত রেঁধে কত রাত পর্যন্ত বসে রইলুম। শেষে রাতে ঘুমুতে পারিনি আপনার কি হল ভেবে।

এতগুলি নিরীহ লোক আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যে রাত কাটিয়েচে আমার জন্তে এবং আমিই এ জন্তে মূলত দায়ী, এতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত হলুম।

সেদিন দুপুরের ট্রেনে আমি পরের স্টেশনে নেমে বারিয়াডাল রওনা হই।

শুধু বারিয়াডাল নয়, পায়ে হেঁটে এই সময় আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর অনেক অংশ দেখে বেড়িয়েছিলুম। বারিয়াডাল একটা গিরিবর্ত্ম, পাহাড়শ্রেণীর যেখানটাতে নীচু খাঁজ, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড় টপকে ওপারে নেমে গিয়েচে।

বারিয়াডাল অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় ঝরনা ও সহস্রধারা নামে জলপ্রপাত আছে।

আমি সহস্রধারা দেখবার সুযোগ পাইনি—কিন্তু শৈলশ্রেণীর অনেক অংশে প্রায় তিনদিন ধরে ঘুরেছিলুম।

একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই শৈলমালা ও অরণ্যের সম্বন্ধে। বাংলাদেশের মধ্যে এমন পাহাড় ও বনের শোভা আর কোথাও নেই। এই বনের প্রকৃতি যেরূপ, আসাম ছাড়া ভারতের কুত্রাপি এ ধরনের বন দেখা যাবে না।

বারিয়াডাল পার হয়ে পাহাড়ের পূর্বে সানুতে এসে বনের শোভা আরও চমৎকার লাগলো। এত বড় বড় ঝোপ, আর বড় বড় লতা চন্দ্রনাথ তীর্থ যেদিকে, সেখানে নেই। এদিকে খুব বড় বড় গাছ যেমন দেখচি, আমার মনে হয় আরাকান-ইয়োমার জঙ্গলেও অত বড় বড় গাছ নেই। গাছের গুঁড়িগুলো সোজা উঠেচে অনেকদূর, যেন কলের চিমনির মতো। একটা গাছের কথা আমার মনে আছে। শিমুল গাছের গুঁড়ির মতো তিন দিকে তিনটি বড় বড় খাঁজ, এক একটা খাঁজের মধ্যে এতটা জায়গা যে সেখানে এক একটি ছোটোখাটো পরিবারের রান্নাঘর হতে পারে। এই জাতীয় গাছ চন্দ্রনাথ পর্বত ছাড়া অন্ত কোথাও দেখিনি—বা এখানে যত অপরিচিত শ্রেণীর গাছ দেখেচি, এমনটিও বাংলাদেশের আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না।

এবার একটি beauty spot-এর কথা বলি।

স্থানটি আমার আবিষ্কার, এর বিবরণ কারো মুখে আমি শুনিনি বা কেউ কোথাও লেখেনি। বারিয়াডাল ছাড়িয়ে সাত মাইল উত্তরপূর্ব দিকে পাহাড়ের তলায় তলায় গেলে আওরঙ্গজেবপুর বলে একটা গ্রাম পড়ে। গ্রামটিতে মুসলমানের বাস, হিন্দু আদৌ নেই। আমি যে জায়গাটির কথা বলচি, আওরঙ্গজেবপুর থেকে সেটা আড়াই মাইল কি তিন মাইল দূরে দুটি পাহাড়ের মধ্যে।

আওরঙ্গজেবপুরের মুসলমান গৃহস্থদের অতিথিবৎসলতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজ-

কালকার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যুগে চোদ্দ পনেরো বৎসর পূর্বেকার সে কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়।

এই গ্রামটির পথের ওপর একটা গাছতলায় দুপুরে বসে বিশ্রাম করছিলাম! সারা সকাল লেগে গিয়েছিল বারিয়াডাল থেকে এতদূর আসতে। বনজঙ্গল অঞ্চল, কোথাও খাবারের দোকান নেই, কিছু পাওয়াও যায় না, সকাল থেকে কিছু খাইনি।

কাছেই গ্রাম দেখে সেখানে ঢুকলাম, মুড়ি বা চিঁড়ের সন্ধানে। প্রথমেই একটি লুঙ্গিপরা প্রৌঢ় মুসলমান গৃহস্থের সঙ্গে দেখা। তার ভাষা উৎকট দেহাতী চাটগেঁয়ে। আমার কথার উত্তরে প্রথমেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আমায় সেলাম করলে, তারপরে বললে—বাবু কোথা থেকে আসচেন?

তার ভদ্রতা আমায় যেন লজ্জা দিলে। সে আমায় শিষ্ট নমস্কার জ্ঞাপন করলে, আমি তো করলুম না! গ্রাম্য লোক শিষ্টাচারে আমাকে হারিয়ে দিলে।

আমার পরিচয় শুনে সে আমায় তার বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের প্রকাণ্ড মুলী-বাঁশের ছাউনি বড় আটচালা ঘর, দাওয়াতে নিয়ে গিয়ে পাটি পেতে বসালে। গ্রামের আরও চার পাঁচজন মাতব্বর লোক এসে আমায় ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগল। আর কি সব সরল প্রশ্ন!

—বাবু, ইদিকে কেন আসচেন, জঙ্গল কিনবেন না কি?

—না, বেড়াতে এসেচি তোমাদের দেশে।

—তা বাবু, আপনাদের কলকাতা তো খুব বড় শহর, এখানে কি দেখবারই বা আছে আপনাদের উপযুক্ত!

—কলকাতা দেখা আছে নাকি?

দুজন নীল লুঙ্গি পরা লোক পেছন দিকে বসে ছিল, তাদের দেখিয়ে একজন বললে—এরা বাবু সব জায়গায় গিয়েচে, বম্বে, বিলেত, জাপান—

আমি তো অবাক। বললুম—এরা কি করে গেল?

তখন পেছনের লোক-দুটি বললে—বাবু, আমরা জাহাজে কাজ করি। আমাদের এই গাঁয়ের বারো আনা লোক জাহাজ আর স্টীমারের খালাসী। আমরা এখন ছুটিতে আছি তিন মাস বাড়ি থাকবো, তারপর আবার কলকাতায় গিয়ে জাহাজে উঠবো।

ওদের সঙ্গে বসে অনেক কথা হল। সত্যিই দেখলুম অনেক দেশ বেড়িয়েচে ওরা। রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, জাপান—এমন কি লণ্ডনের কথা পর্যন্ত ওদের মুখে শোনা গেল।

খানিকটা গল্প-গুজবের পরে ওরা বললে—বাবুর এবেলার খাওয়া-দাওয়া?

—অমনি কিছু মুড়ি বা চিঁড়ে কিনে—

—সে কি কথা, তা হবে না, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সব দেবো, আমাদের গ্রামে এখন আপনি দুদিন থাকুন না! একখানা ঘর দিচ্চি আপনাকে—

আমার কোনো আপত্তি ওরা শুনলে না। রান্নার যোগাড় ওরা করে দিলে। আবার এমন ভদ্রতা, আমি বললুম রান্না করবার আমার দরকার নেই, ওদের রান্না খেতে আমার

আপত্তি নেই—তা ওরা শুনলে না। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ—কেন তারা আমার সামাজিক প্রথার ও আচারে একদিনের জন্যে হস্তক্ষেপ করবে? ওরা রেঁধে দেবে না। আমাকেই রান্না করতে হবে।

আওরঙ্গজেবপুর হতে বের হয়ে আমি যদৃচ্ছাক্রমে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেই অপূর্ব স্থানটিতে এসে পড়লুম।

একদিকে পাহাড়, একদিকে বন, পাহাড় থেকে বন নেমে এসেচে যেন সবুজ জলস্রোতের মতো, একটা অবিচ্ছিন্ন সবুজের প্রবাহের মতো উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যের উল্লাসে নৃত্যশীল সাগরোর্মির মতো।

তারই মধ্যে অনেকগুলি পত্রবিহীন অদ্ভুত ধরনের গাছ—তাদের ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেমন যেন আলুথালু ছন্নছাড়া অবস্থায়, নটরাজ শিবের নৃত্যভঙ্গির মতো।

এক রকম লতা উঠেচে গাছপালার সর্বাঙ্গ বেয়ে, তাদের মগডাল পর্যন্ত সাদা সাদা ফুলে লতাগুলো ভর্তি—গাছের মাথা সেই সাদা ফুলে ছাওয়া। একদিকে একটা ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী ঝরনা সেই অপূর্ব বনভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে, ছোটবড় শিলাখণ্ড বিছানো অগভীর পথে। তার দুধারে জলের ধারে ধারে ফুটে আছে রাঙা বন-করবী।

আমি কতক্ষণ সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে দেখেও যেন দেখবার পিপাসা মেটে না। গাছপালা, পুষ্পিত লতা, বনভূমি, দীর্ঘ শৈলমালা ও ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী—সব নিয়ে একটা অতি চমৎকার ছবি, এ ছবির কি একটা অস্ফুট রহস্যময় ভাষা আছে, খানিকটা বা বোঝা যায়, খানিকটা যায় না।

বিকেলে বেশ ছায়া পড়ে এসেচে স্থানটিতে—কতরকমের পাখী ডাকচে, বনলতার ফুলের সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাতাসে। এখানে হঠাৎ যদি কোনো বনদেবীকে আবির্ভূতা দেখতুম, তবে যেন তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, এখানে তো তাঁরা নামতেই পারেন, লোকালয়ের বাইরে এই বিহগকূজিত নির্জন বন-প্রান্তেই তো তাঁদের আসন।

সন্ধ্যার পূর্বে সেখানে থেকে আবার আওরঙ্গজেবপুরে চলে এলুম।

এরা থাকে যে গ্রামে, বাইরের খবর সেখানে যথেষ্ট পৌছোয় অন্য অনেক গ্রামের চেয়ে, কারণ এ গ্রামের অধিকাংশ লোক কাজ করে বাইরে। জাহাজে স্টীমারে চড়ে তারা অনেক দূরের সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েচে বহুবার।

শৈলপাদমূলের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে বসে তাদের মুখে জাপানের, লণ্ডনের, সিংহলের অনেক গল্প শুনলুম। ওরা সে রাত্রে আমার জন্যে একটা খাসি ছাগল মারলে। যার বাড়ি ছিলুম, সে তার অনেক প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করলে ওর বাড়িতে।

আমাকে আলাদা রান্না করতে হল—কিছুতেই ওরা ওদের রান্না আমায় খেতে দিতে রাজি হল না। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ খালাসী ছিল, তার নাম আবদুল লতিফ ভূঁইয়া। আবদুলের বয়স নাকি একানব্বুই বছর, অথচ তার চুলদাড়ি এখনও সব পাকেনি। দেখলে পঞ্চাশ কি

বাট বলে মনে হয় তার বয়স। সে আগে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে মাল্লার কাজ করেচে এখন তার নাতি সমুদ্রে বার হয়, সে বাড়ি বসে চাষবাস দেখে।

আমি তাকে বললুম—আবদুল, তুমি বিলেত গিয়েচ?

—ও! বিলেতে তো ঘরবাড়ি ছিল।

—কোথায় থাকতে?

—সেলরস্ হোম আছে আমাদের জন্য। সেখানেই থাকতুম।

—কেমন জায়গা?

—উঃ, পরীর দেশ বাবু, মেয়েমানুষ তো নয়, যেন সব পরী।

—মিশতে ওদের সঙ্গে?

—বাবু, ওসব দেশের তারা আপনি গায়ে এসে পড়ে। তাদের এড়িয়ে আসা যায় না।

তারপর সে তার ডজনখানেক প্রণয়কাহিনী আমার কাছে বলে যেতে লাগলো। লোকটির অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত, তার সঙ্গে একটি মেমের নাকি বিয়ে হয়। দু বছর তাকে নিয়ে ও ইংলণ্ডের কোনো একটা গ্রামে ছিল, গ্রামের নাম উইটেনহ্যাম। নামটা আবদুল বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল, যদিও ইংরিজি কিছুই জানে না সে। আমি বললুম, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাষায় কথা বলতে?

—ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলতুম, আর হাত নেড়ে পা নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতুম।

—কি করে চালাতে সে গাঁয়ে? চাকরি করতে?

—না বাবু, জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়াতুম, মাঝে মাঝে আপেল বাগানে চাকরিও করেচি। উইটেনহ্যামে অনেক আপেল বাগান ছিল। বেশ জায়গা বাবু—

—তোমার স্ত্রী বেশ ভালো ছিলেন নিশ্চয়ই—

—ভালো মানুষ ছিল আর খুব ছেলেপুলে ভালোবাসতো। আমার যত্ন করতো খুবই। আমায় বলতো, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও, কি রকম দেশ দেখবো—

—এনেছিলে নাকি?

—আনতাম হয়তো, কিন্তু বাবু সে দু-বছর পরে মরে গেল। আমার কিছু ভালো লাগলো না, সেখানে থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা দেশে চলে এলুম। সে বাঁচলে উইটেনহ্যামেই বরাবর থাকতুম হয়তো। আপেলের বাগান করবার বড্ড শখ ছিল—

—আচ্ছা এসব কতদিন আগের কথা হবে?

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা বাবু, কি তারও আগের কথা। উইটেনহ্যামে একবার ধুমধাম হল, গির্জার গান বাজনা হল, শুনলাম নাকি মহারানীর কত বছর বয়স হল, সেই জন্যে ওরকম হচ্ছে। মহারানী তখন বেঁচে—কি ধুমধাম হল পাড়াগাঁয়ে!

আবদুল লোকটা ভিক্টোরিয়ান যুগের লোক, মহারানীর ডায়মণ্ড জুবিলী দেখে এসেচে বিলেতে বসে। কিন্তু ওকে দেখে কে ভাববে সে কথা! আবদুল এখন পাহাড়ের ধারের

ধানের ক্ষেতে ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে বসে পাহারা দেয় আর শীতলপাটি বোনে। বয়স হল এত, তবু সে বসে থাকে না।

আওরঙ্গজেবপুর গ্রামে সবই মুসলমান। আমার বড় ভালো লেগেছিল ওদের, আমাকেও বড় পছন্দ করতো ওরা। যেদিন আসি, অনেক গ্রাম ছেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত এসে আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল।

পথ বেয়ে চলেচি। এবার দেখলুম পাহাড়ের নীচে মাঝে মাঝে অনেক গ্রাম পড়ে এ দিকটাতে। পাহাড়ই এসব গাঁয়ের একটা বড় সম্পদ। পাহাড় জোগায় জ্বালানি কাঠ, ঝরা-পাতা; ঝরনা জোগায় জল; তা ছাড়া পাথর কুড়িয়ে এনে এরা ঘরবাড়ির দেওয়াল করেচে, রোয়াক করেচে।

লম্বা টানা চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায় বড় সুন্দর। বনের শোভাও অদ্ভুত। মনে হয় এ একটা আলাদা জগৎ। যারা এ বনের কোলে গ্রামে বাস করে, এর বিচিত্র বৃক্ষলতার সমাবেশ, বনফুলের শোভা, পাখীর ডাক, ঝরনার কলতানের মধ্যে যাদের শৈশব কেটেচে, তারা একটা বড় সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতাকে লাভ করেচে জীবনে।

তবে মাঝে মাঝে বাঘ আসে এ অভিযোগ সকল গ্রামেই শুনেচি। শীতকালের দিকে বেশি বার হয়, গোরু ছাগল ভেড়া তো নেয়ই, মানুষ পেলেও ছাড়ে না।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার পরে পাহাড়ে ওঠা-নামা বা জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। ভূত আছে, অপদেবতা আছে, আরও কত কি আছে। সন্ধ্যার পরে এরা প্রাণান্তেও পাহাড়ে যাবে না।

এখানকার এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ি মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। স্থানটি ফেণী সবডিভিসনের অন্তর্গত ধুম স্টেশন থেকে পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে। এদের দেশে ভোজের পূর্বে ফল ও মিষ্টান্ন খেতে দেয়, তারপর আনে লুচি, তারপরে ভাত আর তরকারি। মেয়ের বিয়ের ভাত খাওয়ায়, এ অন্য কোথাও দেখিনি।

ধুম স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ে চলে এলুম আখাউড়া।

এক সময়ে এ অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—বিশাল সমতলভূমি ক্রমশ নীচু হতে হতে সমুদ্রের জল ছুঁয়েচে। ধানের সময় মনে হয় সবুজের সমুদ্র গোটা দেশটা।

আখাউড়া থেকে আগরতলা মাইল পাঁচ ছয় দূরে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অনেকদিন ধরে দেখবার বড় শখ ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলচি, তখন মোটর বাস হয়নি, আখাউড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আগরতলা গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা প্রায় দশটার সময়।

কোথায় গিয়ে উঠবো কিছু ঠিক ছিল না, গাড়িতে একজন বলেছিল বিদেশী ভদ্রলোক গেলে মহারাজার অতিথিশালায় উঠতে পারে। আমার দেখবার ইচ্ছে হল; সে ব্যাপারটি কি রকম একবার দেখতে হবে। শুনলুম মহারাজের দপ্তরের কোনো একজন কর্মচারীর সই-

করা চিঠি ভিন্ন রাজার অতিথিশালায় থাকতে পারা যায় না। আমি রাজদপ্তরের কাউকে চিনতুম না, তবুও সাহস করে গেলাম এবং কেশোরাম পোদ্দারের প্রদত্ত পরিচয়-পত্র দেখিয়ে সেখান থেকে একখানা টিকিট যোগাড় করে রাজার অতিথিশালায় এসে উঠলুম।

অতিথিশালায় অনেকগুলো ঘর, মুলী বাঁশে ছাওয়া বেশ বড় বাংলো, দুদিকে বড় বারান্দা, পেছনদিকে রান্নাঘর ও বাবুর্চিখানা। দুরকম থাকার কারণ অতিথিরা ইচ্ছামত ভারতীয় খাদ্য ও সাহেবী-খানা দুরকমই খেতে পারেন। প্রত্যেক ঘরে কলকাতার মেসের মতো তিন চারটি খাট পাতা, তাতে শুধু গদি পাতা আছে, অতিথিরা নিজেদের বিছানা পেতে নেবেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। সকালে চা, বিস্কুট, টোস্ট দেয়, দুপুরে ভাত, তিন-চারটি ব্যঞ্জন, মাছ, মাংস ও পোয়াটাক দুধ, রাত্রে অতিথির ইচ্ছামত ভাত বা রুটি। শীতকালে ব্যবহারের জন্যে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

যে ক-জন চাকরবাকর আছে, তারা সর্বদা তটস্থ, মুখের কথা বার করতে দেরি সয় না, তখুনি সে কাজ করবে। তিনদিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে স্টেটের খরচে—তারপর থাকতে হলে অনুমতি-পত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে আনতে হয় রাজদপ্তর থেকে।

প্রকৃতপক্ষে অনেকে সাতদিন আটদিন কি তার বেশিও থাকে, চাকরবাকরদের কিছু দিলে তারাই ওসব করে নিয়ে এসে দেবে।

আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সঙ্গী—আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিজ্ঞেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ অতিথিরূপে। ইনি অদ্ভুত ধরনের মানুষ—একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

অনেক দিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। পরে এঁর কথা আরও বলচি।

আগরতলা ছোট্ট শহর, রাজপথে বেজায় ধুলো, ঘরবাড়িগুলোও দেখতে ভালো নয়—এ শহরের কথা বলবার মতো নয়। আমার ভালো লেগেছিল মহারাজার নতুন প্রাসাদ, ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানার কয়েকটি বন্যজন্তু, 'কুঞ্জবন' প্রাসাদ ও বড় একটা ফুলের বাগান। আর ভালো লেগেছিল সুলেখক ও সুপণ্ডিত কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মনকে। ইনি মহারাজের জ্ঞাতি ও খুল্লতাত, রাজদপ্তরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে সময়ে, বৌদ্ধদর্শন ও ইতিহাসে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক, যখন আমি তাঁর বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে, তখন আমি তরুণ-বয়স্ক, তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বৎসরের কাছাকাছি—কিন্তু আমার সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতো মিশেছিলেন, কত আগ্রহ করে তাঁর বৌদ্ধগ্রন্থের লাইব্রেরি দেখিয়েছিলেন, সে কথা আমার আজও মনে আছে।

মহারাজার নতুন প্রাসাদের বড় ফটকে বন্দুকধারী গুর্খা বা কুকি পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। অনুমতি ভিন্ন কাউকে প্রাসাদ দেখতে দেওয়ার নিয়ম নেই।

একদিন আমি নিঃসঙ্কোচে ছড়ি ঘুরিয়ে সহজভাবে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেলুম, যেন আমি নতুন লোক নই, মহারাজের প্রাসাদে যাতায়াত করা আমার নিত্যকর্ম। কুকি পাহারাওয়ালা

চেয়ে চেয়ে দেখলে কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না, কেন যে সে কিছু বললে না, তা আমি আজও জানিনে।

একাই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লুম—বিভিন্ন ঘর দেখে বেড়ালুম, কেউ কিছুই বললে না। একটা বড় হলঘরে অনেকগুলো বড় বড় বিলিতি ছবি। হল ঘরটিতে সুন্দর সুন্দর কোচ কেদারা পাতা, সুদীর্ঘ ভিনিসিয়ান আয়না দেওয়ালে, সিল্কের কাজ করা পরদা, ভেলভেটে মোড়া গদি, চমৎকার কার্পেট পাতা মেজের ওপর।

একটি ছোট্ট সুন্দরী খুকি ঘরটিতে বসে প্রাইভেট টিউটারের কাছে লেখাপড়া করচে। খুকিটি এত চমৎকার দেখতে! আমি প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে আলাপ করলুম। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়, নামটা আমার মনে নেই, আমার সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল।

তিনি বললেন—আপনাকে দরবার-ঘর দেখাই চলুন। ওখানে সকলকে যেতে দেওয়া হয় না—ঘর বন্ধ থাকে, দাঁড়ান চাবিটা আনিয়ে নিই।

দরবার-ঘরে ঢুকে তার ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এককোণে উঁচু বেদীর ওপর হাতীর দাঁতের সিংহাসন, সোনালী ব্রোকেডের কাজকরা লাল মখমলের গদি মোড়া। পাছে ধুলো-বালি জমে নষ্ট হয় বলে সিংহাসনটি তুলো দিয়ে ঢাকা। দুটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁত সিংহাসনের দুদিকে, দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো। মাস্টার মশায় বললেন, হাতীর দাঁত-জোড়া স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোনো কুকি সামন্তসর্দার রাজদরবারে নজর দিয়েছিল।

—কুকি সামন্তেরা কোথায় থাকে?

—পার্বত্য অঞ্চলে ওদের জায়গীর, মহারাজ ওদের ফিউডাল চিফ, দরবারের সময়ে কুকি সামন্ত সর্দাররা তাদের জাতীয় পোশাক পরে যখন আসে, সে একটা দেখবার জিনিস! ওদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে কত অনুচর আসে। সে সময় থাকেন তো দেখতে পাবেন।

—কতজন সামন্ত আছে?

—ঠিক বলতে পারবো না, তবে পনেরো কুড়ি জনের কম নয়। ওদের অঞ্চল ওরা নিজেদের ধরনে শাসন করে, ওদের নিজেদের আইন ও রীতি-নীতি সেখানে চলে।

বিকেলে আমি 'কুঞ্জবন' প্যালেসের দিকে বেড়াতে গেলুম।

পথে এক জায়গায় একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে মহারাজের। তার মধ্যে Ciret Cat জাতীয় একটি বন্যজন্তু আমার বড় ভালো লেগেছিল।

সেটা দেখতে কতকটা বিড়ালের মত—কিন্তু বিড়ালের চেয়ে অনেক বড়। যতবার গায়ে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায়, ততবার সেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে 'ফ্যাঁচ' করে তেড়ে আসে, খাঁচার লোহার ডাণ্ডার গায়ে মারে এক থাবা। এ যেন তার বাঁধা নিয়ম—যতবার খোঁচা দেওয়া যাবে, ততবার সেটা ঠিক ওই একই রকম ভাবে ফ্যাঁচ করে তেড়ে আসবেই।

তার ওই ব্যাপারটা দেখা শেষকালে আমার এমন ভালো লেগে গেল যে অতিথিশালা

থেকে প্রায় আধ মাইল হেঁটে দু-বেলা আমাকে চিড়িয়াখানা যেতে হত, যে ক-দিন আগরতলা ছিলাম।

'কুঞ্জবন' প্যালেস একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পুরনো আমলের তৈরী বলেই দেখতে ঢের ভালো লাগলো, মার্টিন কোম্পানির তৈরী মহারাজের নতুন প্রাসাদের চেয়ে। কুঞ্জবন প্যালেসের একটা ঘরে অনেক প্রাচীন চিত্র, হাতীর দাঁতের শিল্প, ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি ইত্যা দ ''ছে—এসব খুঁটিনাটি করে দেখতে অনেক সময় গেল।

একটি হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র নারীমূর্তি আমার কি ভালোই লেগেছিল! চার পাঁচ ইঞ্চির বেশি বড় নয়, পুরনো হাতীর দাঁত, হলদে হয়ে গিয়েচে—কি কমনীয়তা আর জীবন্ত লাবণ্য মূর্তিটির সারা গায়ে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। শুনলুম এক সময়ে এখানে হাতীর দাঁতের জিনিস-পত্রের ভালো শিল্পী ছিল। এই ক্ষুদ্র মূর্তিটি কোন্ অজ্ঞাত কারিগরের শিল্পপ্রতিভার অবদান জানিনে, মন কিন্তু তার পায়ে আপনিই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের ছাদ থেকে সূর্যাস্ত দেখে মনে হল এমন একটা সূর্যাস্ত কতকাল দেখিনি!

গোটা আকাশটা লাল হয়ে এল, যেন পশ্চিম দিগন্তে লেগেচে আগুন, তারই ছোঁয়াচে রক্তশিখা সারা আকাশে হালকা সাদা মেঘে আগুন ধরিয়েচে, প্রকাণ্ড আগুনের গোলের মতো সূর্যটা কুঞ্জবন প্রাসাদের পিছনকার ঢেউ খেলানো অনুচ্চ শৈলমালা ও সবুজ অরণ্যভূমির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

যতদূর চোখ যায়, শুধু উঁচুনীচু পাহাড় আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড়; ঘনবনানী-মণ্ডিত রাঙা সরু পথটি বনের মধ্যে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপর একবার উঠে একবার নেমে, কতদূর চলে গিয়ে ওদিকের দিগন্তে মিশে অদৃশ্য হয়েচে।

একদিন আমি একা এই পথে অনেকদূর গিয়েচি, সেও বিকেল বেলা। কুঞ্জবন প্যালেসের চূড়া আর দেখা যায় না, চারিপাশে শুধু বন আর পাহাড়।

একজন টিপ্রাই লোক তীর ধনুক হাতে সে পথে আসচে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম —এদিকে কি দেখবার আছে? গ্রাম্য টিপ্রাই জাতির কথা বোঝা ভীষণ শক্ত। সে কি বললে প্রথমটা ভালো বুঝতেই পারলুম না, তারপর মনে হল সে বলচে, ও দিকে আর যাবেন না সন্ধ্যার সময়।

—কেন?

—বুনো হাতীর ভয়, এই সব বনে এই সময় আসে।

—তুমি কোথায় থাকো?

—ওদিকে আমাদের গ্রাম আছে এই পাহাড়ের ওপারে—

—তীর ধনুক হাতে কেন?

—তীর ধনুক না নিয়ে আমরা বেরুই না, জঙ্গলের পথে নানা উৎপাত।

—আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চল, দেখবো।

—এখন আর সময় নেই, সেখান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—তুমি আমায় পৌঁছে দিও শহরে, বকশিশ দেবো—

লোকটা রাজি হল না। তার অনেক কাজ আছে, সে যেতে পারবে না।

অতিথিশালায় ফিরে দেখি আমার সঙ্গী টেবিলে আলো জেলে কি লেখাপড়া করচেন। এই ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত—কি কাজ করে, কি ভাবে, কি ওর জীবন, এসব জানতে আমার খুব আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিন্তু কোনো কথা সে সব নিয়ে জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না বলে তার নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ইতিপূর্বে করিনি।

আজ হঠাৎ কি জানি কেন বললুম—কি লিখচেন ?

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—একটা রিপোর্ট লিখচি—

—কিসের রিপোর্ট ?

—আমি পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়িয়ে দেখলুম ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। মহারাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করিচি। এমন কি, আমার মনে হয় পেট্রোলিয়ামের সন্ধানও এখানে পাওয়া কঠিন হবে না। সেই সব সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখচি। বসুন আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি থাকা অসম্ভব নয় কেন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন, আমি কিছু বুঝলাম, বেশির ভাগই বুঝলাম না। কেমন করে পৃথিবীর স্তর দুমড়ে বেঁকে উৎসের সৃষ্টি করে, পেট্রোলিয়াম আর কয়লা একই পর্যায়ভুক্ত জিনিস, আরও সব কত কি।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা আমার বড় ভালো লাগলো।

আমি তাঁর বিষয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি, কেবল পূর্বের প্রশ্নটি ছাড়া। তাঁকে দেখে আমার মনে হল লোকটি বৈষয়িক নয়, অর্থোপার্জন এঁর ধাতে নেই, পয়লা নম্বরের ভবঘুরে মানুষ। সে রাত্রে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল।

আমায় তিনি বড়লোক হবার অনেক রকম ফন্দী বাৎলে দিলেন। সামান্য মাইনের চাকরী করে কোনো লাভ নেই। এই সব অঞ্চলের পাহাড়ে কয়লা আছে, পেট্রোলিয়াম আছে, সোনা আছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দিতে পারলে দু বৎসরে ফেঁপে ওঠা যায়। তিনি মহারাজকে ভজিয়ে সত্বর একটা মাইনিং সিন্‌ডিকেট গড়ে তুলবেন, এই আগরতলাতেই তার হেড আপিস হবে, কোনো বড় বিলিতি কোম্পানীর সঙ্গে তিনি চিঠি চালাচালি করবেন এ নিয়ে—ইত্যাদি অনেক কথা।

আমি বললুম—আপনি আর কতদিন আছেন এখানে ?

—তা কি বলা যায় ? কাজ শেষ না হলে তো যাচ্চিনে। এক মাসের কম নয়, দু মাসও হতে পারে।

—কলকাতায় বুঝি থাকেন আপনি?

—সেখানে ছিলাম কিছুদিন। ঢাকাতেও ছিলাম—আরও অনেক জায়গায় ছিলাম। এখানকার কাজ সেরে রেঙ্গুন যাবার ইচ্ছে আছে। আপার বর্মা অঞ্চলে একবার ঘুরে প্রস্পেকটিং করবো। যেতাম এতদিন, শুধু আমার এই শরীরের জন্যে—

—আপনার কি অসুখ?

—হজম হয় না যা খাই। তবু তো আগরতলা এসে অনেক ভালো আছি। দেখেছেন তো কত লেবু খাই, সারাদিনে পনেরো কুড়িটা কাগজি লেবু না খেলে আমার শরীর ভালো থাকে না!

—আপনার দেশ বুঝি কলকাতায়?

এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তিনি আমার অযথা কৌতূহলকে তেমন প্রশ্রয় দিলেন না বলেই মনে হল। অন্য কথা পাড়লেন, আবার সেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য। ধীরভাবে কিছুক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুনবার পরে গেস্ট হাউসের ভৃত্য নৈশ আহারের জন্যে ডাক দিয়ে আমার সে-যাত্রা উদ্ধার করলে।

খেতে গেলে চাকর আমায় বললে, বাবু, আপনি সাহেবের খবর কি জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা ওঁর টিকিট বদলে আনি আপিস থেকে। তিনদিন থাকবার পরে টিকিট না বদলালে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। একটা কথা বলচি বাবু, উনি এতদিন আছেন, কখনও কোনো চিঠি আসেনি ওঁর নামে! কেউ নেই বাবু, থাকলে আর চিঠি দেয় না!

আমি ধমক দিয়ে চাকরটাকে চুপ করালুম। তার অত কথার দরকার কি।

একদিন দেখি ভদ্রলোক গ্যেটের ফাউস্ট-এর ইংরিজি অনুবাদ পড়ছেন। আমায় ডেকে দু-এক জায়গা শোনালেন, গোটে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বায়রন যখন যুবক, গ্যেটে তখন বৃদ্ধ, বায়রনের মতো সুশ্রী তরুণ কবিও প্রেমিক গ্যেটের মনে কি রেখাপাত করেছিলেন প্রধানত সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এই বইখানা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বহুবার পড়েছেন। সর্বদা সঙ্গে রাখেন।

আমি তাঁর টেবিলে 'ফাউস্ট'-খানা পড়ে থাকতে দেখলুম বিকেলেও, তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েচেন। বই দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। বইয়ের পাতাগুলো ময়লা, বাঁধুনি আলগা, এত প্রিয় বই অথচ এমন অযত্নে রেখেছেন কেন? হাতে পয়সা থাকলে কি আর বই বাঁধাতেন না?

বড় দরের কবিকে ভালোবাসে, এমন লোক দুজন দেখলুম আমার ভ্রমণের মধ্যে, বরিশালের সেই শেক্সপিয়ারের ভক্ত ভদ্রলোক, আর ইনি। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বড় তফাত রয়েছে, বরিশালের সে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল, এমন কি তাঁকে ছোটখাটো জমিদার বলা চলে, কিন্তু ইনি একেবারে নিঃসম্বল। অথচ কি অদ্ভুত কাব্যপ্রিয়তা! বড

রাত্রেই ফিরতেন, তাঁকে দেখতাম 'ফাউস্ট'-এর কয়েকখানা পাতা না পড়ে কিছুতেই ঘুমোতেন না।

আমি যেদিন 'কুঞ্জবন' প্যালেস দেখতে গেলুম দ্বিতীয় বার, সেদিন সকালবেলা ধোপা তাগাদা করতে এসে ভদ্রলোককে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে গেল। আমার বড় কষ্ট হল। হিন্দুস্থানী ধোপা, সে গেস্ট-হাউসের অনেক বাবুসাহেবের কাপড় কেচেছে, এমন তাগাদা কাউকে কখনও করতে হয়নি, আজ সাত আট দিন হাঁটাহাঁটি করচে, আর সে কতদিন হাঁটবে? আমার ইচ্ছে হল ভদ্রলোককে বলি, যদি তাঁর কাছে না থাকে, আমার কাছ থেকে কিছু না হয় নিতে কিন্তু তাতে যদি তিনি কিছু মনে করেন?

আগরতলায় আমার থাকবার দিন ফুরিয়ে এল। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মন মহাশয়ের দুটি তরুণ আত্মীয়-যুবকের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, এদের যুবক না বলে বালক বলাই সঙ্গত, কারো বয়স সতেরোর বেশি না।

ওরা রোজ গেস্ট-হাউসে আসতো, গল্পগুজব করে চলে যাবার সময় আমায় টেনে নিয়ে যেতো তাদের সঙ্গে। একদিন ওরা বললে, চলুন পিকনিক করা যাক শহরের বাইরে কোথাও—

আমি বললুম, পাহাড়ের দিকে যাওয়া যাক—

আমার গেস্ট-হাউসের সঙ্গীটি তখন ছিলেন না, রাত্রে তাঁর কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি তখনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, আমার কি দিতে হবে?

আমরা হিসেব করে দেখেছিলুম জন-পিছু এক টাকা করে দিলেই চমৎকার পিকনিক হয়ে যায়। সস্তার দেশ, তা ছাড়া সাদাসিদে সাধারণ জিনিস ছাড়া পাওয়াই যখন যায় না। ওঁকে সেকথা বললুম, উনি তখন বললেন, তাহলে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সকালবেলা।

আমার ইচ্ছে ছিল না টাকার কথা তোলবার, উনিই তুললেন, কাজেই আমায় বলতে হল। রাত্রে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো উনি এখন একটা টাকা পাবেন কোথায়? বলে ভালো করিনি। কিন্তু টাকা নিতে না চাইলে ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হয় এদিকে, সুতরাং টাকা দিতে চাইলে নেবো নিশ্চয়।

ভোরে উঠে দেখি আমার সঙ্গী কোথায় বেরিয়েচেন আর আসেন না। আটটার সময় আমাদের রওনা হবার কথা, ছেলে দুটি আমায় ডাকতে এসে বসে রইল, দশটা বাজে, তখনও দেখা নেই তাঁর। প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি এলেন, আমাদের দেখে যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমরা বললুম, আপনার জন্তেই বসে আছি। চলুন, বেলা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—হাঁ এই একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। তা এইবার—। খানিক পরে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার তো যাওয়া হবে না বিভূতিবাবু, আমার একটু কাজ আছে আজ—

আমি বললুম, তা কখনো হয়! আপনাকে যেতেই হবে। আপনার জন্যে আমরা বসে আছি দেখুন কতক্ষণ থেকে।

তিনি কিছুতেই যেতে চাইলেন না। তাঁর মুখ দেখে যেন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ বলে মনে হল। আমার তখন কিছু মনে হয়নি কিন্তু তারপরে আমার এ ধারণা হয়েছিল যে ওঁর যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাঁদার একটি টাকা যোগাড় করে উঠতে না পেরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। হয়তো বা সকালে টাকার চেষ্টাতেই বেরিয়ে থাকবেন।

আমি বিশেষ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম ভদ্রলোক না যাওয়াতে। কিন্তু কি করি, কোনো উপায় ছিল না। কুঞ্জবন প্যালেস ছাড়িয়ে আরও প্রায় দু মাইল পিছনে একটা ভাঙা বাড়ি আছে কাদের। সেখানে চারিদিকে ঘন বন, পাহাড়ী ঝরনা, মূলী বাঁশের ঝাড়, বাঁশবনের আড়ালে টিপ্রাইদের ক্ষুদ্র গ্রাম—চমৎকার নিরিবিলি জায়গা। একটা টিলার মাথায় সেই ভাঙা বাড়িটা। নীচে বাঁশবনের ছায়ায় ঝরনার ধারে রান্নাবান্না করলাম, গান গাইলাম, কবিতা আবৃত্তি করলাম, কাঠ কুড়িয়ে আনলাম রান্নার জন্যে, জল তুললাম। গ্রাম থেকে টিপ্রাইদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আমাদের কাণ্ড দেখতে লাগলো।

বেলা যখন প্রায় তিনটে বাজে, তখন হঠাৎ 'বিভূতিবাবু! বিভূতিবাবু!' বলে কে যেন ডাকচে—দূর থেকে শুনতে পেলুম। আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বাঁশবনের ওপারের পথে টিলার পাশে দূর থেকে কে যেন ডাকচে ঠিকই। আমরা প্রত্যুত্তরে খুব জোরে হাঁক দিলাম, এই যে এখানে! আমাদের একজন রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার গেস্ট-হাউসের বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবন ভেঙে হাসিমুখে আমাদের দিকেই আসচেন।

—এলুম আপনাদের কাছে, না এসে কি পারি! কাজটা শেষ হয়ে গেল, তাই বলি, যাই। তারপর, কতদূর হল ?

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পেয়ে আমরা তো অত্যন্ত খুশী। আমার সত্যিই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোক না আসাতে। তিনি বললেন—এসব জায়গা আমার পরিচিত, পায়ে হেঁটে কতবার এসেছি। আপনারা যখন বললেন কুঞ্জবন প্যালেসের উত্তরের পাহাড়ে যাবেন, তখনই ভেবেচি এই জায়গা। একটু চা খাওয়ান তো আগে, উঃ হাঁপিয়ে গিয়েচি—

আমরা তাঁকে পেয়ে যেমন খুশী, তিনিও আমাদের পেয়ে তেমনই খুশী।

একটু পরে আমরা সবাই মিলে গান আরম্ভ করলুম—তার মধ্যে দুজন রান্না করতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি তাঁর বয়স ভুলে আমাদের সঙ্গে গানে আমোদে এমন করে যোগ দিলেন সে সেদিন বুঝলুম তাঁর মনের তারুণ্য, যা জীবনের আর্থিক অসাফল্যে বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

সেইদিন রাত্রে ফিরে এসে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আমায় বললেন। শুনে আমার পূর্বের অনুমান আরও দৃঢ় হল, লোকটি পয়লা নম্বরের ভবঘুরেও বটে, স্বপ্নালুও বটে।

তখন আমার অটোগ্রাফ নেবার বাতিক ছিল—বললুম তাঁকে আমার অটোগ্রাফের খাতায় কিছু লিখে দিতে। আজও আমার কাছে তাঁর লেখা আছে—নামটি প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে আমি নিই নি, কাজেই নাম এখানে দিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আজকাল কেউ তাঁর নাম জানে না।

আগরপাড়া থেকে এলুম ব্রাহ্মণবেড়িয়া।

এখানে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠি, তিনি ওখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জেনেছিলাম।

আমি তাঁর ওখানে গিয়ে পৌঁছুই বিকেল বেলা। সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাড়িতে রাঁধুনী ঠাকুর নেই, আপনাকে নিজে কিন্তু রাঁধতে হবে। আমাদের রান্না তো আপনাকে খেতে দিতে পারিনে—

আমার কোনো আপত্তি ছিল না অবিশ্যি—কিন্তু তাঁদের দিক থেকে ছিল।

সেটা বুঝেই আমি রাঁধতে রাজি হয়ে গেলুম।

সন্ধ্যার সময় চাকর এসে আমায় বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। আয়োজন দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! তিন চার রকমের মাছ, কপি, বেগুন, শাক, আলু, আরও কত কি পৃথক পৃথক থালায় কোটা। হলুদ বাটা, জিরে বাটা, ছোট ছোট পাত্রে সাজানো।

একবার জীবনে নিজে রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল—শুধু ভাতে ভাত রাঁধবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সেই ক-দিন। এত আয়োজনের মহাসমুদ্রে তাতে পাড়ি জমানো যায় না। আমি বিষণ্ণমুখে এটা ওটা নাড়াচাড়া করচি, পাশের ঘর থেকে একটি অল্পবয়সী বিধবা মহিলা এসে আমার রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

বোধ হয় আমার হাতা খুন্তি ধরবার ভঙ্গি দেখেই তিনি এক চমকে আমার রন্ধন-বিদ্যার দৌড় বুঝে নিলেন।

চাকরকে ডেকে আমায় কি বলতে বললেন—চাকর বললে, দিদিমণি বলচেন আপনি রাঁধতে জানেন তো? আমি দেখলাম, যদি বলি রাঁধতে জানিনে এদের মুশকিলে ফেলা হয়। আমার জন্যে এরা কিভাবে কি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবে এই রাত্রিকালে? সেভাবে এদের এখন বিব্রত করা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে।

সুতরাং তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললুম—রান্না? কেন জানবো না?—কত রেঁধেছি—

ভাবলুম আর দেরি করা উচিত নয়। যা হয় একটা হাঁড়িতে চড়িয়ে দিই।

কি একটা হাঁড়িতে চড়িয়েচি মহিলাটি আবার এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার রান্নার বহর দেখে তিনি বুঝলেন এভাবে রন্ধনকার্য চললে আমার অদৃষ্টে আজ খাওয়া নেই। অতিথির প্রতি কর্তব্য স্মরণ করেই বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। বললেন—আমি দেখিয়ে দিচ্চি আপনি রাঁধুন তো—হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলুন। তারপর তিনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিতে লাগলেন। দু-তিন ঘণ্টা লেগে গেল সব জিনিস রাঁধতে।

যখন খেতে বসেচি তিনি একটু দূরে বসে আমায় যত্ন করে খাওয়ালেন। হেসে বললেন—আপনি যে বললেন রাঁধতে জানেন ?

—একটু একটু জানি, সামান্য। মানে খুব ভালোরকম নয়।

—কিছুই জানেন না আপনি রান্নার।

আমি চুপ করে রইলাম। বিদ্যে যেখানে ধরা পড়ে গিয়েচে সেখানে কথা বলা সঙ্গত নয়। দুদিন আমি তাঁদের বাড়ি ছিলাম। ভদ্রমহিলা চারবেলা কেবল আমার রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমায় রান্না দেখিয়ে দিতেন তাই নয়, তিনি শুধু হাঁড়িটা ছুঁতেন না, বাকি কাজ সব নিজের হাতেই করতেন, তরকারিতে মশলা মাখানো, তরকারি হাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া—সব।

তিনি গৃহস্বামীর বিধবা কন্যা, যেমন শান্ত তেমনি স্নেহময়ী ও কর্তব্য-পরায়ণা। আমি তাঁকে দিদি বলে ডেকেছিলুম। তিনিও আমার ওপর ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন যে-দুদিন তাঁদের ওখানে ছিলাম।

আমার ভ্রমণপথে আর একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। সেকথা যথাস্থানে বলবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নোয়াখালি রওনা হই দুপুরের ট্রেনে।

এখানে এসে স্থানীয় জনৈক উকিলবাবুর বাড়িতে উঠি। এক একটা জায়গা আছে যা মনের মধ্যে অবসাদ ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে, নোয়াখালি সেই ধরনের শহর।

হয়তো এখানে একটি দিন মাত্র থেকেই চলে যেতাম কিন্তু যে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম তিনি আমায় যেতে দিলেন না। তাঁর আতিথেয়তার কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। ভদ্রলোক নোয়াখালি 'বার'এর একজন বড় উকিল, তাঁর বাড়ি যেন একটি হোটেলখানা। বাইরের দিকে এক সারি টিনের ঘরে কয়েকটি দরিদ্র স্কুলের ছাত্র থাকে, ভদ্রলোক তাদের শুধু যে খেতে দেন তা নয়, ওদের সমুদয় খরচ নির্বাহ করেন। এ ছাড়া আহূত ও অনাহূত কত লোক যে তাঁর বাড়ি দুবেলা পাতা পাতে তার কোনো হিসেব নেই। এই ভদ্রলোকের নাম আমি এখানে উল্লেখ করলুম না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং ভগবানের কৃপায় দীনদরিদ্রের উপকার সমান ভাবেই করে যাচ্ছেন।

আমার চেয়ে তাঁর বয়স অনেক বেশি, কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। সকালে উঠে আমার ঘরে এসে বসে কত গল্প করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল না তাঁর বাড়ি, অত লোককে খেতে দিতে গেলে রাজভোগ দেওয়া চলে না গৃহস্থের বাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে বসে সেই মোটা চালের ভাত, ডাল আর হয়তো একটা চচ্চড়ি কি ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠতেন! তিনি গৃহস্বামী, এত টাকা উপার্জন করেন, নিজের পৃথক ভোগের আয়োজন ছিল না তাঁর।

দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি ?

চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সবদেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে! প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধহয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে!

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয়নি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গিয়েচে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণমেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি এখানে থাকুন আরও কিছুদিন।

আমি বললুম, আমার থাকবার যো নেই, নইলে নিশ্চয়ই থাকতুম।

—এখন আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, আবার কবে আসবেন বলুন।

—তার কোনো ঠিক নেই, তবে এদিকে এলেই আপনার এখানে আসবো।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও চেহারা এখনও যুবকের মতো। অমন উদার মুখশ্রী আমি খুব বেশি লোকের দেখিনি। আর সব সময়েই আনন্দ হাসিখুশি নিয়েই আছেন।

আমায় বললেন, দেখুন, আমার ইচ্ছে করে লোকজন নিয়ে খুব আমোদ করি। সকলেই আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করুক, সবাইকে নিয়ে থাকি। একবার কি হল জানেন, ক-দিন ধরে একটি পয়সা আর নেই, আমার জমানো টাকা বলে কিছু বড় নেই তো—যা আয়, তাই-ই ব্যয়। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, শুধু ডাল আর ভাত ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা নেই। শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই সবাইকে নিয়ে আমোদ করে খাওয়া গেল। আমি একা বসে খেতে পারিনে।

সত্যিই তাই দেখেছি এঁর বাড়ি। দিনমানে সকলের একসঙ্গে খাওয়া বড় একটা হয়ে ওঠে না; কারো কাছারি, কারো স্কুল। কিন্তু রাত্রে ভিতরবাড়ির রান্নাঘরের দাওয়ায় আঠারো উনিশ-খানা পিঁড়ি পড়বে। উকিলবাবুর পিঁড়ি মাঝখানে, তাঁর আশেপাশে তাঁর আশ্রিত দরিদ্র ছাত্রগণ, তাঁর ছেলেমেয়েরা, অতিথি-অভ্যাগতের দল। সবাই যা খাবে তাঁকেও তাই দেওয়া হবে।

খাওয়ার সময় সে একটা মজলিসের ব্যাপার।

উকিলবাবু গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্প করতে পারেনও। ছাত্রদের উপদেশ দেন, তাঁর প্রথম জীবনের ছোটখাটো ঘটনা বলেন, হাসির গল্প করেন। আমি এই মজলিসে বিশেষ কোনো আনন্দ পাই নি তার কারণ আমি নবাগত, ওদের কাউকে চিনিনে, অল্পদিনের

পরিচয়। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়, উকিলবাবু যখন কথা বলচেন, সেখানে আর কেউ বলতো না কিছু, তিনিই একমাত্র বক্তা। যেমন, আমাকে কখনো তিনি কিছু বলবার অবকাশ দেননি। আমার ইচ্ছে করলেও বলতে পারতাম না। আমার মনে হত ভদ্রলোক খুব ভালো কিন্তু বড় সংকীর্ণ জগতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন।

ওঁর জগৎ এই নিজের বাড়িটি নিয়ে, এই আশ্রিতজনদের নিয়ে, এদের মধ্যে রাজত্ব করেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এদের বাইরে অন্য কোনো জগৎ ইনি দেখেচেন কি ? কখনও দেখবার তৃষায় ব্যাকুল হয়েচেন কি ? না দেখলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আকুলতা মনের মধ্যে সদাজাগ্রত থাকে।

বাসনা ও ব্যাকুলতা মনের যৌবন। ও দুটো চলে গিয়েচে যে মন থেকে সে মনে জরা বাসা বেঁধেচে। নিজে তো সুখ পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। সব বাসনার অবসান যে মনে, আকুলতা তীব্রতা যে মন থেকে—তৃপ্তির দ্বারা ভোগের দ্বারাই হোক, বা ক্ষীয়মাণ কল্পনার জন্যেই হোক—চলে গিয়েচে, সে মন স্থবির।

যেখানে গিয়েচি, সেখানেই দেখেচি উর্ণনাভ যেমন নিজের জালের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকে, গুটিপোকা যেমন গুটির মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখে, প্রত্যেকে এক এক নিজস্ব ক্ষুদ্র জগতে নিজেদের বন্দী রেখে হৃষ্টমনে জীবনের পথে চলেচে, এজন্যে তারা অসুখী নয়, অতৃপ্ত নয়।

কত জগৎ দেখে বেড়ালে তবে সংকীর্ণতার জ্ঞান মানসপটে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞানটাই বড়, এই জ্ঞান অর্জন করা সময়সাপেক্ষ তাও জানি ; মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে প্রধান সহায় প্রসারতাকে চেনা, তাহলেই সংকীর্ণতাকেও চেনা যায়।

নোয়াখালি থেকে আমি গেলুম মেঘনার তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।

সেখানে কোনো কাজের জন্যে যাইনি, বিস্তৃত মেঘনা নদীর তীরে বসে একটা দিন অলসভাবে কাটাতে গিয়েছিলুম। বিদায় নিয়েই এসেচি নোয়াখালি থেকে, এখানে দুদিন কাটিয়ে অন্য দিকে চলে যাবো।

আমার কাজ ছিল মেঘনার ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ছায়ায় চুপ করে সারাদিন বসে থাকা। বড় গাছ সেখানটাতে নেই, নদীর ধারে বর্ষার ভাঙনে সব গিয়েচে, আছে এখানে-ওখানে দু-একটা ছোটখাটো ঝোপ।

ভারি আনন্দে কাটিয়েছিলাম এখানে এই দুটি দিন।

এত বড় নদী আমাদের দেশে নেই, মেঘনার বিরাট বিস্তৃতিকে সমুদ্র বলে মনে হত, যেন কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে বসে আছি, আমার সামনে যেন চিরজীবন অবসর, কত স্বপ্নজাল বোনবার অবকাশ, দীর্ঘ, দীর্ঘ অবকাশ। সব চেয়ে ভালো লাগতো বিকেলে।

ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে আসতো বড় বড় ধানের মাঠের উপর, মেঘনার বিস্তৃত জলরাশির উপর। জলচর পাখীর বিরাট দল আকাশ অন্ধকার করে যেন কোন্ সুদূর কালের চরের দিকে উড়ে যেতো—সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশের আভা পড়ত জলে, দূরের বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় ; তারপরে

আকাশে নবেন্দুলেখা ফুটে উঠতো আমার মাথার ঠিক উপরে! খুব বড় পাল উড়িয়ে মহাজনী বহর চলে যেতো নদী বেয়ে সন্দীপে কি চাটগাঁয়ে!

যাদের বাড়ি উঠেছিলাম, তারা এখানকার বেশ বড় ধরনের গৃহস্থ। কোনো পুরুষে কেউ কাজ করে না, বিস্তৃত ধানের জমির ফসলে বছর চলে যায়—বাড়িতে অনেক গোরু, হাঁস ও ছাগলের পাল।

আমি থাকতাম বাইরের একটা ঘরে। সেদিন বেড়িয়ে ফিরলে গৃহস্বামী আমার কাছে তামাক টানতে টানতে গল্প আরম্ভ করলেন। আমার কৌতূহল হল ওঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার।

জিগ্যেস করলাম—আপনাদের এ বাড়ি কতদিনের?

—আজ প্রায় বিশ বছরের, এদিকে ভাঙন ধরেনি অনেক দিন।

—ধানের জমিতেই আপনাদের চলে বোধ হয়?

—তা আড়াইশো বিঘে জমি আছে।

—নিজেরা লাঙলে চাষ করেন, না ভাগে?

—বর্গা দিই, অত জমি কি নিজ লাঙলে চষা যায়।

—ধান ছাড়া অন্য কোনো চাষ আছে?

—আর যা আছে তা সামান্যই। ধানই এদেশের প্রধান ফসল। গোলার ধান বেচে সংসারের কাপড়চোপড়, ওষুদবিষুদ, বিয়ে-থাওয়া সব হয়।

শুধু মাত্র ধানের ফসলের ওপর এখানকার জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত। দেখেছি সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা পান্তা ভাত খায়, বড়লোকেরা খায় চিঁড়ে, মুড়ি বা খই। মুড়ির চেয়ে এখানে চিঁড়ে বা খইয়ের চলনই বেশি। দুপুরে গরম ভাত—বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্যে আবার বাসি ভাত বা খই চিঁড়ে। রাত্রে সকলের জন্যে আবার গরম ভাত। ধান থেকে যা পাওয়া যায়—তা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য এখানে মেলে না, খেতেও এরা অভ্যস্ত নয়। অবিশ্যি তরি-তরকারি মাছ দুধের কথা বাদ দিই। ফলের মধ্যে নারিকেল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এখান থেকে চলে যাই, সেদিন সকালবেলা গৃহস্বামী বৈষয়িক কাজে কোথায় চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রাখলুম; তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন যে, আমার যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

বাড়িতে পুরুষমানুষের মধ্যে একজন চাকর, ক্ষেত খামারের কাজ দেখে আবার ক্ষেতের তরি-তরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। আমার খাওয়ার জায়গা বাইরের ঘরের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরিতে হ'ত, এদিন সে-ই খাবার সময় উপস্থিত রইল। মেয়েরা আমার সামনে বেরুতেন না, ভাত দিয়ে তাঁরা চলে যেতেন, খেতে বসে কোনো জিনিসের দরকার হলে ন-দশ বছরের একটি ছোট মেয়ে নিয়ে আসতো।

সন্ধ্যার পূর্বে গরুর গাড়ি এল। আমি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। এমন সময় সেই ছোট মেয়েটি এসে বললে—বাড়ির মধ্যে আসুন—ডাকচে মা—

আমি ভাবলাম আমার ভুল করে ডাকচে, ছেলেমানুষ। আমায় কেন ডাকবেন তাঁরা ?

বললুম—কাকে ডাকচেন খুকি ? আমি নয়, তোমার ভুল হয়েছে।

—না, মা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে আসতে—

অগত্যা খুকির সঙ্গে আমি বাড়ির মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি নীচুমত চালা-ওয়ালা একটা দাওয়ায় একখানা আসন পাতা, তার সামনে থালায় খাবার সাজানো।

খুকি বললে—আপনাকে মা খেতে বলচেন—আপনি গাড়িতে যাবেন, কোথাও খাওয়া হবে কি না, খেয়ে নিন।

আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েচি তখন।

এখান থেকে চার মাইল দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে রেলে চাপবো এবং প্রায় সারারাতই ট্রেনে কাটাতে হবে—এ অবস্থায় খাওয়া হবে না তো নিশ্চয়ই, কিন্তু মেয়েরা সেকথা আন্দাজ করলেন কি করে—এই ভেবে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না।

খেতে বসে গেলুম অবিশ্যি। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, সূর্য ডুববার পূর্বে দু বার ভাত খাবো না—বোধ হয় এই কথা ভেবে মেয়েরা খেতে দিয়েচেন চিঁড়ে খইয়ের লাড়ু, নারকোলের লাড়ু, মুড়কি, দুধ, কলা ইত্যাদি।

আমার মনে আছে ছোটবড় নানা আকারের লাড়ু, কতগুলো খেলার মার্বেলের মতো ছোট।

যতক্ষণ থালার সমস্ত খাবার নিঃশেষ না করলাম, ততক্ষণ মেয়েরা ছাড়লেন না—ছোট মেয়েটিকে দিয়ে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন এটা খেতে ওটা খেতে। তাঁদের আগ্রহে ও আন্তরিকতায় আমার মনে যে ভাব জাগলো—তা হল নিছক বিস্ময়ের ভাব।

কেন আমাকে খাওয়ানোর জন্যে এদের এত আগ্রহ ? অতিথি বিদায় নিয়ে গেলে তো ঝামেলা মিটে যায়—সে লোকটা রাত্রে আবার পেট ভরে খেলে না খেলে তার জন্যে মাথাব্যথা করার কার কি গরজ ?

জগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সেবা খুব বেশি দেখা যায় না বলেই অনেক বৎসর পূর্বের সেই সন্ধ্যায় সেই অজানা গৃহলক্ষ্মীদের স্নেহের স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর পুল পার হয়ে আবার ট্রেন এসে থামলো ঘোড়াশাল স্টেশনে।

ঘোড়াশাল ঢাকা জেলায়—এখান থেকে কিছুদূরে নরসিংদি গ্রামের হাই-স্কুলে আমার এক বন্ধু হেডমাস্টার, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, বিদেশ-ভ্রমণের সময় পরিচিত বন্ধুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় আনন্দদান করে, সেজন্যে ঠিক করেছিলাম ঢাকা যাবার পথে বন্ধুটির ওখানে একবার যাবো।

নরসিংদি বেশ বড় গ্রাম, তবে স্কুলের জায়গাটি কিছু দূরে, গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে স্কুল। আমি যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছুলাম—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে বললে, হেডমাস্টারবাবু এখন ক্লাসে আছেন।

ছেলেটিকে বললুম, আমি এখানে অপেক্ষা করচি, তুমি হেডমাস্টারবাবুকে গিয়ে বল তাঁর একজন বন্ধু দেখা করতে এসেচে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার বন্ধু ছেলেটির পিছু পিছু আসচেন। এ ভাবে এই দূর প্রবাসে আমাকে হঠাৎ দেখে তিনি খুব খুশী।

বললেন, তারপর, কোথা থেকে এলে হে?

আমি কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েচি, তা সব খুলে বললুম। বন্ধু বললেন—বেশ ভালো, ভালো। এখানে যখন এসে পড়েচ, কিছুদিন থাকো। কলকাতা থেকে এসে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েচি হে—আজ দু বছর এই 'গড-ফরসেক্‌ন্' জায়গায় যে কি কষ্টে আছি তা আর কি বলবো! একটা লোকের মুখ দেখতে পাইনে—

—সুন্দরবনে বাস করচো নাকি? এত লোকের মধ্যে থেকেও লোকের মুখ দেখতে পাও না কি রকম?

অজ পাড়াগাঁয়ের স্কুল। পূর্ববঙ্গের ঐকটি ক্ষুদ্র গ্রাম—স্কুলের শিক্ষক যাঁরা সকলেরই বাড়ি এখানে, হেডমাস্টার আর হেডপণ্ডিত এই দুজন মাত্র বিদেশী। আমার বন্ধু ছাত্রজীবনে পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, খুব স্মার্ট, ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়, চেহারাও খুব সুন্দর।

এহেন স্টাইলবাজ, সুপুরুষ, ইংরেজিতে উঁচু সেকেণ্ডক্লাস পাওয়া ছেলে মাত্র ষাট টাকা মাইনেতে এই সুদূর ঢাকা জেলার এক পাড়াগাঁয়ে এসে আজ তিন বছর পড়ে আছে।

চাকুরির বাজার এমনি বটে।

এই সব কথা মনে মনে ভাবছিলুম সারা পথ আসবার সময়ে।

কিন্তু এখানে এসে মনে হল বন্ধুটি যে জায়গায় আছে, আর কিছু না হোক, অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে জায়গাটা ভালো। গ্রামের বাইরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ মেঘনার তীর ছুঁয়েচে, তারি মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেতঝোপ, মাঝে মাঝে বুনো শটির গাছ। এদিকে একটা ছোট খাল।

স্কুলের বাড়িটি এই ছোট খালের ধারে, বড় বড় ঘাসের বনের আড়ালে। নিকটে লোকালয় আছে বটে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার বা দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েচি কোনো মায়াবলে।

স্কুল-বাড়ির পাশে বোর্ডিং। তিনচারটি বড় বড় ঘর, সেগুলির মেজে হয়নি এখনও, সুতরাং মাটির সঙ্গে প্রায় সমতল, অত্যন্ত নীচু ভিতের ওপর বাড়িটা গাঁথা। আমার বন্ধুর কথামত একটি ছেলে আমার সঙ্গে করে এনে বোর্ডিং-এর একটা ঘরে বসিয়ে রেখে গেল।

আমার বন্ধুটি এই ঘরে থাকেন। একটা কাঠের তক্তপোষ, তার ওপর আধময়লা একটা বিছানা, আর তার ওপর খানকতক বই ছড়ানো। অন্যদিকে কতকগুলো চায়ের পেয়ালা, একটা স্টোভ, দুটি টিনের তোরঙ্গ, একজোড়া পুরোনো জুতো ইত্যাদি। হেডমাস্টারের জন্যে বোর্ডিং-এর এই ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েচে বুঝলাম।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল ঘণ্টা-দুই পরেই।

আমার বন্ধু হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন। আর দুটি আধময়লা কাপড় পরা শিক্ষক তাঁর

সঙ্গে বোর্ডিং-এর দোর পর্যন্ত এসে সম্ভবত হেডমাস্টারকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। আমার বন্ধু তাঁদের বললেন, আপনারা আসবেন কিন্তু এখুনি—বেশি দেরি না হয়, চা খাবার সময় হয়েছে প্রায়।

আমি ভাবলুম আমার বন্ধু বোধ হয় ওই দুটি শিক্ষককে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বন্ধুকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—ওদের আবার নেমন্তন্ন করবো কি। ওরা তো দিনরাত এখানে পড়ে থেকে আমায় খোশামোদ করে—আমাদের ড্রইং মাস্টার একজন, আর একজন সেকেণ্ড পণ্ডিত। ওদের বললাম এসে চা করতে আমাদের জন্যে—ওরা আমার অর্ধেক কাজ করে দেয়।

সেই পুরনো চালবাজ বন্ধু আমার! কিছুই বদলায়নি ওর।

তারপর আমার বন্ধু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন—সব বাঙাল হে, সব বাঙাল! মুখ দিয়ে ভাষা উচ্চারণই হয় না। আমাদের মতো ইংরিজি বাংলা মুখ দিয়ে বেরুবে কোথা থেকে ওদের? আমার ইংরিজি শুনে ওরা সবাই ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে, এমন উচ্চারণ কখনো শুনিনি। তাই সবাই খুব খাতির করে।—বন্ধু গর্বভরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

অনেকদিন পরে সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাতে বড় আনন্দ হল। কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়লো। পটুয়াটোলার একটা মেসের ঘরে বসে বন্ধুটির মুখে এমনি কত চালবাজির কথাই যে শুনেচি!

কিছুক্ষণ পরে সেই দুটি মাস্টার এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার বন্ধু মিথ্যা নেহাত বলেনি, ঘরে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে আর যতক্ষণ তারা ছিল ততক্ষণ এমন একটা নম্র, লাজুক, নিতান্ত দাস-সুলভ ব্যবহার করলে আমার বন্ধুর সামনে যে দেখে আমার নিতান্ত কষ্ট হল।

এদের কথায় খুব বেশি ঢাকা জেলার টান, কিন্তু আমার কানে বেশ লাগতো। ড্রইং মাস্টারটির বয়স একটু বেশি, তিনি ঢোকবার কিছু পরেই আমার বন্ধুর রূপগুণ ও বিদ্যার প্রশংসা সেই যে শুরু করলেন, আর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আসতেই চান না। আমায় বললেন, বাবুর বাড়ি?

—কলকাতায়—

—আপনি আর হেডমাস্টারবাবু পড়েছিলেন একসঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনিও এম-এ পাস?

—আমি বি-এ পাস করেছিলুম—আর পড়া ঘটেনি।

—কি করেন এখন বাবু?

—একটা চাকরি করি, তাতে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। সেজন্যেই তো আপনাদের দেশে এসে পড়েচি—

—খুব ভালো হয়েচে এ গরিবদের দেশে এসেচেন। আপনারা কলকাতার কলেজের

ভালো ছেলে, আপনাদের মুখের ভাষাই অন্যরকম। বড় ভালো লাগে হেডমাস্টারবাবুর মুখের বাংলা আর ইংরিজি শুনতে। এ রকম এদেশে কখনও শোনেনি—

এই দুটি শিক্ষক দেখলুম আমার বন্ধুর সমস্ত কাজ করে দেয়। ওরাই চা করে আমাদের খেতে দিলে, আবার তামাক সেজে দিলে, একজন গিয়ে বাজার থেকে পান নিয়ে এল, কারণ পান ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা অনেক রাত পর্যন্ত রইল। সন্ধ্যার পরে ওরা আমার বন্ধুকে বললে—মাস্টারবাবু, তাহলে আপনি বসুন, বাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমরা দুজনে খাবারটা তৈরী করে ফেলি।

আমি বললুম, কেন, বোর্ডিং-এর ঠাকুর নেই ?

—আছে, তা উনি ঠাকুরের হাতে খান না। নিজেই রাঁধেন, আমরা যোগাড়-যন্ত্র করে দিই—

—বোর্ডিং-এর চাকরে সে সব কাজ করে না ?

—চাকর নেই এ বোর্ডিংএ। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে।

আমি বন্ধুকে বললুম, চলো আমরাও রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

রান্নাঘরে আমরা এসে বসলুম বটে, কিন্তু সেখানে আমাদের জন্য ময়দা মাখা, রুটি সেঁকা, তরকারি রাঁধা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করলে শিক্ষক দু'টি।

আমার বন্ধু বেশ চুপ করেই বসে রইলেন—ওদের কাজে এতটুকু সাহায্য করলেন না। এমনভাবে ওদের সেবা নিলেন, যেন এ সে সেবা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। ব্যাপার দেখে মনে হল রোজই এই ব্যাপার চলে—শিক্ষকদুটিই প্রতিরাত্রে হেডমাস্টারের রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়।

আমাদের পরিবেষণও করলে ওরা।

ড্রইং মাস্টারটি আমায় বললে, আপনি কিছু খাচ্ছেন না কেন বাবু ? ভালো করে খান।

কত যত্নে ওরা আমায় বসে খাওয়ালে। হেডমাস্টারের বন্ধু, সুতরাং আমিও ওদের খাতিরের ও খোশামোদের পাত্র—অমন যত্ন আমার আপনার জনও বোধহয় কোনদিন করেনি।

রাত্রে ওরা বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় আমাদের জন্যে পান পর্যন্ত সেজে রেখে গেল। আমি কিছুদূর গেলুম ওদের এগিয়ে দিতে।

ড্রইং মাস্টারটিকে দেখে মনে কেমন অনুকম্পা জাগে। যেমন নিরীহ তেমনি দরিদ্র। কাপড়চোপড় বেশি নেই একটা আধময়লা পিরানের ওপর একটা উড়ুনি, একখানা আধময়লা মোটা ধুতি, এই ওর পরিচ্ছদ।

আমি মাঠের মধ্যে গিয়ে ওকে বললুম—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—এই কাছেই, শাটিরপাড়া গ্রাম।

—কতদিন স্কুলে আছেন ?

—তা প্রায় সাত বছর আছি বাবু।

—কিছু মনে করবেন না—এখানে কত পান ?

—পনেরো টাকা—আর হেডমাস্টারবাবু এসে আমায় দিয়ে স্কুলের খাতাপত্র লেখার কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিয়ে স্কুল থেকে তিনটাকা মাসে দেওয়ান। বড় উঁচু মন ওঁর।

—বাড়িতে কে কে আছে আপনার?

—বাবা মা, দুই বোন, আর আমার স্ত্রী, আমার একটি ছোট ছেলে।

—মাইনে তো খুব বেশি না। অন্য স্কুলে যান না কেন?

—কে দেবে বাবু? আজকাল চাকরির বাজার যা, বি-এ পাস করে বেকার বসে আছে আর আমি তো মোটে নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস। আমাদের কি চাকরি হঠাৎ জোটে বাবু।

—জমিজমা আছে বাড়িতে?

—সামান্য ধানজমি আছে, তাতে ছ-মাসের খোরাকী চালটা ঘরে আসে। বাকি ছ-মাস টানাটানি করে সংসার চলে। কি করবো বাবু, যখন এর বেশি রোজগারের ক্ষমতা নেই—এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নর্মাল পাসকরা একজন পণ্ডিত আজ সাত বছর পনেরো টাকায় ঘষচে, কোনোখানে উন্নতির আশা নেই। শেয়ালদা স্টেশনের একজন কুলিও মাসে অন্তত পনেরো টাকার দেড়-গুণ থেকে তিন-চারগুণ রোজগার করে।

এদের দিকে চাইলে কষ্ট হয়, এরা আমাদের ছেলেপুলেকে মানুষ করে দেবার ভার নিয়েচে, পরম নিশ্চিন্তে সে ভার এদের ওপর চাপিয়ে আমরা বসে আছি। একথা কি কখনো ভাবি যে এরা কি খেয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে দেবে? হাওয়া খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

আবার সকাল হতে না হতে এরা ফিরে এসে জুটলো হেডমাস্টারের ঘরে। সকালের চা এরাই করে দিলে, বোঝা গেল এ কাজ ওরা রোজই করে। আসবার সময় এরা আবার একটা কাঁচকলা ও গোটাকতক ডিম এনেছে। ওদের ওপরওয়ালা হেডমাস্টারকে খুশী রাখবার জন্যে কত না আয়োজন ওদের।

আমার বন্ধুটি আগের মতো পড়াশুনো করেন না। এখানকার এই সব অর্ধশিক্ষিত লোকদের ওপর সর্দারি করে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্চেন।

ইনি এক সময় নিজেকে সচল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন, বন্ধুবান্ধব মহলে বাজি রেখে পরের ভুল ধরে ছাত্রাবস্থায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

এঁকে জিজ্ঞেস করলুম—কি হে এখানে পড়াশুনো কি রকম করচো?

—না ভাই, এখানে কিছু বই নেই, নিজেরও অত পয়সা নেই যে বই আনাই।

—তা হলে কষ্টে আছো বলো?

—তা নয়, আমার মত বদলাচ্ছে ক্রমশ।

—কি রকম, শুনি?

—কতকগুলো ইনফরমেশনের বোঝা মাথার মধ্যে চাপিয়ে নিয়ে আগে ভাবতুম খুব বিদ্বে

হয়েচে আমার। যাদের মাথার মধ্যে এসব থাকতো না, তাদের ভাবতুম মূর্খ, কিছু জানে না। এখন দেখচি জীবনে সব কিছু জানবার প্রয়োজন নেই—কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়ে শুধু তাদের সম্বন্ধে জানতেই সারা জীবন কেটে যেতে পারে। অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার দরকার হয়—রেফারেন্সের বই খোলো, দেখ। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর অনাবশ্যক বোঝা চাপিয়ে লাভ নেই।

—সত্যিই তোমার অনেক বদলেচে দেখচি—

—তার মানে কি জানো, তখন ছিলুম সদ্য কলেজের ছোকরা, রক্ত বেজায় গরম, এখন ক্রমশ অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক বুঝচি। অভিজ্ঞতা না হলে কিছু হয় না জীবনে।

—সে কি হে! জীবনে অভিজ্ঞতা তো হবেই। তাই নিয়েই তো জীবন। এক জায়গায় যদি চুপটি করে বসেও থাকো বেঁচে, তা হলেও অভিজ্ঞতা আটকায় কে। কি বুঝলে অভিজ্ঞতায়?

—বুঝলুম এই, জীবনে যদি কিছু দিতে হয় তবে নির্জনে ভাবার দরকার বড্ড বেশি। পড়ার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে এই নির্জন জায়গায় আজ দুবছর একা বাস করে অনেক বদলে গিয়েচি হে—অনেক কিছু বুঝেচি।

—কিন্তু যার মাথার কিছু নেই—দুনিয়ার কোন খবর রাখে না, তার চিন্তার মূল্য কি দাঁড়াবে?

—অন্তত আমার সম্বন্ধে তুমি একথা বলতে পারো না। আমি এখন যদি চিন্তা করি, তার খানিকটা মূল্য অন্তত আমার কাছেও দাঁড়াবে। আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে—পরের কথা আমি ভাবিনে, নিজের জীবনের কথা। অনেক কাজ হয় এতে।

—কোন্ বিষয় ভালো লাগে পড়তে?

—পলিটিক্স্ সম্বন্ধে জানবার বড় ইচ্ছে। আগে এই জিনিসটা ভালো করে পড়িনি—এখন মনে হয়, না পড়ে ভালো করিনি।

—দেশের পলিটিক্স্ না বিদেশের পলিটিক্স্?

—সব দেশেরই—বিশেষ করে নিজের দেশের।

—আমার মত এসব সম্বন্ধে অন্য রকম।

—কি শুনি তোমার মত?

—আমার মতে ইউনিভার্সকে বুঝতে চেষ্টা না করলে মানুষের কিছুই হল না।

—গ্রহ-নক্ষত্র, এই সব?

—শুধু গ্রহনক্ষত্র নয়, সবকিছু। পশুপক্ষী, গাছপালা, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র, Space—এক কথায় আমাদের জীবনের গোটা পটভূমিই। ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি—তারপর তাঁর সম্বন্ধে ভাববো।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠে একটা বেঞ্চির উপর বসে।

সময়টা ছিল সন্ধ্যার কিছু পরেই। মাঠভরা জ্যোৎস্না সেদিন, এখানে ওখানে দু-একটি ক্ষীণ তারা আকাশের গায়ে, জ্যোৎস্না পড়ে সবুজ বেতের ঝোপ চিক চিক করচে।

অনেকদিন এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিনি। দুজনেরই মনে বোধ হয় একথা উঠেছিল, কারণ আমার বন্ধুটি চারিদিকে চেয়ে বললেন—কেমন জায়গাটা, ভালো নয় হে?

—চমৎকার। এখানে এতদূরে ঢাকা জেলায় চাকরি পেলে কি করে?

—খবরের কাগজে দেখে দরখাস্ত করেছিলুম, আমাকে এরা তখুনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে।

—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন না অন্য কিছু একটা পাই। কলকাতার কাছে যাবার বড় ইচ্ছে—

—আমি কিন্তু তোমার এই জায়গা বেশ পছন্দ করেচি। এই রকম ফাঁকা জায়গায় বাস করবার খুব ইচ্ছে আমার মনে, যদিও কখনো হয়নি।

—তুমি ভাই যে সব ভাবনার কথা বললে, Space, God absolute, Stars ইত্যাদি—ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি চাই যাতে দেশের আর দশের উপকার হয়, পলিটিক্‌স্‌ ভিন্ন অন্য কিছুর চর্চা ভালো লাগে না। সমাজে বাস করে, মানুষের মধ্যে বাস করে, তাদের কথা ভাবলুম না, তাদের বুঝবার চেষ্টা করলুম না—কিনা কোথাকার নক্ষত্র, কোথাকার Space—এ সব আমায় appeal করে না—

—নানা রকমের মানুষ আছে, নানারকমের মত আছে। তোমার যা ভালো লাগে তোমার কাছে তাই ভালো। তবে আমি যদি থাকতে পেতুম, তবে অন্য কথা চিন্তা করতুম। পলিটিক্‌সের কথা আমার মনেও উঠতো না।

—তুমি যদি থাকতে এখানে, আমার দলে ভিড়িয়ে নিতুম একমাসে—

—অর্থাৎ পলিটিক্‌সের দলে? আমার মনে হয় না যে তুমি সাফল্যলাভ করতে সে কাজে। আমি তোমার দলে যেতুম না। এমন মুক্ত মাঠের মধ্যে বসে পলিটিক্‌সের কথা যদি মনে উঠতো, তবে মেঘনা নদীর পারে অমন সান-সেট হওয়ার সার্থকতা কি রইল?

—থাকো না কেন এখানে? আমি চেষ্টা করবো স্কুলে?

—না ভাই, এখন একটা চাকরি হাতে রয়েচে, এখন থাক্‌। পরে দরকার হলে জানাবো। কিন্তু তুমিই বা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কতকাল পড়ে থাকবে?

—তা তো জানিনে। এখানে থাকলে সব ভুলে যাবো। অলরেডি মনে সন্তোষ এসে গিয়েচে, অর্থাৎ মনে হচ্চে বেশ তো আছি।

—ওই তো Danger signal—পুরুষের পক্ষে নিজের অবস্থায় সন্তোষ বড্ড খারাপ লক্ষণ বলে বিবেচনা করি—

—আমারও ভয় হয়। তবে চাকরির বা বাজার তাতে তো নড়তে পারিনে এখান থেকে। কোথায় যাবো ছেড়ে দিয়ে? অথচ এ যেন মনে হচ্চে কোথায় পৃথিবীর এক কোণে পড়ে আছি, কোনো কিছু খবর রাখচিনে দুনিয়ার, একেবারে পুরোনো হয়ে গেলুম হে—

—কান্টের মতো দার্শনিক একটা ছোট্ট শহরে ছিলেন জার্মানির, এত বড় চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছিলেন সেখানে থেকেই। শহরে না থাকলেই লোক পুরোনো হয় বলে মনে কর কেন? নতুন আর পুরোনো অত্যন্ত সাধারণ ধরনের শ্রেণীবিভাগ—নতুন মাত্রেই ভালো নয়, পুরোনো মাত্রেই মূল্যহীন নয়—একথা তোমাকে তো বলবার দরকার করে না।

এই সময় শিক্ষক দুটি এসে পৌঁছুলো। তারা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এই দিকেই এল। ড্রইং মাস্টার বিনীতভাবে বললে—মাস্টার বাবু, চা করে আনি? আর রাত্তিরে আপনারা কি খাবেন?

আমি তাদের বসালুম বেঞ্চিতে। তারা বসতে চায় না—চা করে এনে না হয় বসচে এখন, দেরি হয়ে যাবে চায়ের—আসলে হেডমাস্টারের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করে, আমার অন্তত তাই মনে হল।

আমি বললুম—আচ্ছা, আপনাদের এই গাঁয়ের মাঠ কেমন লাগে আপনাদের কাছে?

ড্রইং মাস্টার বললে—বেশ লাগে, মেঘনার ধারে আরও ভালো। চলুন, যাবেন? জ্যোৎস্না-রাত, ভারি চমৎকার দেখতে হয়েচে। মাস্টারবাবু যদি যান—

আমার সেকথা মনেই ছিল না। সিকি মাইল দূরে মেঘনা, জ্যোৎস্নারাত্রে মেঘনার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখবার লোভ সামলাতে পারা গেল না।

বন্ধুকে নিয়ে আমরা গেলুম মেঘনার ধারে। ওপারে কি একটা গ্রাম, এপারে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাঁশবন, বনঝোপ। নোয়াখালি জেলার মেঘনা যতখানি চওড়া দেখেচি, এখানে নদী তার চেয়ে ছোট। তবুও আমার মনে হল জলরাশির এমন শোভা দেখেছিলুম শুধু কক্সবাজারের ও মংডুর সমুদ্রতীরে। সন্দীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল-শোভা সেই এক সন্ধ্যায় স্টীমারের ডেক থেকে প্রত্যক্ষ করে মনে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আজও যেন সেই ধরনের আনন্দই আবার ফিরে এল মনে।

আমার বন্ধুটি মেঘনার ধারে বড় একটা আসেন না, তিনিই বললেন। এই সিকি মাইল পথ তিনি হাঁটতে রাজি নন। বললেন—আমার ওসব ভালো লাগে না, জল দেখে তোমাদের যে কি কবিত্ব উথলে ওঠে তোমরাই বলতে পারো।

ড্রইংমাস্টার লোকটি বেশ প্রকৃতি-রসিক—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো চোখ আছে ওঁর, একথা মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হল।

আমার বন্ধু বললেন—আসলে তোমরা এতে দেখ কি বলতে পারো?

—কি করে বোঝাবো? এই নদী, জল, জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ—এ বেশ ভালো লাগে, তাই দেখি।

—কোন্ দিক থেকে ভালো লাগে—picture effect of the landscape?

—তাই বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি।

—তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে তুমি যাকে একটা মস্ত spiritual আনন্দ বলে মনে করচো, তার সবখানিই sensuous?

—প্রত্যেক ইস্থেটিক আনন্দ মাত্রেই sensuous, তবে এ আনন্দ সূক্ষ্মতর শ্রেণীর ; spiritual আনন্দের সগোত্র না হলেও নিকটতম আত্মীয় বটে। তবে এর প্রকৃতি চিরে চিরে কেটে কেটে দেখাতে বোলো না। আমার মনে হয় কেউই তা করতে পারবে না। শাস্ত্রে চরম আনন্দকে বলেচে, ব্রহ্মাস্বাদের সমতুল্য—কে ব্রহ্মকে আস্বাদ করেচে যে বিচার করবে ? আনন্দের analysis ওভাবে হয় না।

—আমি একটা কবিতা পড়ে এর সমানই আনন্দ পাই যদি বলি ?

—এ তর্ক তোমার সঙ্গে করবো না, কারণ আমার ধাত অন্তরকম। আমার মনে হয় বদ্ধ ঘরে বসে হাজার কবিতা পড়লেও সে আনন্দ তুমি কিছুতেই পাবে না।

এখানে আমার মনে পড়লো সন্দ্বীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল, আর আওরঙ্গজেবপুরের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সেই বনভূমি।

আমার বন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন—এ তোমার গা-জুরি কথা হ'ল।

—শোনো, একটা কথা আছে। দু ধরনের লোকের মধ্যে—যারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে আর যারা ভালোবাসে না—এক দলের চোখ আছে, অন্য দলের নেই। চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ দু দলে তুলনা হয় না, এখানে বিচার হবে চক্ষুষ্মান্ লোক বদ্ধ ঘরে কবিতা পড়ে যে আনন্দ পায়, সেই ধরনের আনন্দ সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে পায় কি না। সুতরাং ভেবে দেখ এ নিয়ে তর্ক হতে পারে কি ?

সম্মুখে মেঘনা নদীর বুকে জ্যোৎস্নারাশি এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করেচে। আমার মনে হল শুধু এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখবার সুযোগ পাবো বলে স্কুলমাস্টারি নিয়ে এখানে থেকে যেতে রাজি আছি।

এক বছর ধরে এই দৃশ্য রোজ দেখলে মনের আয়ু বেড়ে যায়।

আমার বন্ধু বললেন—আমার আরও ভালো লাগে না এতদূরে আছি বলে, দেশের মধ্যে হলে বোধহয় ভালো লাগতো।

—আমার মনে হয় এ তোমার ভুল। দূরে থাকা একটা advantage, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার পক্ষে।

—কি রকম ?

—দেশ থেকে দূরে যত যাবে, তত landscape-এর প্রকৃতি তোমার কাছে রোমান্টিক হয়ে উঠবে। ভ্রমণকারী ও explorerরা এটা ভালো বুঝতে পারে। বরফ ইংলণ্ডেও জমে শীতকালে, তবে নর্থ পোলের বরফ মনে অন্য রকম ভাব জাগায়। একই বাঁশবন দেশের খালের ধারে দেখচো অথচ ইরাবতীর পাহাড়ী gorge-এর ধারে সেই একই বাঁশবন দেখো—বুঝতে পারবে কি ভীষণ তফাৎ। এবারকার ভ্রমণে আমি তা ভালো বুঝতে পেরেচি। কতবার দূরদেশের পাহাড়ের ওপর, সমুদ্রের ধারে, কিংবা বনের ছায়ায় বসে দেশের কথা ভেবে দেখচি—অপূর্ব চিন্তা জাগায় মনে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের প্রকৃতি কি অপূর্ব রূপই না ধরে

চোখের সামনে। এ হল মনের রসায়ন, বোঝাতে পারিনে মুখে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয়। শুনলে বোঝা যায় না।

আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—এ যে তুমি esoteric তত্ত্বের দলে নিয়ে গিয়ে ফেললে দেখচি। তোমাদের মতো লোককে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' লিখেছিলেন 'মাথার ওপর যে আকাশ নীল তাই দেখতে ছুটে যাই এটোয়া কাটোয়া'—ওই ধরনের কিছু। অস্বীকার করতে পারো?

—এ হল অনুভূতির ব্যাপার, সুতরাং স্বীকার করিনে অস্বীকারও করিনে। যাই হোক, তোমার ভালো লাগচে কি না বলো।

—কেন ভালো লাগবে না? তুমি এখানে থেকে যাও, দিই না আমার স্কুলে একটা মাস্টারি জুটিয়ে।

এ কথায় স্কুলের শিক্ষক দুটি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুব ভালো হয় তা হলে, হেডমাস্টারবাবু চেষ্টা করলে এখুনি হয়ে যায়। স্কুলের কমিটি কিছু নয়, সবই হেডমাস্টারবাবুর হাত। আমাকে তারা দুজনে বিশেষ করে অনুরোধ করলে থেকে যাবার জন্যে।

রাত আটটার সময় আমরা সবাই ফিরলুম বোর্ডিংএ।

ড্রইং মাস্টার বললে—তাই তো, আমার সকাল সকাল উঠে আসা উচিত ছিল, এখন দেখচি খেতে আপনাদের অনেক রাত হয়ে যাবে।

ওরা রুটি করতে বসলো রান্নাঘরে। আমরা কাছে বসে আগে এক পেয়ালা করে চা খেলাম। ওরাই করে দিলে। আমার কতবার মনে হল কি সুন্দর লোক এরা! পরের জন্যে অক্লান্ত সেবা করে যাচ্চে দিনের পর দিন—কোনো দিন এতটুকু বিরক্ত হয় না।

আমার বড় মনে ছিল এই নিরীহ শিক্ষক দুটির কথা। মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেও বোধ হয় এত নিরীহ, ভালোমানুষ, এত বিনয়ী হয় না। যেদিন নরসিংদি ছেড়ে চলে আসি, ওদের দুজনকে ছেড়ে আসবার কষ্টই আমার বড় বেশি হয়েছিল।

আমাকে পরদিন স্কুলের অন্যান্য মাস্টার এবং ছাত্রেরা মিলে নিমন্ত্রণ করলে—আমাকে ও হেডমাস্টারকে নিয়ে তারা একসঙ্গে বসে খাবে।

আবার সেইদিনই ড্রইং মাস্টারটিও আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুকেও বলেছিল, কিন্তু সেই সময়ে স্কুল কমিটির মিটিং ছিল বলে তার যাওয়া হয়নি।

শাটিরপাড়া গ্রামে এই প্রথম ঢুকি। ঢাকা জেলার অজ পল্লীগ্রাম কেমন দেখবার সুযোগ এর আগে কখনো হয়নি। গ্রামের মধ্যে ছোটবড় বেতঝোপ বড্ড বেশি, টিনের ঘরই বারোআনা—দু একটা কোঠাবাড়িও চোখে পড়লো।

আমি গ্রামের মধ্যে বেশি দূর যাইনি;—গ্রামে ঢুকে ড্রইং মাস্টারের বাড়ি বেশি দূর নয়। একটা টিনের ঘরের দাওয়ায় আমায় নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশ ফাঁকা জায়গা বাড়ির চারিদিকে।

তক্তপোশের ওপর শতরঞ্জি পাতা। একটি ছোট মেয়ে এসে আমাদের সামনে সাজা পান রেখে গেল। ড্রইং মাস্টার বললে—আমার ভাইঝি—ওর নাম মঞ্জু—

—মঞ্জু? বেশ সুন্দর নামটি! এসো তো খুকি মা এদিকে—

—এসো, বাবু বলচেন, কথা শুনতে হয়—এসো—হ্যাঁ, ভালো কথা—আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল। সে কলকাতার লোক কখনো দেখেনি—বলেন তো আনি—

—বেশ তো, আনুন না তাঁকে।

চা দেবার পূর্বে ড্রইং মাস্টার বাড়ির মধ্যে গিয়ে কি বলে এল। কিছুক্ষণ পরে আধঘোমটা দিয়ে একটি ছিপছিপে গৌরাঙ্গী সুন্দরী বধূ চা ও খাবার নিয়ে তক্তপোশে আমার সামনে রাখলো।

ড্রইং মাস্টার বললে—প্রণাম করো—ব্রাহ্মণ—

মেয়েটি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে আমি বাধা দেবার পূর্বেই। কিন্তু এক সে ছেলেমানুষ, বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না -তাতে এত লাজুক যে বেচারী আমার দিকে মুখ তুলে ভালো করে চাইতেই পারলে না। আমি তাকে বসতে বললুম তক্তপোশের এক কোণে। তার স্বামীও বসলো। অনেক বলবার পর মেয়েটির মুখ ফুটলো। দু একটি কথা বলতে শুরু করলে আমার কথার উত্তরে। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের টান এত বেশি যে ভালো করে বোঝাই যায় না। নিকটেই কি এক গ্রামে বাপের বাড়ি।

আমি বললুম—আপনি কখনো কলকাতায় যান নি?

মেয়েটি কিছু বলবার আগে ড্রইং মাস্টার হেসে বললে—ও কখনো শাটিরপাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি, রেল স্টীমার চড়েনি। মেয়েটি মুখ নীচু করে হাসলে। বেশ সুন্দর মুখ, যে কেউ সুন্দরী বলবে মেয়েটিকে। চা খাবার সময়ে আমার দিকে কৌতূহলপূর্ণ ডাগর চোখে চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব জীব দেখচে।

বললুম—সময় থাকলে আপনার হাতের রান্না একদিন খেতুম, কিন্তু কালই চলে যাচ্চি। আর সময় নেই।

ড্রইং মাস্টারের বাড়িতে আর কেউ নেই, তার এই স্ত্রী ছাড়া। নিজেই সেকথা বললে।

—দেখুন, স্কুলে সামান্য মাইনে পাই, বাড়িতে একটা ঝি রাখলে ভালো হয় কিন্তু তা পেরে উঠিনে, একা আমার স্ত্রীকে সব কাজকর্ম করতে হয়—ওর আবার শরীর তত ভালো নয়, কি করি, আমার সঙ্গতি নেই বুঝতেই পারচেন।

আমি বললুম—ইনি চমৎকার খাবার-দাবার করতে পারেন তো! এই বয়েসে শিখেচেন অনেক কিছু দেখচি।

মেয়েটি নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করলে।

আমি বললুম—এ গ্রামে বেশ শিক্ষিত লোক আছেন?

ড্রইং মাস্টার বললে—আছেন বটে তবে দেশে থাকেন না। একজন বিখ্যাত লোক আছেন, ঢাকার উকিল; আরও একজন কলেজের প্রোফেসার আছেন। তবে তাঁরা দেশে আসেন খুব কম।

ইতিমধ্যে সেই ছোট মেয়েটি আবার এল—আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই মেয়েটি আপনার বাড়ির না?

—না, এটি আমাদের পাশের বাড়ির। ও এসে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সাহায্য করে আমার স্ত্রীর। বড় ভালো মেয়েটি। ওরও কেউ নেই, দিদিমার কাছে মানুষ হচ্চে—দিদিমার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, গ্রামের লোকদের দয়ায় একরকম করে চলে।

বাঙালী পরিবারের দুঃখের কাহিনী সব জায়গাতেই অনেকটা এক রকম, কি আমার নিজের জেলায়, কি সুদূর ঢাকা জেলায়। শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার নেই।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে চলে আসবার পথে সন্ধ্যা হয়ে এল। ড্রইং মাস্টার আমার সঙ্গেই ছিল—কি জানি কেন এই নিরীহ গ্রাম্য ইস্কুলমাস্টারের ওপর আমার একটা অদ্ভুত ধরনের মায়া জন্মেচে। যেন মনে হচ্চে ওকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধুটির চেয়েও এই লোকটি আমার আপনার জন হয়ে উঠেচে এই ক-দিনে।

বললুম—আপনি কলকাতার দিকে আসুন না কেন ?

—কি যে বলেন বাবু, খেতেই পাইনে তার কোথা থেকে ভাড়া যোগাড় করে কলকাতায় যাবো। আমার এক মাসের মাইনে। আর কলকাতায় গিয়েই বা আমার মতো নর্মাল পাস পণ্ডিত কত টাকা মাইনে পাবে ?

কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। সুতরাং চুপ করে রইলুম।

আমরা স্কুলের কাছে পৌঁছুতেই কতকগুলি ছেলে আমাদের আলো হাতে এগিয়ে নিতে এল। ওরা আমাদের স্কুলের হলে গেল নিয়ে।

সেখানে গিয়ে দেখি মহাকাণ্ড।

খুব রান্নাবান্না চলচে। বড় ডেকে পোলাও চড়েচে, প্রকাণ্ড দুটো বড় মাছ কোটা হচ্চে, আরও দু ডেক পোলাও রাঁধবার মালমশলা ডালায়। ছেলেদের উৎসাহ ছাপিয়ে উঠেচে মাস্টারদের উৎসাহ—তাঁরা নিজেরাই ছুটোছুটি করে রান্নার তদারক করচেন, কোথায় খাওয়ার পাত পাতা হবে তার ব্যবস্থা করচেন—ইত্যাদি।

আমায় ঘিরে কয়েকজন মাস্টার এসে দাঁড়ালেন।

একজন বৃদ্ধ শিক্ষক বললেন—আপনাকেই খুঁজচি—কোথায় গিয়েছিলেন ? ক-দিন এসেচেন, আমাদের মাস্টারবাবুর পরম বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে—

আমি ড্রইং মাস্টারকে দেখিয়ে বললুম—এঁর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—

—আমাদের হরনাথের বাড়ি ? বেশ—বেশ—

এই রকম একটি অপরিচিত স্থানে আমি সেদিন যে আন্তরিক আপ্যায়ন, হৃদ্যতা ও সমাদর লাভ করেছিলাম, তা জীবনে কখনো ভুলবার নয়। অথচ আমার সঙ্গে তাঁদের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই কোনো দিক দিয়েই—আমার খাতির করে তাঁদের লাভ কি ?

আমায় ও আমার বন্ধুটিকে মাঝখানে নিয়ে ওঁরা খেতে বসলেন। কত রকম গল্পগুজব, হাসিখুশি।

একজন শিক্ষক বললেন—আমাদের দেশ কেমন লাগলো আপনার ?

—বড় ভালো লেগেচে, পূর্ববঙ্গের লোকের প্রাণ আছে।

—সত্যিই তাই মনে হয়েচে আপনার নাকি ?

—মনে হয়েচে তো বটেই—আমি সে কথা শুধু মুখে বলচিনে, একদিন লিখবো।

—আপনার লেখাটেখা আছে ?

—ইচ্ছে করে লিখতে, তবে লিখিনি কখনো। আপনাদের এই আদর-আপ্যায়ন কোনোদিন ভুলবো না, একথা আমার মনে রইল—সুবিধে হলে সুযোগ পেলে লিখবোই।

তাঁরা সবাই মিলে আমার বন্ধুর নানারকম সুখ্যাতি করলেন আমার কাছে। হেডমাস্টার বাবুর ইংরিজি প্রায় সাহেবের মতো—এমন ইংরিজি বলবার বা লিখবার লোক তাঁরা কখনো দেখেন নি—ইত্যাদি। পরদিন আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে এলুম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমার এই বন্ধুটি তারপর ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বি টি পড়তে আসেন কলকাতায় এবং ভালো করে বি টি পাস করে কি রকম কি যোগাযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করে বিলেত যান। বর্তমানে ইনি শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

বছর-দুই পরের কথা।

ভাগলপুরে 'বড় বাসা' বলে খুব বড় একটা বাড়িতে থাকি, কার্যোপলক্ষে, কেশোরামজীর চাকরি তখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

'বড় বাসা'তে অন্য কেউ থাকে না—আমি চাকর-বাকর নিয়ে বাস করি, গঙ্গার একেবারে ঠিক ধারেই, ছাদের ওপর থেকে মুঙ্গেরের পাহাড় দেখা যায়। দিনরাত হু-হু খোলা হাওয়া বয়, ওপারে বিশাল মুক্ত চরভূমি—দিনে সূর্যালোকে মরুভূমির মতো দেখায়, কারণ এসব দেশের চর বালুময় ও বৃক্ষলতাহীন, আবার রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে পরীর দেশের মতো স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

একদিন লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলুম কাছে অনেক সব দেখবার জিনিস আছে। আমার বন্ধু সুগায়ক হেমেন্দ্রলাল রায়কে একদিন বললুম, চলো হে, কোথাও একদিন বেরিয়ে আসা যাক—

হেমেন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, এখানেই ওদের বাড়ি। আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, বড় বাসার ছাদে বসে আমরা দুজনে প্রায়ই আড্ডা দিতাম রাত্রে।

হেমেন যেতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় ? আমার শোনা ছিল কাজরা ভ্যালি খুব চমৎকার বেড়াবার ও দেখবার জায়গা, ওখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম বলে একটা গ্রানাইট পাহাড়ের গুহায় বৌদ্ধযুগের চিহ্ন পাওয়া যায়।

হেমেন ও আমি দুজনে বেরিয়ে পড়লুম একদিন সকালের ট্রেনে।

জামালপুরে গিয়ে পুরী ও জিলিপি কিনে নেওয়া গেল, সারাদিন খাবার জন্যে। বনজঙ্গলে চলেচি, খাদ্যসংস্থানের যোগাযোগ আগে দরকার।

কাজরা স্টেশনে নেমে কাজরা ভ্যালি ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে হয়। জামালপুর ছাড়িয়ে আরও ত্রিশ মাইল পরে কাজরা। স্টেশনের চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড় আর প্রস্তরের টিলা।

স্টেশন থেকে বার হয়ে সোজাপথে দূর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চলেচি কোথায় দুজনে।

একজন গ্রাম্যলোককে জিজ্ঞেস করলুম, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম কোথায় জানো?

সে বললে, নেহি জানতা বাবুজি।

সুতরাং মনে হল জায়গাটি নিতান্ত কাছে নয়। কাছাকাছি হলে এরা নিশ্চয়ই জানতো। তবে সামনের ওই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আর গুহা কোথায় থাকতে পারে? নিকটে আর কোথাও তেমন বড় পাহাড় নেই।

স্টেশন থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলেচে, আমরা দুজনে সেই পথেই চললুম। মাঝে মাঝে বিহারী পল্লীগ্রাম, খোলার ঘর, ফণিমনসার ঝোপ, মহিষের দল মাঠে চরচে, দড়ির চারপাই পেতে গ্রাম্য লোকেরা জটলা করচে ঘরের উঠোনে, অত্যন্ত ময়লা ছাপা-শাড়ি পরনে গৃহস্থ-বধূরা ইঁদারা থেকে জল তুলচে।

আবার ফাঁকা মাঠ, জনহীন পথ, মাঝে মাঝে গমের ক্ষেত। পাহাড়শ্রেণীর কাছে আসবার নামও নেই, স্টেশন থেকে যতদূরে দেখাচ্ছিল এখনও ঠিক ততদূরেই মনে হচ্ছে!

হেমেন বললে, পাহাড় বোধ হচ্ছে অনেক দূরে।

—চলো, যখন বেরিয়েচি, যেতেই হবে।

—সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে হবে মনে আছে?

—যদি ট্রেন না ধরতে পারি, কোথাও থাকা যাবে। এই সব গ্রামে জায়গা মিলবেই একটা রাতের জন্যে।

বেলা বেশ চড়েচে। একটা ইঁদারার পাড়ে আমরা দাঁড়ালুম জল খাবার জন্যে। একটি মেয়ে আমাদের হাতে জল ঢেলে দিলে। আমরা তাকে পয়সা দিতে গেলুম, সে নিলে না।

আরও একখানা গ্রাম ছাড়ালুম। বিহার অঞ্চলের গ্রামে বা মাঠে কোথাও তেমন গাছপালা নেই। গ্রামের কাছে তালগাছ, দু একটা আমবাগান আছে বটে কিন্তু তার তলায় কোনো আগাছা নেই, শুকনো পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই, এদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব, মেয়েরা ঝুড়ি ভরে জ্বালানির জন্যে শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের শ্যামল বনশোভা এখানে একান্ত দুর্লভ। আছে কেবল বিহারের সেই একঘেয়ে শীসম্ গাছের সারি। পথের দুধারে কোথাও ছায়াতরু নেই, খররৌদ্রে পথ হাঁটতে কেবলই তৃষ্ণা পায়। দুজনে ঠিক করলুম বস্তির ইঁদারা থেকে জল পান করা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না, এসব সময়ে বিহারের পল্লীতে কলেরা প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সাবধান থাকাই ভালো।

এবার পথের পাশে ছোট ছোট গাছপালা দেখা গেল। একটা কথা বলি, বাংলাদেশে যাকে 'ঝোপ' বলা হয়, সে ধরনের বৃক্ষলতার নিবিড় সমাবেশ বিহারে কচিৎ দেখা যায়,

দক্ষিণ-বিহারে তো একেবারেই নেই, বরং উত্তর-বিহারের বড় নদীর ধারে বাংলাদেশের মতো ঝোপ অনেক দেখেচি।

বাংলাদেশের ঝোপের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের জেলায় আমি জানি এমন অদ্ভুত ধরনের সুন্দর ঝোপ আছে, যার মধ্যেকার নিবিড় ছায়ায় গ্রীষ্মের দিনে সারাবেলা বসে কাটানো যায় নানা অলস স্বপ্নে।

প্রধানত ঝোপ খুব ভালো হয় কেয়োঝাঁকা ও যাঁড়া গাছের। কেয়োঝাঁকা মোটা কাঠের গুঁড়ি যুক্ত গাছ হলেও লতার মতো এঁকেবেঁকে ওঠে ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এর পাতাগুলো মখমলের মতো নরম, মসৃণ শাঁসালো এবং অত্যন্ত সবুজ। কেয়োঝাঁকার স্বভাবই ঝোপ সৃষ্টি করা, যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্ জঙ্গলে—কারণ কেয়োঝাঁকা বনের গাছ, যত্ন করে বাড়িতে কেউ কখনো পোঁতে না—এঁকেবেঁকে উঠে ঝোপ সৃষ্টি করবেই। আর কি সে ঝোপের নিবিড়, শান্ত আশ্রয়। যাঁড়া গাছও এ রকম ঝোপ তৈরি করে, কিন্তু সে আরও উঁচু ছাদওয়ালা বড় ঝোপের সৃষ্টি করে; যাঁড়াগাছ উঁচু হয় অনেকখানি, ডালপালাও কেয়োঝাঁকার চেয়ে অনেক মজবুত। শুধু অবিশ্যি এই গাছগুলি ঝোপ তৈরি করে না, যদি গাছের মাথায় অন্য লতা না ওঠে।

কিন্তু বাংলাদেশের জঙ্গলে বন-কলমী, ঢোল-কলমী, কেলে-কোঁড়া, বন-মরচে, বন-সিম, অপরাজিতা, ছোট্ গোয়ালে, বড় গোয়ালে প্রভৃতি লতা সর্বদাই আশ্রয় খুঁজে বেড়াচে অন্য গাছের, অবিবাহিতা মেয়েদের মতো। এদের মধ্যে সব লতারই চমৎকার ফুল ফোটে, কোনো কোনো ফুলের মধুর সুবাসও আছে, যেমন কেলে-কোঁড়া ও বন-মরচে লতার ফুল।

পুষ্পপ্রসবের সময়ে এই সব লতা যখন ছোটবড় ঝোপের মাথা নীল, সাদা, ভায়োলেট রঙের ফুলে ছেয়ে রাখে তখন নদী-প্রান্তবর্তী বন বহুদূরের আভাস এনে দেয় মনে। মুক্ত নীল আকাশের তলায় এদের পাশে বসে যেন সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কত কি স্বপ্ন যে এরা মনে আনে।

বিলেতে আমেরিকায় ঝোপের মূল্য বোঝে, তাই বড় আধুনিক ধরনের বাগানে ঝোপ রচনা করবার মতো গাছপালা পুঁতে দেয়। বাগান আর্টিস্টিক ভাবে তৈরি করবার জন্যে ওদের দেশে একজাতীয় শিল্পী আছেন, তাদের garden architect বলে। এরা মোটা মজুরি নিয়ে অতি চমৎকার ভাবে তোমার আমার বাগান তৈরি করে দেবে। ফলের বাগান নয়, সুদৃশ্য ফুল ও অন্যান্য গাছের বাগান।

এই বাগানে ঝোপের বড় দাম। সাধারণত দু-ধরনের ঝোপ এই সব বাগানে করা হয়, Arbour জাতীয়, Pergola-জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীকে ঠিক আমাদের পরিচিত ধরনের ঝোপ বলা যায় না, কারণ ওটা হচ্চে লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া ভ্রমণপথ, অনেকটা আমাদের লাউ-মাচা, পুঁই-মাচার মতো, তলা দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তা, খুঁটির বদলে অনেক বাগানে (যেমন কালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত মিসেস্ নাইটের বাগান, ইতালির অনেকগুলি মধ্যযুগের জমিদার বা ডিউকদের বাগান) মার্বেল পাথরের থাম দেওয়া।

সাধারণত ডন রোজ, হনি-সাকল প্রভৃতি লতানে গাছ Pergolaর মাচায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল পশ্চিম চীন থেকে আমদানি ক্লিম্যাটিস্ আরামাণ্ডি নামক সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত লতার খুব আদর। তা ছাড়া যাকে বলে স্যাণ্ডউইচ, আইল্যাণ্ড ক্রীপার, সে-জাতীয় পুষ্পিত লতারও খুব চল হয়েচে এই উভয়জাতীয় ঝোপ রচনার কাজে। Beaumontia grandiflora নামক এক প্রকার লতানে গাছও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি বিখ্যাত উদ্যানশিল্পী সার এডউইন লুটেন্সের রচিত একটি ঝোপের ছবি দেখেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, তাতে যে শিল্প-প্রতিভা ও সুকুমার সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় ছিল, মন থেকে সে ছবি কখনও মুছে যাবার নয়।

এই সব বাগানের ঝোপ যত পুরানো হবে, ততই তার দাম হয়। লতা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে, গ্রীষ্মমণ্ডলের বন থেকে আমদানি কাষ্ঠযুক্ত লায়ানাগুলি খুব মোটা হয়, সুন্দরী তরুণীর মুখের আশেপাশের কুঞ্চিত অগোছালো অলকদামের মতো তাদের নতুন গজানো আগডাল-গুলি Pergola ও Arbour-এর মাচা ছাড়িয়ে দুপাশে ঝুলে পড়ে।

অথচ বাংলাদেশে কত নদীতীরের মাঠে, কত বাঁশবনের শ্যামল ছায়ায় অযত্ন-সম্ভূত অদ্ভুত ধরনের ঝোপরাজি কত যে ছড়ানো, প্রকৃতিই স্বয়ং সেখানে garden architect—কত পুরোনো ঝোপও আছে তাদের মধ্যে—আমাদের গ্রামেই আমি এমন সব কেয়োঝাঁকার ঝোপ দেখেচি—যা আমার বাল্য দিনগুলিতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, কিন্তু কে তাদের মূল্য দেয় এদেশে? আদর তো করেই না, বরং গালাগালি দেয়—ওরাই নাকি ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করচে।

আমার গ্রামে ইছামতী-তীরের মাঠে এ রকম অনেক ঝোপ আছে, শনি রবিবারের অবকাশে কতদিন এ ধরনের ঝোপে বসে মাথার ওপরকার নিবিড় শাখাপত্রের অন্তরালবর্তী নানাজাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলির মধ্যে আপন মনে বই পড়ে বা লিখে সারাদুপুর কাটিয়েচি, দূরপ্রবাসে সে কথা মনে পড়ে দেশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে, এইবার পাহাড় নিকটে এল ক্রমশ।

পাহাড়ের ওপরের বন সবুজের ঢেউএর মতো নীচে নেমে এসেচে।

কত রকমের গাছ, প্রধানত শাল ও পড়াশী, আরও অজানা নানা গাছ। মহুয়া গাছ এ অঞ্চলে কোথাও দেখিনি। পাহাড়ের ওপরকার বন বেশ ঘন, বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড়ের পাদদেশে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো, মাঝে মাঝে নেমে এসেচে পাহাড়ী ঝরনা।

আমরা একটা পাহাড়ে উঠলুম—কাঠ কুড়ুতে যায় গ্রাম্য লোকে যে সরু পথে বেয়ে, সেই পথে দুজনে অতি কষ্টে লতা ধরে ধরে উঠি—আবার হয়ত একটা শিলাখণ্ডে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি—আবার উঠি। এ পাহাড়ের কোথাও জল নেই—দুজনেরই ভীষণ পিপাসা পেয়েচে, হেমেনের রীতিমত কষ্ট হচ্চে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিন্তু কিছুই করবার নেই।

তা ছাড়া বস্তি থেকে অনেকদূরে নির্জন বন-প্রদেশে এসে পড়েচি, লোকজনের মুখ দেখা যায় না, গলার স্বরও শোনা যায় না।

হেমেন বললে—ঠিক পথে যাচ্চি তো ?

—তা কি করে বলবো ? তবে অন্য পথ যখন নেই—তখন মনে হচ্চে আমরা ঠিকই চলেচি।

—বন যে রকম ঘন, কোনো রকম জানোয়ার থাকা অসম্ভব নয় হে, একটু সাবধানে চলো।

আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি আমাদের সামনে দিয়ে পথটা আবার নীচের উপত্যকায় নেমে গিয়েচে। আমরাও নামতে লাগলুম সে পথ ধরে।

একেবারে উপত্যকার মধ্যে নেমে এলুম যখন, তখন চোখে পড়লো ওদিকে আর একটা পাহাড়শ্রেণী, এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে গিয়েচে, মধ্যে এই বনাকীর্ণ উপত্যকা—বিস্তৃতিতে প্রায় দু তিনশো গজ হবে।

শালবনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী নদী রাঙা বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলচে—পায়ের পাতা ডোবে না এত অগভীর। হেমেন জল খাবেই, আমি নিষেধ করলুম। বিশ্রাম না করে জলপান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং তার আগে স্নান করে নেওয়া যাক।

কিন্তু স্নান করি কোথায় ?

অত অগভীর নদীর জলে স্নান করা চলে না।

হেমেন বললে—তুমি বোসো, আমি বনের মধ্যে কিছুদূর বেড়িয়ে দেখে আসি, জল কোথাও বেশি আছে কিনা—

বেলা ঠিক একটা, ঝাঁ ঝাঁ করচে খর রোদ, কাঁচা শালপাতা বিছিয়ে বনের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম—যেমন ক্ষুধা, তেমনি তৃষ্ণা, দুইই প্রবল হয়ে উঠেচে। অদ্ভুত ধরনের নির্জনতা এ উপত্যকার মধ্যে—এরই নাম কাজরা ভ্যালি বোধ হয়···কেই বা বলবে এর ওই ইংরেজী নাম কি না ? হেমেনকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি, কারণ এমন নির্জন মনুষ্যবসতি শূন্য স্থানে বন্যজন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বিচিত্র কি !

কেউ কোথাও নেই, এই সময় একা বনচ্ছায়ায় শায়িত অবস্থায় এই উপত্যকার সৌন্দর্য ও নিবিড় শান্তি ভালো করে আমার মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল। এইখানে 'বুদ্ধ নারিকেল' (Starculia Alata) নামে সুবৃহৎ বনস্পতি প্রথম দেখি—তারপর অবিশ্যি মধ্যভারতের অরণ্য-প্রদেশে এই অতি বৃহৎ বৃক্ষ দেখেচি। নাম যদিও 'বুদ্ধ নারিকেল'—এগাছের চেহারা দেখতে অনেকটা বিড়িপাতার গাছের মতো—প্রকাণ্ড মোটা গুঁড়ি, ভীষণ উঁচু, সোজা খাড়া ঠেলে উঠেচে আকাশের দিকে, চওড়া বড় বড় অনেকটা তিত্তিরাজ গাছের মতো পাতা—পত্র-সমাবেশ অত্যন্ত ঘন। বনস্পতিই বটে, এর পাশে শাল গাছকে মনে হয় বেঁটে বক্স।

অবিশ্যি ও জঙ্গলে কি ভাবে এ গাছের নাম জানলুম তা পরে বলবো।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে বললে—খুব ভালো স্নানের জায়গা আবিষ্কার করে এলুম, বেশ একটা গভীর ডোবার মতো—চলো।

আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলুম। হেমেন বললে—এইখানে থাক্ না পড়ে, তুমিও যেমন, কে নেবে এই জঙ্গলে ?

আমি বললুম—থাক্। তবে খাবারের পুঁটুলিটা নিয়ে যাওয়া যাক্, নেয়ে উঠে সেখানে

বসেই খেয়ে নেবো। পরে দেখা গেল এ প্রস্তাব করে কি ভালোই করেছিলাম! ভাগ্যে খাবারের পুঁটুলি রেখে যাইনি।

গিয়ে দেখি বনের মধ্যে আসলে পাহাড়ী ঝরনাটাই একটা খাতের মতো সৃষ্টি করচে। একটা মানুষের গলা পর্যন্ত জল ডোবাটাতে। স্নান সেরে শালবনের ছায়ায় বসেই আমরা জামালপুর থেকে কেনা পুরী ও জিলিপি খেলাম, তারপর ঝরনার জল খেয়ে নিয়ে আমরা আগের সেই শালবনের তলায় ফিরে এসে দেখি, হেমেন যে ছোট সুটকেসটি ফেলে গিয়েছিল, সেটি নেই।

এই জনহীন বনে সুটকেস চুরি করবে কে? কিন্তু করেচে তো দেখা যাচ্চে। সুতরাং মানুষ নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। আমরা সে দলের লোক নই, যে দলের একজন চিড়িয়াখানার জিরাফ দেখে বলেছিল—অসম্ভব! এমন ধরনের জানোয়ার হতেই পারে না! এ আমি বিশ্বাস করিনে।

হেমেন বললে—নতুন সুটকেসটা ভাই, সেদিন কিনে এনেচি কলকাতা থেকে—

—কিন্তু নিলে কে তাই ভাবচি—

—আমার মনে হয় বনের মধ্যে রাখাল কি কাঠকুড়ুনি মাগী ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসেছিল—বেওয়ারিশ মাল পড়ে আছে দেখে নিয়ে গিয়েচে—

—জিনিসের আশা ছেড়ে দিয়ে চল এখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমের খোঁজ করি—

আবার সেই 'বৃদ্ধ নারিকেল' পথে পড়লো। এ গাছের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা হয় বটে। এই জাতীয় গাছই বনস্পতি নামের যোগ্য। কলের চিমনির মতো সোজা উঠে গিয়েচে, দেবদারুর মতো কালো মোটা গুঁড়ি—ওপরের দিকে তেমনি নিবিড় শাখা-প্রশাখা; তবে গাছটাতে শাখা-প্রশাখা দূরে ছড়ায় না—অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের ধরনে ওপরের দিকে তাদের গতি। হেমেন হঠাৎ বললে—দেখ, দেখ—ওগুলো কি হে?

সত্যি, ভারি অপূর্ব দৃশ্য বটে। একটা গাছের ডাল-পালায় কালো কালো কি ফল ঝুলচে, রাশি রাশি ফল, প্রত্যেক ডালে দশটা পনেরোটা—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে এখান থেকে।

হেমেন বললে—একটা নয় হে, ও রকম গাছ আরও রয়েচে ওর পাশেই—

এইবার আমি বুঝলাম। দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বন্ধুকে বললুম—'ওগুলো আসলে বাদুড় ঝুলচে গাছের ডালে—দূর থেকে ফলের মতো দেখাচ্চে—

হেমেন তো অবাক। সে এমন ধরনের বাদুড় ঝোলার দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি বললে। কাজরা ভ্যালির সে গম্ভীর দৃশ্য জীবনে কখনো সত্যি ভোলবার কথা নয়। দুদিকে দুটো পাহাড়শ্রেণী, মাঝখানে এই বনময় উপত্যকা, বিশাল-বনস্পতি-সমাকুল, নির্জন, নিস্তব্ধ। আমার কানে ঝরনার শব্দ গেল। দুজনে ঝরনার শব্দ ধরে সামনের দিক দিয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর তলায় বনের মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখতে পেলুম। ওই নিশ্চয়ই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম।

হেমেন বললে—আমার সুটকেসটা আশ্রমের বালক-বালিকারা নেয়নি তো হে?

বনের মধ্য দিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার দৃশ্য বড় সুন্দর।

একদিকে মন্দিরের কুড়ি হাত দূরে বাঁ পাশে একটা বড় ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে পড়চে আমাদের সামনে একটা গুহা—গুহায় ঢুকবার জায়গাটাতেই মন্দির, পাহাড়ের একেবারে তলায়।

বহুপ্রাচীন জায়গাটাতেই মন্দির, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জন স্থান, দুদিকে পাহাড়-শ্রেণী, মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকা—প্রাচীন ভারতের পবিত্র আশ্রমপদের ছবি মনে জাগায় বটে! রোদ তখন পড়ে আসচে, পশ্চিম দিকের পাহাড়শ্রেণীর ছায়া পড়েচে উপত্যকায়—কত কি পাখী ডাকচে চারিদিকের গাছপালায়। হেমেনও বললে—বড় সুন্দর জায়গাটি তো!

আমাদের চোখের সামনে আশ্রমের ছবিকে পূর্ণতা দান করবার জন্যেই যেন এক সন্ন্যাসিনী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা তো অবাক! এই বনের মধ্যে সন্ন্যাসিনী!

সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন।

তেমন সুন্দরীও নন, বিশেষ তরুণীও নন। বয়স ত্রিশের ওপর, তবে দেহের বর্ণ সুন্দর, অনেকটা গঙ্গাজলী রঙের মতো। মাথায় একঢাল কালো চুলে কিছু কিছু জট বেঁধেচে। পরনে গৈরিক বসন। আমাদের হিন্দিতে বললেন—কোথা থেকে আসচ ছেলেরা?

—ভাগলপুর থেকে মাঈজী।

—কি জাত?

—আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ।

—হেঁটে এলে?

—আজ্ঞে। কাজরা স্টেশনে বেলা নটার সময় নেমে হাঁটচি।

—আজ তোমরা ফিরতে পারবে না। এইখানেই থাকো।

আমি হেমেনের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর দুজনে মিলে চারিদিকে চাইলুম—থাকবো কোথায়? ঘরদোর তো কোনোদিকে দেখি না। গাছতলায় নিশ্চয়ই রাত্রিযাপন করার প্রস্তাব করেননি মাতাজী।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাবা, তোমরা থাকো, থাকতেই হবে—সন্ধ্যা হবে সামনের পাহাড় পেরিয়ে যাবার আগেই হয়তো। তা ছাড়া, দরকারই বা কি কষ্ট করে যাবার? থাকবার ভালো জায়গা আছে।

কিন্তু কোথায়? চোখে তো পড়ে না কোনোদিকে। হেমেন ও আমি আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

হেমেন চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বললে—মাতাজী, আমরা থাকব কোথায়?

সন্ন্যাসিনী হেসে বললেন—মন্দিরে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গুহার ভেতরে মন্দির বাদে দুই কামরা। কোনো কষ্ট হবে না।"

আমরা একবার দেখতে চাইলুম জায়গাটা। মাতাজী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের গায়ে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি প্রত্যেক পাথরে খোদাই। বৌদ্ধযুগের চিহ্ন মন্দিরের সর্বাঙ্গে—বৌদ্ধমন্দির কবে হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হয়েচে তার সঠিক ইতিহাস সন্ন্যাসিনী কিছুই

জানেন না বলেই মনে হল। বৌদ্ধধর্ম বলে যে একটি ধর্ম ভারতবর্ষে আছে বা ছিল এসব ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা থাকবার কথা নয়।

কামরা দুটি ছোট বটে, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা রাত কাটাবার পক্ষে নিতান্ত মন্দ হবে না।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাঙালীরা ভালভাত ভালোবাসে—এখানে কিন্তু তা দিতে পারবো না।

আমরা বললুম—তাতে কি। যা দেবেন, তাতেই চলবে।

হেমেন চুপিচুপি আমায় বললে—বিছানা কোথায়, শুকনো পাতালতা পেতে শুয়ে থাকতে হবে না কি?

কিন্তু শোবার সময়ের এখনও অনেক দেরি—সে ভাবনার এখুনি দরকার নেই। সন্ধ্যা নেমে আসায় সেই অপূর্ব সুন্দর উপত্যকাটিতে রাঙা রোদ সু-উচ্চ বৃদ্ধ নারকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশ স্বর্ণাভ করে তুলেচে—চারিদিকে স্বপ্নপুরীর মতো নিস্তব্ধ শান্তি।

সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করলুম—এই উঁচু গাছটাকে কি বলে?

উনিই বললেন—বৃদ্ধ নারিকেল।

আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে উপত্যকার পূর্বদিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ন্যাসিনী বারণ করে দিলেন সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার সময় আমরা যেন বাইরে না থাকি এবং বনের মধ্যে বেশিদূর না যাই। ভাল্লুকের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া বাঘও মাঝে মাঝে যে বার না হয়, এমন নয়।

ঝরনা পার হয়ে খানিকদূর গিয়ে অরণ্য নিবিড়তর হয়েচে, বড় বড় পাথরের চাঁই এখানে ওখানে গড়িয়ে পড়েচে পাহাড় থেকে। কত কি পাখীর কলরব গাছপালার ডালে ডালে; আমরা বেশিদূর না গিয়ে ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের ওপরে বসে রইলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পূর্বেই আশ্রমে ফিরে এলুম।

মাতাজী আগুন করে আটার লিট্টি সেঁকচেন, আমাদের কাছে বসতে বললেন। আমাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাগলপুরে কি করি, কে কে আছে, বিবাহ করেচি কিনা ইত্যাদি মেয়েলি প্রশ্ন করতে লাগলেন।

আমি বললুম, এ মন্দির কতদিনের মাতাজী?

—মন্দির অনেক দিনের, তবে লক্ষ্মীসরাই-এর একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার মন্দির নতুন করে সারিয়ে দিয়ে ভেতরের কামরাও করে দিয়েচে।

—আপনি কতদিন আছেন এখানে?

—দশ বারো বছর—

—ভয় করে না একলা থাকতে?

—ভয় কিসের? পরমাত্মার কৃপায় কোনো বিপদ হয় নি কোনোদিন।

দশ বছর আগে এই সন্ন্যাসিনী গৌরাঙ্গী তরুণী ছিলেন, সে কথা মনে হল, আর মনে হল এই নির্জন উপত্যকায় মন্দির মধ্যে একা রাত্রিযাপনের বিপদ সে অবস্থায়।

হেমেন বললে, মাতাজী, আপনার দেশ কোথায় ?

—গৃহস্থ-আশ্রমের নাম বলতে নেই। তবুও বলি আমার বাড়ি ছিল এই বেগুসরাইয়ের কাছেই। আমি এ দেশেরই মেয়ে। আমার চাচা আগে এ আশ্রমের সেবাইত ছিলেন, তারপর থেকে আমি আছি।

এতক্ষণে অনেকখানি ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দেশের মেয়ে এবং সম্ভবত বাল্যকাল থেকে ওঁর চাচাজীর সঙ্গে এখানে অনেকবার গিয়েচেন এসেচেন। অনেকেই চেনে এদেশে।

আমি বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মাতাজী, মাপ করবেন, আপনি কি বিবাহ করেন নি ?

—আমি বিধবা, তেরো বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হয়, সেই থেকেই গৈরিক ধারণ করেচি।

তারপর তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলে গেলেন। ওঁর কথার মধ্যে একটি সতেজ সজীব নারীমনের পরিচয় পেয়ে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করলুম, ভেবে দেখলুম এই সন্ন্যাসিনীর যদি বয়স আরও কম হত তবে এঁর জীবনের ইতিহাস শুনে আমরা অন্তত মনে মনেও এঁর প্রেমে না পড়ে পারতুম না—সেই বয়সই ছিল আমাদের।

হেমেন বললে, আপনাকে এ বনে খাবার-দাবার কে এনে দেয় ?

—কিউল থেকে আমার শিষ্যরা আসে, ওরাই নিয়ে আসে, হপ্তার দুদিন।

—আপনি সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে। এ রকম মেয়ের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না।

—কিছু না, পরমাত্মা যখন ডাকেন, তাঁর সব কাজ তিনিই করিয়ে নেন। আমি বিধবা হয়ে একমনে তাঁকে ডেকেচি, ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করেচি যে কত। সংসার আদৌ ভালো লাগতো না, বাইরে বেরুতে ইচ্ছে থাকতো কেবল। জপতপ করবার কত বাধা সংসারে। আমি—আমাদের বেগুসরাইয়ের বাড়ির পিছনে ছোট একটি তেঁতুল গাছ আছে—কাছেই কিউল নদী—

আমি বললুম, বেগুসরাই মহকুমা ? সেখানে তো—

—এই লক্ষীসরাইয়ের কাছে বেগুসরাই, ছোট্ট গাঁ—কিউল নদীর ধারে। তারপর শোনো ছেলেরা, কিউল নদীর ধারে সেই তেঁতুল গাছের কাছে বসে বসে কতদিন ভগবানকে ডেকেচি যে, আমার একটা উপায় করে দাও, সংসার আমার বড় খারাপ লাগচে। ভগবানকে ডাকলে তিনি শোনেন।

—কি করে জানলেন ?

—আমি প্রত্যক্ষ ফল পেয়েচি—একমনে ডাকলে না শুনে তিনি থাকতে পারেন না।

আমার একটু আমোদ লাগলো, কারণ সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic, লেস্‌লি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত, ভগবানকে মানি না যে তা নয়, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, দিতেও পারে না—এই ছিল আমার মত।

আমি বললুম, ভগবানকে কখনো দেখেছেন মাতাজী ?

—না, সেভাবে দেখিনি। কিন্তু মনে মনে কতবার তাঁকে অনুভব করেছি। চোখের দেখার চেয়ে সে আরও বড়। চোখ ও মন দুইই তো ইন্দ্রিয়, ভগবানকে বুঝবার ইন্দ্রিয় হল মন, চোখ নয়। যদি কেউ বলে ফুলের গন্ধ দেখবো—সে দেখতে পাবে না, কারণ গন্ধ অনুভব করবার ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র—চোখ নয়। এও তেমনি—

—তারপর কি করলেন ?

—আমার চাচাজীকে বললুম, নির্জনে থাকবো, আমায় আশ্রমে নিয়ে যাও, সাধন ভজনের ব্যাঘাত হচ্ছে সংসারের গোলমালে। তিনি নিয়ে আসতে চাননি প্রথমে। আমি অনাহারে রইলাম তিনদিন, মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পারেনি এই তিনদিনে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম পাঁচ বছর—তাঁর মৃত্যুর পরে একাই আছি।

—ভালো লাগে এখানে একা একা ?

—খুব ভালো লাগে। সংসারের গোলমাল সহ্য করতে পারিনে। এখানটা বড় নির্জন, মন স্থির করে থাকতে পারলে গৃহত্যাগীর পক্ষে এমন স্থান আর নেই।

—কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, আপনার পক্ষে ভয়ও তো আছে—

—সে সব ভয় কখনো করিনি। ভগবানের দয়ায় কোনো বিপদও কখনো হয়নি। সবাই মানে, আশপাশের গ্রামে আমার অনেক শিষ্য আছে, তারা প্রায়ই খোঁজ-খবর নেয়। সকালে দেখো এখন—তারা দুধ দিয়ে যায়, আটা দিয়ে যায়, লক্ষ্মীসরাইয়ের একজন শেঠজী চাল আটা পাঠিয়ে দেয় মাসে মাসে।

আমাদের রাত্রের খাবার তৈরী হল। চাপাটি আর ডাল মাতাজী কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও খুব ভালো না হলেও নিতান্ত খারাপ নয় দেখলুম, একপ্রস্থ বিছানা এখানে অতিথিদের জন্য মজুত থাকে, লক্ষ্মীসরাইয়ের শেঠজী তার ব্যবস্থা করেছেন, আমাদের কোনই অসুবিধে হল না।

হেমেন বললে, ভাই, রাত্রে মন্দির থেকে বেরুনো হবে না, বাঘের ভয় আছে ; মাতাজীকে না হয় ভগবান রক্ষা করে থাকেন অসহায় মেয়েমানুষ বলে, আমাদের বেলা তিনি অত খাতির নাও করতে পারেন তো ?

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করলুম। বনানীবেষ্টিত উপত্যকার নৈশ সৌন্দর্য দেখবার লোভ ছিল, কিন্তু হেমেন এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে না। মাতাজীও দেননি। তবে ঘুমের মধ্যেও আমরা আশ্রমের পার্শ্বস্থিত ঝরনার বারিপতনের শব্দ শুনেচি সারা রাত।

সকালে আমরা বিদায় নিলুম।

ফিরবার পথে আবার সেই বৃদ্ধ নারিকেলের ছায়াস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। অপূর্ব দৃশ্য বটে। শুনেছিলুম কাজরা ভ্যালিতে স্লেট পাথরের কারখানা আছে কিন্তু এখানে কোনোদিকে তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সামনের পাহাড়টা টপকে এপারে আসতে প্রায় বেলা নটা বাজলো।

স্টেশন যখন আরও পাঁচ-ছ মাইল দূরে, তখন ভাগলপুরের ট্রেন বেরিয়ে গেল।

হেমেন বললে, আর তাড়াতাড়ি করে হেঁটে কি লাভ, এসো কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। ট্রেন আবার সেই সন্ধ্যাবেলা।

সামনে একটা ক্ষুদ্র বস্তি পাওয়া গেল, তার নাম গোকর্ণটোলা, সে যুগের নামের মতো শোনায় যেন।

একজন বৃদ্ধ লোক ইঁদারার পাড়ে স্নান করছে, তাকে আমরা বললুম, এখানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ ঘাড়-নেড়ে বললে—না।

আমরা চলে যাচ্চি দেখে সে আবার আমাদের পিছু ডাকলে। যদি আমরা কিছু মনে না করি, কোথা থেকে আমরা আসচি, সে কি জিজ্ঞেস করতে পারে?

—কাজরা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে।

—পুণ্য করে আসচেন বলুন—

—হয়তো।

—বেশ ভালো লাগলো আপনাদের?

—চমৎকার।

—ভাগলপুর থেকে বাংগালি বাবুরা আমার ছেলেবেলায় অনেক আসতেন আশ্রম দেখতে। এখন আর আসেন না। আপনারা আসুন, আমার বাড়িতে এবেলা থাকবেন। বড় খুশী হবো।

কারো বাড়ি গিয়ে ওঠা আমাদের ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু যখন এসব স্থানে দোকান-পসার নেই, অগত্যা রাজি না হয়ে উপায় কি।

বস্তির মধ্যে যাবার আগ্রহ আমাদের কারো ছিল না। বিহারের এই সব গ্রাম্য বস্তি অত্যন্ত নোংরা, গায়ে গায়ে চালে চালে বসত, গ্রামের প্ল্যান নেই—দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটুখানি জায়গা নিয়ে কতকগুলো প্রাণী পরস্পরকে জড়াজড়ি করে তাল পাকিয়ে আছে যেন। ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে বাস করার বাধা কিছুই ছিল না, এ রকম অবাধ মুক্ত মাঠের মধ্যে জমির দামও বিশেষ আক্রা নয়—কিন্তু ওদের কুশিক্ষা ও সংস্কার তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েচে।

কারো বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান পর্যন্ত নেই—একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বিহারের এই গ্রাম্য বস্তিগুলি দেখলে বোঝা যায়—সত্যিই দেখলে বোঝা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞান-হীনতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে। এক বাড়ির দেওয়ালে পাশের বাড়ি চালা তুলেচে—অর্থাৎ তিনখানা দেওয়ালে দুইটি পৃথক পৃথক গৃহস্থের বাড়ি। কেন যে ওরা এ রকম করে তা কে বলবে? জায়গার কিছু অভাব আছে এই শহর থেকে বহুদূরে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, বুনো জায়গায়?

তা নয়। ওরা লেখাপড়া জানে না, স্বাস্থ্য কি করে বজায় রাখতে হয় জানে না—কেউ

ওদের বলেও দেয় না। চিরকাল যা করে আসচে ওদের গ্রাম্য অঞ্চলে, ওরাও তাই করে। কল্পনাহীন মনে নতুন ছবিও জাগে না। সেই ঠেসাঠেসি খোলার চালা, ফণিমনসার ঝোপ, রাঙা মাটির দেওয়াল, গোরু ও মহিষের অতি অপরিষ্কার ও নোংরা গোয়াল বাড়ির সামনেই—তাল বা শালগাছের কড়িতে খোলার চালের নীচে শুকনো ভুট্টার বীজ ঝুলচে—মেয়েদের পরনে রঙীন ছাপাশাড়ি, যা বোধ হয় তিনমাস জলের মুখ দেখেনি—হাতে রুপোর ভারী ভারী পৈঁছে ও কঙ্কণ, বাহুতে বাজু—পায়ে ততোধিক ভারী কাঁসার মল।

এইসব বস্তি প্লেগ ও কলেরার বিশেষ লীলাভূমি—একবার মহামারী দেখা দিলে সাত-আট দিনের মধ্যে বস্তি সাফ করে দেয়।

আমরা গিয়ে এমনি একটা খোলার ঘরের দাওয়ায় বসলুম একটা দড়ির চারপাইয়ের ওপর। বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একরাশ এসে জুটলো সামনে। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় আজন্ম ওরা স্নান করেনি, কাপড়ও কাচেনি।

আমরা জিগ্যেস করলুম—গ্রামে পাঠশালা আছে?

বৃদ্ধ বললে—এ টোলায় নেই—সহদেবটোলায় আছে। প্রাইমারী স্কুল।

—ছেলেরা সব যায় সেখানে?

—সবাই যায় না বাবুজি, বড় হয়ে গেলে ছেলেরা গোরু মহিষ চরায়, ক্ষেত-খামারে কাজ করে—লেখাপড়া করলে কি সকলের চলে বাবুজি!

বৃদ্ধ আমাদের হাতমুখ ধোবার জল নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল ইঁদারার জল। তবুও অনেকটা ভালো। বস্তির মাঝখানে যে ছোট্ট পুকুর দেখে এসেচি তার জল হলে আমাদের জল ব্যবহার স্থগিত রাখতে হত।

—আপনারা আটা খাবেন, না ছাতু?

—যা আপনাদের সুবিধে হয়। তবে আটাই বোধহয়—

—আচ্ছা আচ্ছা, বাবুজি। আপনারা চুপ করে বসে বিশ্রাম করুন—আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। ওরা আমাদের জন্যে রাঁধবার বন্দোবস্ত করে দিলে। সে এক-হিসেবে ভালো বলেই মনে হল আমাদের কাছে। নিজের চোখে জিনিসগুলো দেখে ধুয়ে বেছে তবুও নিতে পারা যাবে।

এদের আতিথ্য অত্যন্ত আন্তরিক ও উদার—এদের সারল্য অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না—কেবল মনে হয়, যদি কেউ এদের স্বাস্থ্যের বিধি-নিষেধগুলো বলে দেওয়ার থাকতো!

আমরা পাশের একটা ছোট চালায় রান্না চড়ালুম। গ্রামের লোকে অনেকে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের রান্না। আলু ও লাউএর তরকারি আর আটার রুটি। চাটনির জন্যে ছিল চুকো পালং, কিন্তু আমরা চাটনি কি করে রাঁধতে হয় জানিনে। হেমেন বললে তার অনেক হাঙ্গাম, সুতরাং চাটনি রান্না বন্ধ রইল। দুজনে পরামর্শ করে অতিকষ্টে লাউএর তরকারি নামালুম; এদের কাছে ধরা না পড়ি যে, আমরা রান্না জানি না।

কথাবার্তা চললো খাওয়া-দাওয়ার পরে। এই অঞ্চলের পল্লীজীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ

করা গেল ওদের কাছ থেকে। গ্রামের সব লোকই চাষী—গম ও ভুট্টা এই দুটি প্রধান ফসল। অধিবাসীর সবাই হিন্দু, তার মধ্যে অধিকাংশ দোশাদ অর্থাৎ মেথর, বাকি সকলে কুর্মি—একঘর রাজপুত। লেখাপড়া বিশেষ কেউ কিছু জানে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কেউ করে না, বেশিদূর কেউ যায়নি কখনো গ্রাম ছেড়ে। আমাদের গৃহস্বামী ওদের মধ্যে কিছু এলেমদার—জমিজমা-সংক্রান্ত মামলাতে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের পরামর্শদাতা ও দলিললেখক। মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বারকয়েক মুঙ্গের ও পাটনা গিয়েচে।

এদের প্রধান খাদ্য আটার রুটি ও মকাইএর ছাতু। তরকারির মধ্যে জন্মায় রামতরুই, পটল, বেগুন, কয়েক প্রকারের শাক, সকরকন্দ আলু। গোল আলু ও কপি এ অঞ্চলে জন্মায় না—ওসব দুর্মূল্য শৌখিন তরকারি এরা নাকি তত পছন্দও করে না।

প্লেগ গত দুতিন বৎসর দেখা দেয়নি—তার বদলে দেখা দিয়েছিল কলেরা। অনেক লোক মরেছিল।

আমরা বললুম—ডাক্তার নেই এখানে।

—না বাবু, কিউল থেকে আনতে হয়—তা অত পয়সা খরচ করে সবাই তো পারে না।

—কলেরার সময় কি করো?

—গতবার গভর্নমেন্ট থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অশিক্ষিত পল্লী নিয়ে বিহার ও বাংলা। শহরে বাস করে জাতির দুঃখ-দুর্দশা জানা সম্ভব নয়। বাংলা ও বিহারের বহুস্থান এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়ায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে—কি শিক্ষায়, কি মতামতে, কি জীবিকার্জনের প্রণালীতে। উড়িষ্যার একটি নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে একবার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল, সেখানেও এইরকমই দেখেচি। তবে আমার মনে হয়েচে বিহারী পল্লীবাসীরা বেশি অপরিচ্ছন্ন, উড়িষ্যা-বাসীদের অপেক্ষা। উড়িয়া গৃহস্থের বাড়িঘর গোবর-মাটি দিয়ে বেশ লেপামোছা, লোকগুলিও এত অপরিষ্কার নয়। উড়িষ্যার পল্লীগ্রামের কথা পরে বলচি।

আমরা বেলা তিনটের সময় গোকর্ণটোলা থেকে কাজরা স্টেশনের দিকে রওনা হই। বৃদ্ধ গৃহস্বামী গল্প করতে করতে প্রায় এক মাইল রাস্তা আমাদের সঙ্গে এল। আমরা তাকে বার বার বলে এলুম বিদায় নেবার সময়, ভাগলপুরে মামলা করতে আসে যদি কখনো, তবে যেন আমাদের বাসায় এসে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় কাজরা থেকে ট্রেন ছাড়লো।

একদিন দুপুরের ট্রেনে আমি ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ দেখতে গেলাম।

সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল কি তার কিছু কম হেঁটে গঙ্গার ধার। সেখানে এসে নৌকো করে গৈবীনাথ যেতে হয়—কারণ গৈবীনাথ একটা ছোট পাহাড়, সোজা গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠেচে। পাহাড়ের ওপর গৈবীনাথ শিবের মন্দির।

আমি যেদিন গিয়েছিলুম, সে দিন ওখানে লোকের যাতায়াত ছিল কম। রেলের ধারে

বলে, গৈবীনাথে প্রায়ই শনি বা রবিবার লোকজনের ভিড় একটু বেশিই হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম যত ভালো জায়গায় হোক, অতদূর রাস্তা আর বনজঙ্গলের মধ্যে বলে সেখানে বড় একটা কেউ যেতে চায় না, যদিও কিউল থেকে জামুই আসবার সময় বাঁ-দিকে যে পাহাড়-শ্রেণী ও জঙ্গল দূরে দেখা যায়—ওই হল ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সেই পাহাড়—কিন্তু ই আই রেলওয়ের মেন লাইনের কোনো স্টেশনে নেমে সেখানে যাবার রাস্তা নেই—লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন ছাড়া।

মস্ত বড় একটা তীর্থস্থান না হলে, যে কষ্টটা হবে তার অনুপাতে পুণ্য কতখানি অর্জন করে আনতে পারা যাবে সেটা খতিয়ে না বুঝে—শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার লোভে লোকে অত কষ্ট স্বীকার করে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম অত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নয়। কে শুনেচে ওর নাম ?

কিন্তু গৈবীনাথে যাতায়াতের সুবিধে খুব—স্টেশন থেকে দু পা হাঁটলেই হল। গঙ্গাগর্ভে পাহাড়, তার ওপরে শিবমন্দির—এর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম-টাশ্রমের তুলনা হয় ? বিশেষ করে, যেখানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে তেরো মাইল রাস্তা ভেঙে ? গৈবীনাথ মন্দিরে আমি আরও দুবার গিয়েচি, একবার আমার ভগ্নী জাহ্নবী ও আমার ভাই নুটু সঙ্গে ছিল—ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল দেবতাবাবুও সেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

প্রথমদিন একা গিয়ে যে অনুভূতি ও আনন্দ পেয়েছিলুম—ঠিক সে ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা অন্য অন্য বার হয়নি।

আমি গিয়ে প্রণাম করে বললুম—বাবাজী, আশীর্বাদ করুন।

সাধু হিন্দীতে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা।

—আপনি এখানেই থাকেন ?

—না, মাস-দুই এসেচি—

—তবে কোথায় থাকেন ?

—কন্যা-কুমারিকা থেকে উত্তরে বদরী-বিশাল পর্যন্ত সব তীর্থস্থানেই আমার যাতায়াত। তেরো বার বদরী-বিশাল গিয়েচি। আমাদের আসবার কি ঠিক আছে কিছু। এখন এখানেই আছি।

পুরুষমানুষ না হলে সন্ন্যাসী সেজে লাভ ? এঁকেই বলি প্রকৃত সাধু। এঁর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সে সন্ন্যাসিনী কিছুই নয়। ঢাকের কাছে টেমটেমি।

ভক্তিতে আমি আপ্লুত হয়ে পড়লুম।

সাধুজী আমায় বললেন—ঘর কোথায় ?

—কলকাতায়।

—ব্রাহ্মণ ?

—জী হ্যাঁ।

সত্য কথা বলবো, সাধুবাবা আমার কাছে এক পয়সাও চান নি। আমি একটি সিকি

তাঁর পায়ের কাছে রাখলুম। তিনি সেটা হাতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হল আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন হয়েচেন।

সাধুজী বেদান্তের ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিলেন—মায়া কি, অধ্যাত্ম কি, ইত্যাদি। আমার সে সব শুনবার আগ্রহের চেয়েও তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনবার আগ্রহই ছিল প্রবলতর। কিন্তু সাধুজীর মনে কষ্ট দিতে পারলুম না—আধঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে বেদান্তব্যাখ্যা শুনবার পরে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের ওপরে এসে বসলুম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্চে। রক্ত সূর্যাস্তের আভা পড়েচে গঙ্গার বুকের বীচিমালায়, গৈবীনাথের মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের গায়ে, এপারের গাছপালায়। জামালপুরের মারক পাহাড় পশ্চিম আকাশের কোলে নীল মেঘের মতো দেখাচ্চে।

গৈবীনাথের মন্দিরের ঠিক নীচে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে, সেটাও দেখে এসেচি। তার মধ্যে এমন কিছু দেখবার নেই। তবে এই রকম রক্তাভ অপরাহ্নের আকাশতলে পাহাড়ের ওপরে পা ঝুলিয়ে গঙ্গায় এবং গঙ্গার অপর-তীরবর্তী সুবিস্তীর্ণ চরভূমির দিকে চোখ রেখে নিরিবিলি বসে থাকার বিরল সৌভাগ্য ঘটেছিল বলেই গৈবীনাথ-তীর্থদর্শন আমার সফল হয়েছিল।

কতক্ষণ বসে থাকবার পরে হঠাৎ কখন জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলতর হয়েচে দেখে চমক ভাঙলো। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ট্রেন—সেবার যে ট্রেনে কাজরা থেকে এসেছিলাম ভাগলপুরে।

এদিকে মনে প্রবল বাসনা রাত্রিটা এখানে থাকলে ভালো হয়।

অগত্যা সাধুবাবাজীর কাছেই আবার গেলাম। তিনি শুনে বললেন—মন্দিরের মোহান্তজীকে একবার বলে দেখ। আমি তোমাকে বড়জোর একখানা কম্বল দিতে পারি, অন্য কিছুই নেই আমার।

মোহান্তজীকে গিয়ে ধরলাম। আমার আবেদন শুনে তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলেন—বললেন—থাকবার অন্য জায়গা নেই—রাতে মন্দির বন্ধ থাকে, পাশের বারান্দায় থাকতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিছানা আছে?

—কিছু নেই, তবে সাধুজী একখানা কম্বল দেবেন বলেচেন।

—এখানে গঙ্গার বুকে রাত্রে বেশ শীত পড়বে, খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারবে?

—খুব। ও আমার অভ্যেস আছে। আপনি থাকবার অনুমতি দিলেই হয়।

—থাকো, কিন্তু খাবে কি?

—কিছু দরকার নেই।

—তোমার খুশি।

কিন্তু সেখান থেকে জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না—সাধুজীর কাছে আবার ফিরে গিয়ে দেখি মুঙ্গেরের এক শেঠজি সেখানে বসে। আমার প্রস্তাব শুনে শেঠজি আমায় প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনিও স্টেশনে যাবেন, তাঁর

একা এসে আছে গঙ্গার ধারে—সেখানে রাত্রে থাকবার জায়গা নয়, ভীষণ শীত করবে, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর কম্বল নিলে ওঁর বড় অসুবিধে হবে রাত্রে।

আসল কথা পরে বুঝেছিলাম—সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধার থেকে সুলতানগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত পথটি খুব নিরাপদ নয়। বেশি দূর নয় যদিও, তবু দু একটা রাহাজানি হয়ে গেছে ইতিপূর্বে। শেঠজির কাছে কিছু টাকা ছিল, তিনি একজন সঙ্গী খুঁজচেন।

সাধুজির সামনে শেঠজি কম্বলের কথা প্রথমে বলেননি—আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,—আপনি কম্বল নিলে সাধুজি শীতে জমে যাবেন রাত্রে। উনি বুড়ো মানুষ—নেবেন না ওঁর কম্বল। আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

একথা আমার আগে কেন মনে হয়নি ভেবে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

তারপর দুজনে এসে নৌকোর চড়ে তীরে নামলাম। একা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন আসবার অল্প সময় যখন বাকি, তখন একাওয়ালা আমাদের স্টেশনে পৌছে দিল।

গৈবীনাথ আর যে-দুবার গিয়েচি, তখন এমন নির্জন ছিল না স্থানটি—এবারকারের মতো আনন্দ পাইনি আর সেখানে।

এই সঙ্গে আরও একটি দেবমন্দিরের কথা বলি। আমার খুব ভালো লাগতো জায়গাটি—যদিও স্থানীয় গ্রাম্য লোক ছাড়া সেখানে অন্য লোক কখনও যায়নি।

থানা বিহিপুর স্টেশন থেকে ছ-সাত মাইল দূরে পর্বতা বলে একটি গ্রাম আছে। আমাকে একবার কি কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল—স্থানটি উত্তর-বিহারের অন্তর্গত, সুতরাং বাংলা-দেশের মতো অনেকটা শ্যামল প্রকৃতির। এক জায়গায় পথের ধারে এমন নিবিড় বৃক্ষরাজির সমাবেশ যে, সত্যিই বাংলাদেশে আছি বলে ভ্রম হয়। সময় ছিল দুপুরের কিছু পরে। আমি গাছতলায় একটুখানি বিশ্রাম করচি, এমন সময়ে রামশিঙা বেজে উঠলো কোনো দিকে।

আমার সামনে দিয়ে দু-তিনটি গ্রাম্য লোক পেতল ও কাঁসার কানা-উঁচু থালা হাতে বনের ওপারে কোথায় যাচ্চে দেখে তাদের একজনকে বললুম—কোথায় শিঙে বাজচে হে?

একজন আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—রামজীর মন্দিরে। নদীর ধারে—আমরা সেখানে প্রসাদ আনতে যাচ্চি—ভোগের সময় শিঙে বাজে রোজ।

আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। নদীর স্থানীয় নাম বুঢ়ল নদী—আমাদের কাটিগঙ্গার খালের চেয়ে যদি কিছু বড় হয়। তার ধারে অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম ও দেবমন্দিরের কারুকার্য সাধারণ গ্রাম্য স্থপতির পরিকল্পিত, এই একই গড়নের মন্দির উত্তর-পূর্ব বিহারের প্রায় অনেক গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র মন্দির, কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন জমি আছে অনেকটা। নদীর ধারে সুন্দর ফুলবাগান, সমস্ত স্থানটি ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একজন বৃদ্ধ মোহান্ত মন্দিরে থাকেন,.তিনি আমায় প্রসাদ খেতে আহ্বান করলেন। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। তিনি আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আমি বললাম—এ মন্দির কতদিনের ?

—অনেক দিনের বাবা, আমিই তো এখানে আছি পঁচিশ বছর।

—কে স্থাপন করেছিল মন্দিরটি ?

—দ্বারভাঙার মহারাজ তাঁর জমিদারি বেড়াতে এসে এই জায়গাটি বড় পছন্দ করেন, শুনেচি তিনিই মন্দির করে দিয়েছিলেন। বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, ওঁদেরই দান।

—আয় কত হবে ?

—বছরে তিন-চারশো টাকা, তবে ঠিকমতো আদায় হয় না সব বছর, লোকজনের প্রণামী ও মানত ইত্যাদির আয়েও কিছুটা ব্যয়নির্বাহ হয়।

আমার জন্যে খাবার এল সরু আতপ চালের ভাত, অড়রের ডাল ও কি একটা তরকারি; এসব দিকে বাংলাদেশের মতো দু-তিন রকম আনাজ মিশিয়ে ব্যঞ্জন রন্ধনের পদ্ধতি প্রচলিত নেই—আলু তো শুধু আলুরই তরকারি, বেগুন তো শুধু বেগুনেরই তরকারি। সে তরকারি বাঙালীর মুখে ভালো লাগে না—কিন্তু ডাল এত চমৎকার রান্না হয় যে বাংলাদেশে কচিৎ তেমনটি মেলে।

মোহান্তজীর মুখে শুনলুম দুবেলা প্রায় পঞ্চাশজন অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্র গ্রাম্যলোক ঠাকুরের প্রসাদ পায়। দুটি বৃদ্ধশিষ্য আছে মোহান্তজীর, তারাই রান্না করে দুবেলা। কোনো মেয়ে, তা সে যে-বয়সেরই হোক, আশ্রমে রাখবার নিয়ম নেই। বিহারের নির্জন পল্লীপ্রান্তে পর্বতের এই মন্দির মনে একটি উজ্জ্বল নবীনতা ও পরম শান্তির সৃষ্টি করে; এর স্বল্পায়োজন-মাধুর্য মনকে এমন অভিভূত করে যে অনেক বৃহৎ আয়াস তার ত্রিসীমানায় পৌঁছুতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় যখন আশ্রম থেকে চলে আসি, তখন মোহান্তজী আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এলেন।

তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম মন্দিরের আয় বাড়ানোর দিকে—অবিশ্যি নিজের স্বার্থের জন্যে নয়। গ্রামের অনেক গরিব লোক দুবেলা এখানে প্রসাদ পেয়ে থাকে, আরও কিছু আয় বাড়লে আরও বেশি লোককে খাওয়াতে পারতেন।

মোহান্তজী প্রকৃতই অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং বালকের মতো সরল। তাঁর ধারণা এ ধরনের একটা সৎকাজের কথায় যে কেউ টাকা দিতে রাজি হবে। শুধু মুখের কথা খসাবার অপেক্ষা মাত্র।

তাঁর সরলতা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম—মোহান্তজী, আপনি একবার ভাগলপুরে আসুন না, আপনাকে দু-এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিজেই বুঝবেন কে কেমন দিচ্ছে।

চাঁদ উঠেছিল।

চারধারে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিবির ওপর ক্ষুদ্র বন, দূরে দূরে শীসম্ গাছ—বিহারের শীসম্ গাছ একদিকে একটু হেলে থাকে—অনেকগুলো থাকে এক সারিতে।

যাকে শিশু গাছ বলে, সে সম্পূর্ণ আলাদা গাছ, যদি-চ সীসম্ গাছের কাঠেও বেশ মজবুত তক্তা হয় শুনেচি।

মোহান্তজী বললেন—বাবু, মনে থাকবে আমার কথা ?

—খুব থাকবে, তবে আপনি নিজে না এলে কিছু করতে পারবো না।

হঠাৎ আমায় মোহান্তজী বললেন—আসুন, আপনার সঙ্গে পাঁড়েজীর আলাপ করিয়ে দিই।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় অনেকগুলো চালাঘর দেখা গেল। কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ি নেই। দূরে নিকটে অনেকগুলি সীসম্ গাছের সারি।

আমি একটু ইতস্তত করলাম যেতে, কারণ স্টেশনে গিয়ে আমায় ট্রেন ধরতে হবে। মোহান্তজী আমার কোনো আপত্তি শুনলেন না—পরে অবিশ্যি বুঝলাম তিনি আমায় পাঁড়েজীর আশ্রমে রাত্রে রাখবার জন্যে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গেও আসছিলেন। মোহান্তজী বাড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিতেই একজন লোক বার হয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম করে বললে—আসুন বাবাজী, ইনি কে ?

—ইনি ভাগলপুরের বাংগালি বাবু—আশ্রমের অতিথি—

—আসুন বাবুজি, আমার বড় সৌভাগ্য—উঠে এসে বসুন।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছিল। চারদিকে চেয়ে দেখি বাড়ির উঠানে এবং ঘরের দাওয়ায় বড় বড় জালায় ও হাঁড়িতে কি সব রক্ষিত আছে—কিসের একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে চারিদিকে। বাড়িতে আমরা একেবারে ভেতরের উঠোনেই গিয়ে হাজির হয়েচি– পাঁড়েজী একাই থাকেন বলে মনে হল, বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ নেই। বাড়িটা কিসের একটা কারখানা। কিসের কারখানা ভালো বুঝতে পারছিলুম না সন্ধ্যার অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে।

বাড়ির মধ্যেকার উঠানে আরও অনেক বড় বড় হাঁড়ি-কলসী, সেগুলিতেও কি যেন বোঝাই রয়েচে। সেই এক ধরনের উৎকট গন্ধ। কিসের কারখানা এটা ?

হঠাৎ আমার মনে হল বে-আইনি মদের চোলাইখানা নয় তো ? কিন্তু মোহান্তজীর মতো সাধুপুরুষ কি এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রাখবেন ?

আমাকে চারিদিকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের চোখে চাইতে দেখেই বোধহয় পাঁড়েজী (ওর নাম শ্রীরাম পাঁড়ে) বললে—কি দেখচেন বাবুজি ?

আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—না, ওই কলসীগুলোতে কি তাই দেখচি।

পাঁড়েজী হেসে বললে—কি বলুন তো ?

—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে—কিসের একটা গন্ধ বার হচ্চে—

—আচ্ছা, কাছে গিয়ে দেখুন না বাবুজি—

প্রত্যেক কলসীতে সাদা সাদা কি জিনিস, দুধের মতো। কিন্তু এত দুধ কি হবে এখানে, আর সন্ধ্যাবেলায় এত দুধ কলসীতেই বা কেন ? দুধ কি রাত্রিবেলা খোলা উঠানের মধ্যে ফেলে রাখে ?

মোহান্তজীও কৌতুকপূর্ণ হয়ে বললেন—কি বাবুজি, কি দেখলেন ?

পাঁড়েজী বললে—বাবু, ও-সব কলসীতে ঘোল বুঝতে পারলেন না ?

এত ঘোলের কলসী একত্র কখনো জীবনে দেখিনি। কি করে বুঝতে পারবো ? কিন্তু এত ঘোল এল কোথা থেকে ?

ওদের ঘরের দাওয়ায় আমাদের জন্তে জলচৌকি পেতে দিল শ্রীরাম পাঁড়ে। আমরা বসলুম—তারপর মোহান্তজীর মুখে ব্যাপারটা শোনা গেল, এটা মাখনের ও ঘিয়ের কারখানা।

দুধ অত্যন্ত সস্তা এসব অঞ্চলে, টাকায় ষোল সের পর্যন্ত বিক্রী হতে দেখেচি ; মহিষের দুধ বরং একটু চড়া দরে বিক্রী হয়, কারণ ঘি করবার জন্তে মহিষের দুধ গোয়ালারা কেনে, কিন্তু গোরুর দুধের দাম নেই এখানে—গোরুর দুধের মাখন ও ঘি করবার রেওয়াজ নেই এখানে।

শ্রীরাম পাঁড়ের বাড়ি ছাপরা জেলায়। সে এক মাখন-তোলা কল নিয়ে এসে এই মাঠেরই মধ্যে প্রথম একখানা চালাঘর তুলে বসে—সে আজ এগারো বছর পূর্বের কথা।

এই এগারো বছরের মধ্যে শ্রীরামের ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠেচে যে ওকে মাঠের মধ্যে অনেকখানি জমি নিয়ে ঘিরে বড় বড় দুখানা আটচালা ঘর, আর ছোট ছোট চালাঘর অনেকগুলি করতে হল, মাখন-তোলা কল আরও দুটো এনেচে। তার ব্যবসা খুব জোর চলেচে।

আমার বড় ভালো লাগলো মোহান্তজীর এই গল্প। শ্রীরাম পাঁড়েকে আমি যেন নতুন চোখে দেখলুম। লোকটা খুব নিরীহ ধরনের, মুখে বেশি কথা বলে না—বোধহয় কথা বলে না বলেই কাজ বেশি করে।

—আপনার এখানে কত দুধ লাগে রোজ ?

—তার কিছু ঠিক নেই বাবুজি—পনেরো মণ দুধের মাখন সাধারণত হয়, তবে-একদিন হয়তো বিশ-বাইশ মণ দুধ এল। তিনটে কল হিমশিম খেয়ে যায়।

—কলসীতে অত ঘোল কিসের ? ওতে কি হবে ?

—রোজ পনেরো বিশ মণ দুধের ঘোল তো সোজা নয় বাবু। এত ঘোল সব আমি রেলে চালান দিই। পূর্ণিয়া অঞ্চলে ওর খুব বিক্রী। পড়তে পায় না বাবু।

—মাসে কত ঘি হয় তোমার কারখানায় ?

—আমি ঘি তত করিনি বাবু, মাখন চালানিতে লাভ বেশি। বেশি দুধ হলে খোয়া ক্ষীর করি। তবে চারমণ ঘি মাসে চালান দিই।

—কত লোক খাটে ?

দুধ সংগ্রহ করে আনবার জন্তে আট-দশ জন লোক রাখতে হয়েছে। ওরা রোজ ভোরে উঠে গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে আসে। গোয়ালারা নিজেরাও দুধ দিয়ে যায়—সব দাদন দেওয়া আছে। তা ছাড়া কারখানায় আরও দশ বার জন লোক খাটে। ছাপরা জেলা থেকে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে লোকটা অত্যন্ত সামান্ত মূলধন নিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করে এখন বেশ উন্নতি করে তুলেছে—ওর কথা থেকে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা গেল। আমি ভাবলুম আমার দেশের বেকার যুবকদের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বার হয়ে সামান্ত

ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরি যোগাড় করতে পারলে আমরা জীবন ধন্য মনে করি— দুঃখের বিষয়, তাও জোটে না। আমাদের মধ্যে দেশবিদেশে গিয়ে নিজেকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাই জাগে না—তাই আমাদের দুঃখ।

শ্রীরাম পাঁড়ে রাত্রে আমায় থাকতে বললে। মোহান্তজীও বললেন—বাবুজি, আমার ওখানে থাকবার জায়গা নেই ভালো—সেইজন্যে এখানে আনলাম। মন্দিরে আপনাদের দরের অতিথি এলেই পাঁড়েজীর বাড়িতে রাখি। পাঁড়েজী বড় ভালো লোক। রাত্রে কোথায় যাবেন—এখানেই থাকুন।

আমারও এত ভালো লেগেছিল পাঁড়েজীকে, তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। এর এই ব্যবসার কথা ভালো করে জেনে গিয়ে বাংলা দেশের বেকার যুবকদের যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি ?

রাত্রে আমার জন্যে উৎকৃষ্ট ঘিয়ে তৈরী পুরী আর হালুয়া, কি একটা তরকারি আর গরম দুধ এনে হাজির করলে পাঁড়েজীর রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। সে ধরনের ঘিয়ে তৈরী খাবার বাংলা-দেশে আমি কখনো চোখেও দেখিনি, পশ্চিমেও নয়—কেবল আর দু-একটা জায়গা ছাড়া।

পাঁড়েজীকে বললুম—ভাগলপুরের বাজারেও তো এমন ঘি মেলে না। কি চমৎকার গন্ধ। ভয়সা ঘি কি এমন হয় ? পাঁড়েজী হেসে বললে—কোথায় পাবেন বাবুজি ? ঘি যা বাজারে আপনারা পান, তা হল পাইল করা, অর্থাৎ অন্য বাজে ঘি বা চর্বি মেশানো। ভেজাল ভিন্ন ঘি বাজারে নেই জানবেন, যে যত বিজ্ঞাপনই দিক। তবে কোনো ঘিয়ে কম, কোনো ঘিয়ে বেশি ভেজাল—এই যা তফাত। আর এ হল আমার কারখানায় সদ্য তৈরী খাঁটি ভঁয়সা। এ কোথায় পাবেন বাজারে ?

মোহান্তজীও আমার সঙ্গে ভোজনে বসেছিলেন। দেখলুম যদিও তার বয়স হয়েচে—কিন্তু আমার মতো তিনটি লোকের উপযুক্ত পুরী, তরকারি ও হালুয়া অবাধে উদরসাৎ করলেন। মোহান্তজীকে আমার বড় ভালো লাগলো, এমন নিরীহ সজ্জন মানুষ খুব কম দেখা যায়।

এক এক জায়গায় এক এক ধরনের মানুষের ছাঁচ থাকে—অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বাংলার বাইরে আমি নিছক নিরীহ, সরল ও ভালোমানুষ লোকের যে ছাঁচ দেখেছি, বাংলাদেশে তা দেখিনি।

হয়তো ঠিক ব্যাপারটা বোঝাতে পারচিনে—কিন্তু একথা খুব সত্যি, বাংলার অতি অজ পাড়াগাঁয়েও লোকের খানিকটা কুটিল বুদ্ধি, খানিকটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, খানিক চালাক-চতুরতা আছে। এসব থাকলেই আর লোক নিছক সরল টাইপের হল না। তা মেয়েদের কথাই বা কি, আর পুরুষদের কথাই বা কি। এর কারণ বাঙালীর মধ্যে অতিনির্বোধ লোক নেই বললেই হয়—ওদের অনেকখানি জন্মগত শিক্ষা-দীক্ষা আছে—তাতে সংসারের অনেক ব্যাপারে ওদের অভিজ্ঞতা আপনা-আপনি হয়—রেলে বা স্টীমারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াতের বেশি সুবিধে বাংলাদেশে। তা থেকেও লোকে অনেক বাইরের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে।

বাংলাদেশে আমি খুব নিরীহ লোক ভেবে যার কাছে হয়তো গিয়েচি, দেখেচি সে আসলে অনেক কিছু জানে বা বোঝে—ফলে তার মনের নিছক সারল্য নষ্ট হয়ে গিয়েচে। কিন্তু বাংলার বাইরে আমি আশ্চর্য ধরনের সরল ও নিরীহ লোক দেখেচি—তাদের শিশুসুলভ সারল্য কতবার আমাকে মুগ্ধ করেচে। আমি আমার জীবনে এ-ধরনের সরল লোক খুঁজে বেড়িয়েচি—আমার আবাল্য ঝোঁক ছিল এদিকে, মানুষের টাইপ খুঁজে বার করবো। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখেচি বিহার ও সি-পিতে, ছোট নাগপুরে এই সরল টাইপটা বেশ পাওয়া যায়। এখনও পাওয়া যায়। তবে আজকাল নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

মানুষের মনকে বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা একটি কলের ছাঁচে গড়চে। সব এক ছাঁচ, রামও যা ভাবে শ্যামও তাই ভাবে, যদু মধুও তাই ভাবে। যে আর একজনের মতো না ভাবে—তাকে লোকে মূর্খ বলে, অশিক্ষিতও বলে—সুতরাং সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, শ্বশুরবাড়িতে শালীশালাদের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে—লোকে অন্য রকম ভাবতে ভয় পায়। ফলে শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিক রীতিনীতিতে একই ছাঁচের মনের পরিচয় পাওয়া যায় সর্বত্র, অনেক খুঁজেও খাঁটি ওরিজিন্যাল টাইপ বার করা যায় না। শহরে তো যায়ই না, শহর থেকে সুদূরে, নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বড় একটা দেখা যায় না। তবে বাংলার বাইরে, যেখানে ইউনিভারসিটি, খবরের কাগজ, রেডিও প্রভৃতির উৎপাত নেই, কিংবা শিক্ষিত লোকের যাতায়াত কম, এমন অরণ্য অঞ্চলে—নিকটে যেখানে রেলস্টেশন বা মোটর বাসের চলাচলের পথ নেই—সেখানে দু একটা অতি চমৎকার ছাঁচের মানুষ দেখেচি।

এদের আবিষ্কারের আনন্দ আমার কাছে একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সমান। মোহান্তজী অনেকটা সেই ধরনের মানুষ।

তিনি রাত্রে মন্দিরে ফিরে যাবার আগে আমায় বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন আমার ভাগলপুরস্থ বন্ধুবান্ধবকে বলে তাঁর মন্দির মেরামতের ও মন্দিরের আয় বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দিই। অনেকখানি সরল আশা-ভরসা তাঁর চোখে মুখে—বহু দূরকালের ছায়া তাঁর জীবনে এমন একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেচে—তা থেকে হুঁশিয়ার ও হিসাব-দুরন্ত বর্তমানে তিনি কোনোদিনই যেন পৌঁছতে পারবেন না, কোনোদিনই বুঝবেন না এর কুটিলতা, আর আত্মস্বার্থবোধ।

আমি বললুম—মোহান্তজী, আপনি চলে আসুন না ভাগলপুরে?

—আপনি যেতে বললেই যাবো, টাকা একসঙ্গে জড় হলে নিয়ে আসব গিয়ে।

তারপর আমায় একান্ত চুপিচুপি বললেন—এই পাঁড়েজী আমায় বড় সাহায্য করে—

—কি রকম?

—ভদ্রলোক এলে ওর এখানে রাখি, ও আমাকেও মাঝে মাঝে রাত্রে এখানে খাওয়ায়, বেশ খাওয়ায়—দেখলেন তো? ওর নিজের কারখানার ঘি মাখন—বাইরে কোথায় এমন পাবেন বলুন। রামচন্দ্রজী ওকে আরও দেবেন, বড় সাত্ত্বিক লোক।

যে নিজে সাত্ত্বিক সে সবাইকে এমনি সাত্ত্বিক ভাবে। আমরা নিজেরাও তত সাত্ত্বিক নই বলেই বোধ হয়, মানুষের খারাপ দিকটা আগে দেখে বসে থাকি।

শ্রীরাম পাঁড়ে সাত্ত্বিক কি না জানি না—কিন্তু সে বেশ ব্যবসা-বুদ্ধিওয়ালা লোক বটে। দুধ এখানে সস্তা, অথচ দুধ চালান দেবার সুবিধে নেই। একটা মাখন তোলা কল নিয়ে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ঘি মাখনের ব্যবসা গড়ে তুলেচে। এর কারণ আমাদের মতো ওদের চাকুরি-প্রবৃত্তি নেই—চোখ ওদের অন্যদিকে বেশ খোলে—আমরা এসব দেখতে পাইনে। আমরা হলে খুঁজতাম দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্টেটে কোনো চাকুরি যোগাড় করা যায় কাকে ধরাধরি করলে।

পরদিন সকালে আমি ওদের দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। এর পরে আর একবার আমাকে বিশেষ কাজে ওদিকে গিয়ে শ্রীরাম পাঁড়ের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, তখন সে আরও উন্নতি করেচে—লেখাপড়ার হিসেব ও চিঠিপত্র লেখবার জন্যে একজন গোমস্তা রেখেচে। মোহান্তজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল—মাত্র একটি দিনের জন্যে। তখন সামনে কুম্ভমেলার সময়, তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যাবার তোড়জোড় করছিলেন, পাঁড়েজীকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে বললেন। আমাকেও তিনি অনুরোধ করেছিলেন মেলায় যাবার জন্যে—অবিশ্যি আমার যাওয়া ঘটেনি। তাঁরা গিয়েছিলেন কিনা আমি জানি না—আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এ হল ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসের কুম্ভমেলা; তারপর আর কুম্ভমেলা হয়নি এখনো পর্যন্ত।

১৩৩৭ সালের কথা। পূজার ছুটি সেইদিনই হল।

ভাগলপুরে বার লাইব্রেরিতে বসে কথাবার্তা চলচে বন্ধুদের সঙ্গে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়। আমি বললুম—পায়ে হেঁটে কোনোদিকে যদি যাওয়া যায়, আমি রাজি আছি।

প্রবীণ উকিল অবিনাশবাবু বললেন—হেঁটে যাওয়ার বেশ চমৎকার রাস্তা আছে, চলে যান না দেওঘর। সিনারী খুব ভালো।

আমি তখনি যেতে রাজি। একজন মাত্র উকিল-বন্ধু অম্বিকা আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। পরদিন সকালে আমরা আমার থাকবার জায়গা থেকে রওনা হলুম খুব ভোরে। তিন-চারজন উৎসাহী বন্ধু ভাগলপুর শহর ছাড়িয়ে দেওঘরের পথে প্রথম মাইল-পোস্ট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অম্বিকা খুব সুস্থ সবল, দীর্ঘাকৃতি যুবক। সে ও আমি দুজনেই খুব জোরে হাঁটচি। সাত আটটা মাইল-পোস্ট পর্যন্ত বেশ জোরে চলে এলুম দুজনে। বেলা প্রায় দশটা বাজে।

ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চওড়া সোজা রাস্তা। পথের দুধারে সবুজ ধান ক্ষেত, মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল বেধে আছে—তাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে—গাছের ছায়া সমস্ত পথেই।

আরও দু তিন মাইল ছাড়ালুম। দুজনেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পেয়েচে—সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা নেই—হাঁটবার সুবিধে হবে বলে খালি হাতে পথ চলচি।

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেহাতী গ্রাম—সেখানে বিশেষ কিছু খাবার পাওয়া যায় না আমরা জানি—সন্ধান করলে হয়তো চিঁড়ে পাওয়া যেতে পারে বড়জোর।

অম্বিকা বললে—চলো, আগে গিয়ে কোথাও রান্না করে খাওয়া যাবে—

—রান্না করবার জিনিসপত্র তো চাই—তাই বা কোথায় পাবো ?

—চলো যা হয় ব্যবস্থা হবেই।

ব্যবস্থার কোনো চিহ্ন নেই কোনো দিকে। সুদীর্ঘ সোজা পথ, গ্রাম দু-তিন মাইল অন্তর। পুরেনি বলে একটা গ্রাম রাস্তার ধারেই পড়লো—এখানে একটা ডাকঘর আছে, দু-চারখানা দোকান—কিন্তু দোকানের খাবার দেখে কিনতে প্রবৃত্তি হল না আমাদের।

পুরেনি ছাড়িয়ে মাইল-খানেক গিয়েচি, এক জায়গায় পথের ওপর অনেকগুলো কুলি খাটচে—খোয়া ভাঙচে। তাদের কাছে একখানা এক্কা দাঁড়িয়ে। একজন বিহারী ভদ্রলোক কুলিদের তদারক করচেন পায়চারি করতে করতে। আমাদের অদ্ভুত দেখেই বোধহয় তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। দুজনেরই পরনে খাকীর হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে সাদা টুইলের হাতকাটা শার্ট, মাথায় সোলার টুপি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা ও বুট জুতো। তার ওপর আবার দুজনেরই চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি।

এ ধরনে সেজেগুজে বিহারের অজ্ঞ পল্লীপথে চললে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করে পারে না। পথে দেখে এসেচি প্রত্যেক বস্তির লোক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখচে—পুরেনি বাজারে তো লোকে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলাবলি করেচে।

আর কিছু না হই, আমরা যে পুলিসের দারোগা এ ধারণা অনেকেরই হয়েচে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথায় যাবেন ?

ওঁর মুখে বাংলা শুনে আমরা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না। ওঁর চেহারা অবিকল দেহাতী বিহারী ভদ্রলোকের মতই। ভাগলপুর শহর থেকে বারো মাইল দূরে বাঙালীর সঙ্গে এ ধরনের সাক্ষাৎ বড় একটা আশাও করা যায় না।

—মশায় কি বাঙালী ?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামচন্দ্র বসু—এই নিকটেই চেরো বলে গ্রাম আছে, ওখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে বাড়ি করেচেন ? কতদিন হবে ?

—আমার বাস এখানে প্রায় পনেরো বছর হল—তার আগে আমরা কহলগাঁও থাকতাম। আপনারা কোথায় যাবেন ?

আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন আমরা পদব্রজে বৈদ্যনাথ ধামে তীর্থ করতে যাচ্চি। বললেন, তা বেশ। আপনাদের বয়সে তো ওসব মানেই না। এসব দেখলেও আনন্দ হয়। তা এবেলা আমার এখানে আহার করে তবে যাবেন।

আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না এ প্রস্তাবে। বোধহয় একটু বেশি সহজেই রাজি হয়েছিলুম।

রায়বাবুর বাড়ি গিয়ে, তাঁরা যে প্রবাসী বাঙালী, সেটা ভালো করেই বুঝলুম; ছেলে-মেয়েরা ভালো বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু দেহাতী হিন্দী বলে বিহারীদের মতই। তাঁদের বাড়িতে যত্ন আদর আমরা পেলুম কতকালের আত্মীয়ের মতো, রাত্রে থাকবার জন্যে কত অনুরোধ করলেন। আমাদের থাকলে চলে না, যেতে হবে অনেক দূর—পায়ে হেঁটে যাবো বলে বেরিয়ে এত আরাম করবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই।

একটা জিনিস তাঁদের বাড়ি খেয়েছিলুম, কখনো ভুলতে পারা যাবে না—করমচার অম্বল। রান্নার গুণে নয়, করমচার অম্বল জীবনে তার আগেও কখনো খাইনি, তারপরেও না, সেই জন্যে।

আমরা আবার যখন পথে উঠলুম, তখন বেলা আড়াইটের কম নয়। শীতের বেলা, ঘণ্টা-দুই হাঁটবার পরে রোদ একেবারে পড়ে গেল।

ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা সোজা তীরের মতো নাকের সামনে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েচে। দু-ধারে ধূ-ধূ করচে জনহীন প্রান্তর, ডাইনে অনেক দূরে মারফ পাহাড় নীল মেঘের মতো দেখা যায়। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের পেছনে অস্ত গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে, তখনও রাস্তার দুধারে মাঠ আর মাঠ। অম্বিকা এদেশের লোক। তাকে বললুম—কোথায় থাকবো রাত্রে হে? গ্রামের চিহ্ন তো দেখচিনে—

অম্বিকাও কিছু জানে না। সে এদিকে কখনো আসেনি।

আরও কিছুদূর গিয়ে আমবাগানের আড়ালে একটা বস্তি দেখা গেল—কতকগুলো খোলার ঘর এক জায়গায় তাল পাকানো, এদেশের ধরনে। ঘোর অপরিষ্কার। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বস্তির নাম রজাউন। একজন লোককে বলা গেল এখানে রাত্রে থাকবার কোথাও একটু স্থান হবে কি না; তারা বললে কাছারি-বাড়িতে দুখানা চারপাই আছে, বিদেশী লোক এলে কাছারি-বাড়িতে থাকে।

কাছারি-বাড়ির অবস্থা দেখে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। ঘোড়ার আস্তাবলও এর তুলনায় স্বর্গ। একটা ভাঙা খোলার ঘর, তার চাল পড়েচে ঝুলে, বাইরের দাওয়ায় দুখানা চারপায়া আছে বটে, কিন্তু তাতে শোওয়া চলে না। কাছারিঘরের মধ্যে এত জঞ্জাল যে সেখানে রাত্রিযাপনের চেষ্টা করলে সর্পাঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা বললাম—আর কোথাও জায়গা নেই?

—না বাবু, নিজেদের তাই থাকবার জায়গা হয় না—গরিব লোকের বস্তি, আপনাদের জায়গা দেবে কোথায়?

পড়ে গেলুম বেজায় মুশকিলে। সন্ধ্যা হয়েচে, সপ্তমীর জ্যোৎস্না মাঠ-বাট আলো করেচে, নিকটে আর কোনো বস্তিও দেখা যায় না—এখন কি করি?

একজন আমাদের অবস্থা দেখে বললে—বাবু, আপনারা থানায় যান। বস্তির পশ্চিম

দিকে আধ মাইলের মধ্যে একটা বাগান দেখবেন, তার ওপারে থানা। সেখানে থাকবার জায়গা মিলতে পারে।

থানা খুঁজে বার করলুম। থানার দারোগা আরা জেলার লোক, মুসলমান। তাঁর আতিথ্য আমরা কখনো ভুলবো না। আমরা তাঁকে বললুম, আমরা কিছু খাবো না, শুধু একটু আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তা কখনো হয় না। আমার হেড-কনস্টেবল ব্রাহ্মণ, তাকে দিয়ে রান্না করাবো, আপনাদের কোনো আপত্তির কারণ নেই।

আমরা বললাম—সেজন্যে নয়, আপনার বাসা থেকে রেঁধে পাঠালেও আমাদের কোনো আপত্তি হবে না জানবেন। ভদ্রলোক শুনলেন না। হেড কনস্টেবলকে দিয়ে পুরী-তরকারি আর হালুয়া তৈরি করিয়ে দিলেন—নিজের বাসা থেকে সেরখানেক জ্বাল দেওয়া দুধ পাঠিয়ে দিলেন।

আহারাদির পরে আমাদের জন্যে বিছানা আনিয়ে দিলেন বাসা থেকে। আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করলেন—তারপর আমাদের বিশ্রাম করতে বলে বাসায় গেলেন।

আমরা খুব ভোরে উঠে রওনা হবো বলে রাত্রেই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রেখেছিলুম। সূর্য ওঠবার আগেই পথে বেরিয়ে পড়লুম।

মাইল আট-নয় দূরে বাঁকা—ভাগলপুরের একটা মহকুমা। এক জায়গায় দুটো রাস্তার মোড়, কেউ বলে দেওয়ার লোক নেই কোন্ রাস্তা বাঁকায় গিয়েচে। আমরা আন্দাজ করে নিয়ে অনেকখানি পথ চলে এসেচি, তখন একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়ার জিজ্ঞেস করলুম ঠিক পথে চলেচি কি না। সে বললে, বড্ড ঘুর-পথে যাচ্চেন বাবুজি, এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যান, শীগগির পৌছোবেন।

তার কথা শুনে মাঠের রাস্তায় নেবে আমরা আরও ভুল করলাম। পথ ভীষণ খারাপ, চষা-মাটির ওপর দিয়ে আল ডিঙিয়ে, খানা-ডোবা পার হয়ে মাইল তিনেক এসে আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়লো, আমি আর হাঁটতে পারি নে—অথচ এদিকে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর সামনে, একটা গোটা টাউন তো দূরের কথা, একখানা খোলার ঘরও নেই মাঠের কোনো দিকে।

আমি বললুম—আর হাঁটতে পারচিনে অম্বিকা—

অম্বিকা ভরসা দিলে, আর একটু পরেই আমরা বাঁকা পৌঁছে যাবো এবং সেখানে ওর এক উকিল-বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরও দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে আমি একটা গাছতলায় বসে পড়লুম। আমার চলবার শক্তি লুপ্ত হয়েচে। আমিই হেঁটে দেশ বিদেশ বেড়াবার বড় উৎসাহ দেখিয়েছিলুম, আমার প্ররোচনাতেই অম্বিকা আমার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বার হয়েচে; এখন দেখা গেল আমি একেবারে হাঁটতে পারিনে, মুখে যত বলি কাজে তার কিছুই করবার সাধ্য নেই আমার।

অম্বিকা পড়ে গেল বিপদে।

সে এখন আমায় নিয়ে কি করে? বেলা প্রায় একটা বাজে। আমায় সে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারে না বাঁকা পর্যন্ত, অথচ সত্যিই পা ওঠাবার শক্তিটুকুও নেই আমার।

আমি বললুম—অম্বিকা, বাঁকা থেকে একখানা গাড়ি নিয়ে এস গিয়ে, আমি এখানেই থাকি।

অম্বিকা যেতে রাজি নয়। আমায় এ অবস্থায় ফেলে সে কোথাও যাবে না। তার চেয়ে আমি বসে বিশ্রাম করি, যদি এর পরে আমি হাঁটতে পারি—সে আমার সঙ্গে এখানেই থাকবে।

বেলা আড়াইটের সময় আমি কিছু সুস্থ হয়ে পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অম্বিকা ঘড়ি দেখে বললে, বেলা ঠিক আড়াইটে—এক ঘণ্টার মধ্যে বাঁকা পৌঁছে যাবো।

আরও দেড় ঘণ্টা চলে গেল, বাঁকার চিহ্ন নেই কোনো দিকে।

আমি বললুম—শর্টকাট্ করতে গিয়ে এই বিপদটি বাধলো। সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে গেলে কোন্ কালে বাঁকা পৌঁছে যেতুম।

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে, তখন আমরা বাঁকা পৌঁছে গেলুম। সেখানে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠের মধ্যে আমরা ভুল পথ ধরেছিলুম, তাই আমাদের এত বিলম্ব। যে ভদ্রলোকের বাড়ি আমরা গিয়ে উঠলুম, তাঁরাও বাঙালী কিন্তু অনেকদিন বিহারে বাস করবার ফলে একেবারে বিহারী হয়ে গিয়েচেন। ছেলেমেয়েরা এখন ভালো বাংলা বলতে পারে না। তাঁদের আদর-যত্ন মনে রাখবার জিনিস বটে। রাত্রে আমাদের জন্যে তারা পুরী-তরকারি করে দিলেন, আহারান্তে শয্যা আশ্রয় করে মনে হল তিন দিনের মধ্যে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না।

অম্বিকাকে বললুম—দেওঘর যাওয়া এখানেই ইতি। আমি এক্কা করে কাল সকালে মান্দার হিল যাবো, সেখান থেকে ট্রেনে ভাগলপুর। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ আমার মিটেচে।

অম্বিকা আমায় নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করে। এখন ভাগলপুর ফিরলে লোকে কি বলবে, কত জাঁক করে বেরুনো হয়েচে ভাগলপুর থেকে, তুমিই সকলের চেয়ে জোরগলায় চেঁচিয়েছিলে যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ সব ভ্রমণের সেরা। তোমার এই শোচনীয় পরাভবে—ইত্যাদি।

আমি নাছোড়বান্দা। শরীরের সামর্থ্যে না যদি কুলোর, আমি কি করবো!

আমার এক পা হাঁটবার ক্ষমতা নেই আর। বন্ধুর বকুনি শেষ হবার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু ভোরে উঠে দেখি যে আমার পায়ের ব্যথা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে সেরে গিয়েচে। এদিকে আমার বন্ধু চা পান শেষ করে বললেন—তাহলে একখানা এক্কা ডাকি, এইবেলা মান্দার হিলে রওনা হওয়া যাক।

আমি বললুম, আর মান্দার হিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাঁটতে পারবো এখন, চলো রওনা হই।

দুজনে আবার পথে উঠলুম।

সবে সূর্যোদয় হচ্চে—ডানদিকে কাঁকোয়ারা স্টেটের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, মাঝে মাঝে শালবন। প্রভাতে মুক্ত বায়ুতে জীবনের জয়গান ঘোষণা করচে। পথের নেশায় মন প্রাণ উত্তেজিত হয়ে উঠেচে—কোথায় মান্দার হিল আর কোথায় ভাগলপুর। প্রায় ছ মাইল পথ হাঁটবার পরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হতে হল। উপলরাশির উপর দিয়ে ঝির ঝির করে নির্মল জলের ধারা বয়ে চলেচে। নদীর দু পাড়ে ছোট ছোট কি ঝোপে সুন্দর ফুল ফুটেচে।

নদী পার হয়ে আরও মাইল-পাঁচেক পথ হেঁটে এসেচি; একজন বিহারী ভদ্রলোক আমাদের পাশ দিয়ে টমটম চড়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

আমার বন্ধুকে নমস্কার করে হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা চলেচেন এ ভাবে ?

অম্বিকা বললে—বেশ ভালো আছেন নদীয়াচাঁদবাবু ? নমস্কার। দেওঘর চলেচি—

—পায়ে হেঁটে ? মান্দার হিল থেকে ?

—সোজা ভাগলপুর থেকে। কাল বাঁকাতে রাত কাটিয়েচি—ইনি আমার বন্ধু অমুক—ইনিও যাচ্চেন—

ভদ্রলোক টমটম থেকে নেমে পড়লেন। আমাদের দুজনকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তাঁর টমটমে উঠতে। আমার বন্ধু ও আমি দুজনেই বিনীতভাবে বললুম, যখন হেঁটে চলেচি, শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাবো। কেউ দেখচে না বলে এখানে খানিকটা গাড়িতে উঠে শেষে ভাগলপুরে ফিরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার বাহাদুরি নেওয়া আমাদের ধাতে সইবে না।

তিনি বললেন—তীর্থ করতে যাচ্চেন নাকি ?

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করলুম। পুণ্য অর্জনের লোভ নেই আমাদের। যাচ্চি এমনিই—শখ।

তিনি বললেন—খাওয়া-দাওয়া করবেন এবেলা আমার ওখানে। জামদহ ডাকবাংলোতে আমি কাছারি করবো এবেলা। আমি আগে চলে যাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের পথের ধারেই পড়বে জামদহ বাংলো। সেখানে আপনাদের পৌঁছতে আরও ঘণ্টা-দুই লাগবে। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রাখবো।

ভদ্রলোক টমটমে উঠে গেলেন।

অম্বিকা বললে—উনি বাবু নদীয়াচাঁদ সহায়। লছমীপুর স্টেটের ম্যানেজার। বড় ভালো লোক। আমার সঙ্গে খুব আলাপ আছে। ভালোই হল, দুপুর ঘুরে গেলে আমরা জামদহ পৌঁছবো, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে এখন।

বেলা প্রায় বারোটার সময়ে আমরা দূর থেকে একটা শালবন দেখতে পেলুম পথের ধারেই। অম্বিকা বললে, ওর মধ্যেই জামদহ ডাকবাংলো—নদীয়াচাঁদবাবু বলেছিলেন। আমাদের জন্যে পথের ওপর লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল।

নদীয়াচাঁদবাবু অনেক প্রজা নিয়ে কাছারি করচেন। আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। বনের মধ্যে একটা ইঁদারা, তার চারিদিকে সিমেণ্ট বাঁধানো—আমরা সেখানে স্নান করে ভারি তৃপ্তি পেলুম।

আহারাদির পরে নদীয়াবাবু বললেন—এখানে এই বনের মধ্যে আমার তিন দিন থাকতে হবে। আপনারা যখন এসেচেন, তখন একটা রাত অন্তত আমার এখানে কাটিয়ে যান। আজ আর আপনাদের কিছুতেই ছাড়চিনে।

আমাদের কোনো আপত্তি তিনি শুনলেন না। লোকটি বিশেষ ভদ্র ও শিক্ষিত, তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

শালবনের নিস্তব্ধতার মধ্যে কি সুন্দর বৈকাল আর জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো! মন একেবারে মুক্ত, পথের নেশায় মাতাল, কতদূর এসে পড়েচি পরিচিতের সীমা ছাড়িয়ে—এমন একটি সুন্দর রাত্রি জীবনে আর হয়তো না-ও মিলতে পারে। নদীয়াবাবু আমাদের কাছে বসে বসে গল্পগুজব করলেন অনেকক্ষণ। কথায় কথায় বললেন—আপনারা যদি এসেচেন এ পথে, তবে লছমীপুর দেখে যান একবার। চমৎকার দৃশ্য ওখানকার। আপনারা খুশী হবেন।

—এখান থেকে কতটা হবে?

—প্রায় সাত মাইল—তবে পাকা সড়ক ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে হবে—জঙ্গল পড়বে খুব।

রাত্রে শুনে আমি বন্ধুকে বললুম—জেলাবোর্ডের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা আগে লছমীপুর দেখে আসি।

বন্ধু আপত্তি করলে। সে শুনেচে লছমীপুর ছাড়িয়েই দশ-বারো মাইল জঙ্গল, সে পথে হেঁটে যাওয়া বড় বিপজ্জনক, আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।

আমি তার কাছে আরাকান ইয়োমার জঙ্গলের কথা বললুম। তার চেয়ে বেশি জঙ্গল আর কি হবে। লছমীপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভাগলপুরে থাকতে অনেকের মুখে শুনেচি। এতদূর যখন এসেচি, লছমীপুর দেখে যাওয়াই ভালো।

অনেক রাত পর্যন্ত কথা-কাটাকাটির পরে অম্বিকাকে রাজি করানো গেল। পরদিন খুব ভোরে উঠে আমরা নদীয়াচাঁদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে লছমীপুর রওনা হবার জন্যে বাঁ-দিকের বনপথ ধরলুম।

তখন সবে সূর্য উঠেচে। সত্যিই পথটির দৃশ্য চমৎকার। এই প্রথম রাঙা মাটি চোখে পড়লো—উঁচুনীচু জমি, শাল ও পলাশ গাছের সারি, মাঝে মাঝে দু একটা বট গাছ। নানা জায়গায় বেড়িয়ে আমার মনে হয়েচে, বট গাছ যত বেশি বনে, মাঠে, পাহাড়ের ওপর অযত্নসম্ভূত অবস্থায় দেখা যায়, অশ্বত্থ তেমন নয়। বাংলার বাইরে, বিশেষ করে এই সব বন্য অঞ্চলে, অশ্বত্থ তো আদৌ দেখেচি বলে মনে হয় না—অথচ কত বন-প্রান্তরে, কত পাহাড়ের মাথায়, সঙ্গিহীন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ ও তার মাথায় সাদা সাদা বকের পাল যে দেখেচি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ হবে না।

দক্ষিণ-ভাগলপুরের এই অঞ্চলের জমি গঙ্গা ও কুশীর পলিমাটিতে গড়া উত্তর-ভাগলপুরের

জমি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিকের ভূমির প্রকৃতি ও উদ্ভিদ্-সমাবেশ সাঁওতাল পরগনার মতো, তেমনি কাঁকরভরা, রাঙা, বন্ধুর—শুধু শাল ও মউল বনে ভরা, ঠিক যেন দেওঘর মধুপুর কি গিরিডি অঞ্চলে আছি বলে মনে হয়। বেলা প্রায় নটার সময় দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা গেল—কিন্তু চূড়োটা যেন পথের সমতলে অবস্থিত। অম্বিকা বললে—ওই লছমীপুর। আমি জানি রাজবাড়ির কালীমন্দির খুব বড়, ওটা তারই চূড়ো।

কিন্তু মন্দিরের চূড়ো পথের সমতলে কি করে থাকে, আমরা দুজনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি—বুঝলুম যখন আমরা লছমীপুরের আরও নিকটে পৌঁছেচি।

লছমীপুর একটা নিম্ন উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিক থেকে পথগুলো ঝরনার মতো নীচের দিকে নেমে পড়েচে উপত্যকার মধ্যে। আমাদের পথ ক্রমশ নীচে নামচে, দুপারের শাল বন আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, অথচ কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না—কেবল সেই মন্দিরের চূড়োটা আরও বড় ও স্পষ্ট দেখাচ্চে।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ নীচের দিকে চাইতেই অনেক ঘরবাড়ি একসঙ্গে চোখে পড়ল।

সত্যিই ভারি সুন্দর দৃশ্য।

বনজঙ্গলে ভরা একটা খুব নাবাল জায়গায় এই ক্ষুদ্র গ্রামটির ঘরবাড়ি যেন ছবির মতো সাজানো। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা সেকেলে ধরনের পুরোনো ইঁটের বাড়ি ও সেই মন্দিরটা।

অম্বিকা বললে—ওই রাজবাড়ি নিশ্চয়।

নদীয়াচাঁদবাবু স্থানীয় কোনো এক কর্মচারীর নামে একখানা পত্র দিয়েছিলেন আমাদের সম্বন্ধে, যার বলে আমরা রাজবাড়ির অতিথিশালায় স্থান পেলুম। অতিথিশালাটি বেশ বড়, খোলার ছাদওয়ালা চারপাঁচটি কামরাযুক্ত বাড়ি। দড়ির চারপাই ছাড়া ঘরগুলিতে অন্য কোনো আসবাব নেই।

এখানে একটি অদ্ভুত বেশভূষাধারী যুবককে দেখে আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে পড়লুম তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। যুবকটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, রং মিশ্‌কালো, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি চুলে কেয়ারি করে টেরি কাটা, গায়ে সাদা ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধা—আর সকলের চেয়ে যা আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকলো, তা হচ্চে এই যে, এই দিন-দুপুরে লোকটার পকেটে একটা পাঁচ ব্যাটারির প্রকাণ্ড টর্চ। বাঙালী নয় যে, তা বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না।

অম্বিকা বললে—লোকটাকে কিসের মতো দেখাচ্চে বলো তো? ঠিক যেন যাত্রাদলের বড় কেষ্টঠাকুর; মাথায় চাঁচর চিকুর, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত হুবহু—না?

—ডেকে নাম জিজ্ঞেস কর না?

কিছু পরেই আমরা অতিথিশালার ম্যানেজারের কাছে যুবকটির পরিচয় পেলুম। সে রাজার শ্যালক, এখানেই সামান্য কিছু কাজ করে রাজ-স্টেটে, বেশ আমুদে লোক—আর নাকি খুব ভালো নাচতে জানে।

আমরা যুবকটির সঙ্গে আলাপ করলুম। আমাদের খুব ভালো লাগলো লোকটিকে। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান যে, তা কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি বললুম—আপনার পৈতৃক দেশ কোথায় ?

—রাজধার্সাওন—বি এন আর এ—তবে এখানেই আছি আজ দশ বছর।

—এই বনের মধ্যে বেশ ভালো লাগে আপনার ?

—খুব শিকার মেলে কিনা ! আপনারা থেকে যান, ভালুক শিকার করতে যাবো।

—ভালুক খুব আছে নাকি ?

—এই যে বন দেখচেন, ভালুক আর সম্বর হরিণ এত আছে যে অনেক সময় দিনমানেও লছমীপুর গ্রামের মধ্যে ছটকে এসে পড়ে। আপনারা পায়ে হেঁটে যাবেন না বনের মধ্যে দিয়ে—বড় বিপজ্জনক। আমি ঘোড়া দিচ্চি দুজনকে, সঙ্গে শিকারী গাইড দেবো, তবে যাবেন।

আমরা বলুম, হেঁটে যখন যাবো ঠিক করেচি, তখন ঘোড়ায় চড়বো না, সেটা ঠিকও হবে না।

যুবকটি ভেবে বললে—তীর্থ করতে যাবেন বলে কি আর একটু ঘোড়ায় চড়তে নেই ? বন কতখানি আপনারা জানেন না—বড় দেরি হয়ে যাবে বন পার হতে, যদি পায়ে হেঁটে যান।

—কত বড় বন আপনার মনে হয় ?

—দশ বারো মাইল খুব হবে, লছমীপুরের জঙ্গল দক্ষিণ ভাগলপুরের বিখ্যাত জঙ্গল। ঘোড়ায় যদি না যান, তবে একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে যান।

যুবক উঠে চলে গেলে আমরা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলুম, সঙ্গে লোক নেওয়ারও কোনো দরকার নেই। ওতে আমাদের বাহাদুরি অনেকখানি কমে যাবে।

অতিথিশালার ম্যানেজার বললেন—আপনাদের খাবার-দাবার সব তৈরি। যদি বেরুতেই হয়—তবে আপনারা আর বেশি দেরি করবেন না—কারণ জঙ্গল পার হতে খুব সময় নেবে।

আহারাদির পর অম্বিকা বললে—একবার রাণীমার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না হে। একবার আলাপ করে রাখি, পরে কাজ দেবে। তুমিও চল না—আলাপ করা যাক। দরকার অন্য কিছু নয়, উকিল মানুষ, এত বড় স্টেটের কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ রাখলে স্টেটের মামলা মোকদ্দমাগুলো পাবার দিক থেকে অনেক সুবিধে।

লছমীপুর গাড়োয়ালী স্টেট। বার্ষিক আয় খুব বেশি না হলেও নিতান্ত মন্দ নয়। অম্বিকা বলেছিল দু-লাখ টাকা ; অত যদিও না হয়, লাখখানেকের কম নয় নিশ্চয়ই। বন থেকেই এদের আয় বেশি। বনের খানিকটা অংশ লাক্ষা-ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া হয়, তা বাদে কাঠ ও সম্বর হরিণের শিং আর ছাল বিক্রী করেও যথেষ্ট আয় হয়।

আমরা কালীবাড়ি দেখতে গেলুম। একটি বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ এখানকার পূজারী,

পুত্র-পরিবার নিয়ে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর লছমীপুরে বাস করচেন। তাঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিবিসনে, এখনও তাঁর জ্ঞাতিবর্গ সেখানেই আছে, পৈতৃক বাড়িও আছে, তবে সেখানে এঁদের যাতায়াত নেই বহুকাল থেকে।

আমরা বললুম—এখানে আর কোনো বাঙালী আছেন ?

—পূর্বে দুজন বাঙালী ছিলেন স্টেটের কাছারিতে, এখন আর নেই।

—আপনার কোনো অসুবিধা হয় না থাকতে ?

—এখন আর হয় না, আগে আগে খুবই হত। কি করি বলুন, পেটের দায়ে সবই করতে হয়। এখানে বছরে চার-পাঁচ শো টাকা পাই—বাড়িভাড়া লাগে না, কিছু জমি-জায়গীরও দেওয়া আছে স্টেট থেকে। মরে গেলে বড় ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। ওকে সংস্কৃত পড়তে পাঠিয়েচি নবদ্বীপে ওর মামার বাড়িতে এক মস্ত অসুবিধে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এখান থেকে হয় না।

—সময় কাটান কি করে এখানে ?

—নিজের কাজ করি, একটা টোল খুলেচি, ছাত্র পড়াই। পাঁচ ছ-জন ছাত্র আছে—তার জন্তে স্টেট থেকে বৃত্তি পাই।

অম্বিকার কাছে ইতিমধ্যে রাজবাড়ি থেকে খবর এল, রাণীমা এইবার পূজা সেরে উঠেচেন, এখন দেখা হতে পারে।

অম্বিকা দেখা করতে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই বেশ হাসিমুখে ফিরে এল। বললে —রাণীমা বড় ভালো লোক, উনি আমাকে স্টেটের কাজ দিতে চেয়েচেন। খুব খাতির করেচেন আমার।

—এইবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক। বেলা দুটো বাজে, অত বড় বন পার হতে হবে তো।

—আমি জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বলছিলুম—

—নিশ্চয়ই তুমি বনের কথায় ভয় পেয়ে গিয়েচ—না ?

—রাণীমা বলছিলেন বনে অনেক রকম বিপদ আছে। তবে তুমি না ছাড়ো, অগত্যা বনের পথেই যেতে হয়।

লছমীপুর ছেড়ে আমরা খানিকটা চড়াই পথে উঠেই হঠাৎ একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লুম। জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, প্রধানত কেঁদ, শাল ও পিয়াল গাছ বেশি বনের গাছের মধ্যে। ঝোপ জিনিসটা বিহারে কোথাও দেখিনি এই জঙ্গল ছাড়া।

শরতের শেষ, অনেক রকম বনের ফুল ফুটে আছে, অধিকাংশই অজানা—বাংলা দেশের পরিচিত বনফুল একটাও চোখে পড়লো না কেবল শিউলি ফুল ছাড়া। দু একটা ছাতিম গাছও দেখা গেল, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

বনের মধ্যে পায়ে চলার একটা পথ কিছুদূর পর্যন্ত পাওয়া গেল। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পথটা তিনটি পথে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাওয়াতে আমরা প্রমাদ গনলাম। সঙ্গে গাইড নেওয়া যে কেন উচিত ছিল, তখন খুব ভালো বুঝলাম। আমাদের চারিধারে শুধু

গাছপালা আর বনঝোপ—শুধু বনস্পতির দল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—আমাদের মাথার ওপর বনগাছের ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশ। কোনো লোকালয় নেই, একটা লোক নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করি পথের কথা।

মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ এল হঠাৎ কোথা থেকে।

ঘরে বসে সে আনন্দ কোনোদিন কখনো পাওয়া যায় না। অম্বিকাও দেখলুম পথের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেচে। ও বললে—চলো চোখ বুজে যে পথে হয়, না হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বনের মধ্যে ঘুরবো, রাত হয় গাছের ওপরে উঠে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আন্দাজ করে একটা পথ বেছে নিয়ে তাই ধরে চললাম। ক্রমশ বন নিবিড়তর হয়ে উঠেচে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে আমরা ভালুক কি বাঘের সামনে পড়তে পারি। এ বনে সে ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

অম্বিকা বললে—এসো একটা রাত বনের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আমারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুজনে সামনের দিকে এগিয়েই চলেচি, দুজনেরই ঝোঁক বন পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়বার দিকে। বনের মধ্যে কোনো গাছ এমন নেই যার ফল খাওয়া যায়, একমাত্র আমলকি ছাড়া। সেকালের মুনি-ঋষিরা শোনা যায় বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করে নাকি বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। কথাটার মধ্যে কতদূর সত্যতা আছে জানি না। আমি অনেক স্থানের বন ঘুরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেচি, তাতে আমার মনে হয়েচে মানুষের খাদ্যোপযোগী ফলের গাছ পার্বত্য অরণ্যে কচিৎ দেখা যায়—তাও আম, কলা, বেল, আনারস, লিচু প্রভৃতি ভালো জাতীয় ফল নয়—হয় আমলকি, কেঁদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফল, বড়জোর বুনো রামকলা, বিচি বোঝাই ও মানুষের অখাদ্য। মানুষের খাদ্যোপযোগী বহুপ্রকার ফলবৃক্ষের একত্র সমাবেশ মানুষের হাতে তৈরী ফলের বাগান ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না।

আমি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চলে দেখেচি শুধু শাল, অর্জুন, বন্য আমলকি, কেঁদ, পলাশ ও আসান গাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার গাছ মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে কোথাও নেই—একমাত্র আমলকি ও কেঁদ ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোনো গাছে মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত ফল ফলে না—হিমালয়ের ও আসামের আরণ্য প্রদেশেও খাদ্যোপযোগী ফলবৃক্ষ বেশি নেই। উড়িষ্যার কোনো কোনো বনে বন্য বিল্ববৃক্ষ দেখা যায় বটে—কিন্তু তার ফলের ভেতরটা আঠা ও বিচিতে ভর্তি, স্বাদ কষা ও ঈষৎ তিক্ত, মানুষের পক্ষে অখাদ্য।

বিশেষ করে আমার বলবার বিষয় এই, সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণ বিহার, সিংভূম ও মধ্য-প্রদেশের আরণ্য প্রদেশ মানুষের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর—এখানে বিচিত্র বন্য পুষ্প নেই, খাওয়ার উপযুক্ত বিশেষ কোনো ফল নেই। মুনি-ঋষিরা আর যে কোনো বনেই বাস করুন, এই সব স্থানের বনে নিশ্চয়ই বাস করতেন না—করলে অনাহারে মারা পড়তেন। অন্য কোনো দেশের অরণ্যে প্রকৃতি মানুষের জন্যে ফলের বাগান সাজিয়ে যদি রেখেই থাকেন—তবে তার সন্ধান আমার জানা নেই।

ফলের কথা বাদ দিয়ে এবার বন্য ফুলের কথা বলি।

বন্য পুষ্পের বিচিত্র শোভার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সব অঞ্চলের সব অরণ্যের বেলায় সে কথা খাটে না। সাধারণত ধরে নিতে হবে সুখাদ্য ফলের ন্যায় নয়নানন্দদায়ক পুষ্পের দর্শনও মানুষের তৈরী উদ্যানেই মেলে—প্রকৃতি-রচিত আরণ্য অঞ্চল মানুষের সুখ-সুবিধার দিক থেকে দেখতে গেলে বড় কৃপণ।

অতএব যে কোনো বড় অরণ্যে ঢুকলেই যে বন-পুষ্পের শোভায় মন মুগ্ধ করবে এ যিনি ভাবেন, তিনি অরণ্য দেখে নিরাশ হবেন।

বনের ফুল ফোটে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, তাও দু এক রকম মাত্র ফুল সেই সেই ঋতুতে দেখা যায়—নানা ধরনের ফুল একসঙ্গে কখনোই দেখা যায় না। সে দেখা যায় মানুষের হাতের ফুলের বাগানে। যিনি বহুবিধ রঙীন পুষ্পের বিচিত্র সমাবেশ দেখতে ভালোবাসেন, তাঁকে যেতে হবে আলিপুরের হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানে; অন্তত আমি এমন কোনো অরণ্য দেখিনি, যেখানকার বিচিত্র বন্যপুষ্পশোভা তাঁকে অতটা আনন্দ দিতে পারবে।

বসন্তে দেখেছি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যে গোলগোলি ফুলের বড় শোভা। কিন্তু সব বনে এ গাছ দেখা যায় না, কোনো বনে আছে, কোনো বনে আদৌ নেই। এই গাছ দেখতে ঠিক একটি পত্রহীন আমড়া গাছের মতো, কিন্তু কখনোই খুব বড় হয় না। বসন্তে পাতা ঝরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটে, ফুলগুলির আকৃতি ও বর্ণ অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। বনের সবুজ পাতার মধ্যে এখানে-ওখানে এক একটা শুভ্রকাণ্ড, নিষ্পত্র, আঁকাবাঁকা গোলগোলি গাছ হলদে ফুলে ভরা দাঁড়িয়ে আছে—এ দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন, তিনি কখনো ভুলবেন না।

এ ছবি আরও অপূর্ব হয়, যদি কাছে বড় বড় অনাবৃত শিলাখণ্ড থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ হুকার তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিমালয় জার্নাল' নামক গ্রন্থে গোলগোলি ফুলের সৌন্দর্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন—তাঁর বইএ নিজের হাতে আঁকা ছবিও আছে এই ফুলের।

বসন্তে আরও দু এক প্রকারের ফুল দেখেছি এই অঞ্চলের বনে, যেমন লোহাজাঙ্গি ও ঝাঁটি ফুল। এদের ফুল হয় অনেকটা চামেলি ফুলের মতো—তবে গন্ধহীন। পলাশ সর্বত্র নেই—যেখানে আছে, যেমন পালামৌ ও রাঁচি অঞ্চলের প্রান্তরে ও বনে, সেখানে রক্ত-পলাশের শোভা বড় অদ্ভুত হয়। কিন্তু প্রান্তর ছাড়া পার্বত্য অরণ্যে পলাশ গাছের ভিড় বড় একটা থাকে না। শাল ফুলের সুগন্ধ আছে—কিন্তু দেখতে বিশেষ কিছু নয়। মহুয়া ফুলের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

কোনো কোনো বনে বর্ষা ঋতুতে কুরচি ফুল যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষ করে সিংভূম অঞ্চলে।

শিমুল ফুল বনের মধ্যে ফুটে গাছ আলো করে থাকলে যে কি শোভা হয়, যাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের শৈলবনের স্টেশনঘেরা উভয়পার্শ্ববর্তী আরণ্য অঞ্চলে বসন্তে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন। দুঃখের বিষয় সিংভূমের মাত্র এই স্থানটুকু ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা শিমুল গাছ বনে দেখা যায় না। সাধারণত শিমুল গাছের স্থান বনে নয়, মানুষের

পল্লীতে কিংবা পল্লীর আশপাশের মাঠে। তাই বলছিলুম বন-প্রকৃতি মানুষের সুখ-সুবিধার বড়ই উদাসীন।

মুচুকুন্দ কলকাতার রাস্তার দুধারে যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলার পাড়াগাঁয়েও আছে, কিন্তু কোনো বনে কখনো এ গাছ দেখিনি।

বাকি রইল বন্য শেফালি ও সপ্তপর্ণ। বন্য শেফালি অজস্র দেখা যায় নাগপুর অঞ্চলে পার্বত্য অরণ্যে। সিংভূমেও আছে, তবে অত বেশি নয়। সপ্তপর্ণ দক্ষিণ বিহারের বনপ্রদেশে যথেষ্ট আছে—অন্য কোথাও একদম নেই। উড়িষ্যা ও সিংভূমের অরণ্যে সারাদিন খুঁজে বেড়ালেও একটা বন্য সপ্তপর্ণ চোখে পড়বে না—কিন্তু পড়বে যেখানে মানুষের বাসস্থান। কেবলমাত্র বাংলা দেশেই দেখা যায় পল্লীগ্রামের আশেপাশের বনে অযত্নসম্ভূত বহু সপ্তপর্ণ বৃক্ষ হেমন্তের প্রারম্ভে মধুর পুষ্প-সুবাসে পথিকের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

রক্তকরবীর বন দেখেচি চন্দ্রনাথে, কিন্তু সে গেল বাংলা দেশের মধ্যে। খুব বাহারে ও রঙীন কোনো ফুল সাধারণত রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে দেখাই যায় না, যদিও থাকলে খুব ভালো হত।

একসময়ে আমরা দূর থেকে কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলুম। মেঘের মধ্যে নীল-রঙের তিনটি চূড়া, কেঁদ আর শালবনের ফাঁকে অনেক দূরের আকাশের পটে যেন আঁকা রয়েচে। অম্বিকা ও আমি ঠিক করে নিলুম ঐ নিশ্চয়ই ত্রিকূট। অম্বিকা বললে—ও পাহাড় কিন্তু অনেক দূরে।

—মেঘের মধ্যে বলে চোখে ধাঁধা লেগে অমনি হচ্চে। মেঘ সরে গেলে অত দূর বলে মনে হবে না।

বন একেবারে নিবিড়। শুকনো পাতার রাশি গাছতলায় এত জড় হয়েছে যে পায়ে দলে যাবার সময় একটা একটানা মচ মচ শব্দ বহুক্ষণ ধরে শুনচি।

এদিকে বেলা বেশ পড়ে এসেচে, রোদ রাঙা হয়ে বড় বড় কেঁদ গাছের মগডালে লেগেচে। এ জঙ্গলটাতে আবার বন্য বাঁশ, খয়ের ও বহেড়া গাছ খুব বেশি। সন্ধ্যা তো হয়ে এল, যদি জঙ্গল শেষ না হয় তবে কি করা যাবে সে বিষয়ে আমরা আগে থেকে পরামর্শ করলুম।

অম্বিকা বললে, গাছে উঠে রাত কাটানো যাবে, সেই যে-কথা আগে বলেছিলুম।

—তা যদি উঠতে হয় তবে সন্ধ্যার আগেই আশ্রয় নিতে হবে সেখানে, অন্ধকার হলে এ বনে আর এক পা-ও চলা উচিত হবে না।

অম্বিকারও তাই মত। লছমীপুরের জঙ্গলে ভালুক ও বাঘ যথেষ্ট আছে, ভাগলপুরে থাকতে শুনে এসেচি। বন্দুক ও উপযুক্ত গাইড না নিয়ে বনের মধ্যে যাওয়াই উচিত নয়, একথা আমাদের সবাই বলেছিলেন—এমন কি রাণী-সাহেবা পর্যন্ত। আমরা কারো কথা না শুনে যখন এসেচি, তখন এর আনুষঙ্গিক বিপদের জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে বৈকি।

সন্ধ্যা হবার আগে দেখা গেল পথটা উৎরাইয়ের দিকে নামচে। আমরা অনেক দূরে নেমে এলুম, ক্রমশ একটা পাহাড়ী ঝরনা আমাদের পথের ওপর ঝুলঝুল্ বয়ে চলেচে রাশি রাশি

ছুড়ির বাধা অগ্রাহ্য করে। ঝরনা পার হয়ে আবার একটা চড়াইয়ের পথ, খয়ের ও বহেড়ার জঙ্গলও পূর্ববৎ নিবিড়। সম্বর হরিণ নাকি এই জঙ্গলে খুব বেশি, তারা মানুষ দেখলে তেড়ে এসে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে দেয়। এ পর্যন্ত দু-একটা খেঁকশিয়াল ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারের টিকি দেখা যায়নি যদিও ; এবার কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সাবধান হয়ে চলাই দরকার।

চড়াইএর জঙ্গলে অনেকটা চলে এলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভালো ভাবেই নামলো, আমরা কি করবো ভাবচি এমন সময়ে একটা কি অদ্ভুত ধরনের শব্দ আমাদের কানে গেল দূর থেকে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলুম। বাঘ বা ওই ধরনের কিছু ?

অল্পক্ষণ পরেই বনের নিবিড় অন্তরাল থেকে বার হয়ে এল একটা সাদা কাপড়ের ডুলি। দুজন ডুলি বইচে, পেছনে জন-তিনেক লোক, ওদের সকলের হাতেই লাঠি ও বর্শা।

আমরা ওদের দেখে যতখানি অবাক, ওরাও আমাদের দেখে তার চেয়ে কম অবাক নয়।

আমরা বললুম, কোথায় যাবে তোমরা ?

আমাদের প্যাণ্ট-কোট পরা, হ্যাট-মাথায় মূর্তি দেখে ওরা বেশ ভয় খেয়ে গিয়েচে বোঝা গেল। বিনীতভাবে তারা বললে, তারা লছমীপুরে যাবে।

—ডুলির মধ্যে কি ?

—একটি মেয়ে আছে বাবুজী—

অম্বিকা উকিল মানুষ, সে এগিয়ে গিয়ে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, কোথাকার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, আমরা জানতে চাই। কোথা থেকে আনচো ?

একটি নিরীহ গোছের দেহাতী লোক এগিয়ে এসে আমাদের আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বললে, গরিব পরওয়ার, আমার আউরৎ আমার বাড়ি থেকে লছমীপুরে ওর বাপের বাড়ি যাচ্চে, আমি ওর স্বামী, নাম বিঠল ভকৎ হুজুর।

আমরা তো অবাক। বিঠল ভকৎ তার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রকাণ্ড বনের মধ্যে দিয়ে রাত্রিকালে শ্বশুরবাড়ি চলেচে।

আমরা বললুম, বন আর কতটা আছে ?

বিঠল ভকৎ বললে, আর এক ক্রোশ, কিন্তু ডানদিক ঘেঁষে যান। বাঁদিকের পথে চললে এখনও দু তিন ক্রোশ বন পাবেন।

—কোনো ভয়-ভীত্ আছে এ বনে ?

—জানোয়ার আছে বৈকি। ভালুকের ভয় এই সময়টা খুব।

—তোমাদের খুব সাহস তো। এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে দিয়ে বউ নিয়ে যাচ্চ।

—আমাদের এই জঙ্গলের দেশেই বাড়ি বাবুসাহেব, ভয় করলে চলে না। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।

ওরা চলে গেল। আমাদের সাহস বিঠল ভকৎ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল সন্দেহ নেই। আমরা দুজনেই তখন এগিয়ে চলেচি ডানদিক ঘেঁষে। জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোছায়ার জাল ক্রমশ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ বিজন অরণ্যানী আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েচি, কোথায় যেন চলেচি—এ কথা ভাবতে আমার এত আনন্দ হচ্ছিল, নৈশ পাখীর আওয়াজ—আর বনের মধ্যে কোথাও বনশিউলি ফুটেচে, তার গন্ধ সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েচে। মাঝে মাঝে গন্ধটা খুব ঘন, এক এক জায়গায় বড় পাতলা হয়ে যায়, এক এক জায়গায় থাকেই না—কিন্তু একেবারে চলেনোই যায় না।

বন ক্রমশ কমে আসচে বোঝা গেল। আর আধঘণ্টা জোর হাঁটবার পরে বন ছাড়িয়ে আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়লাম। কিন্তু কোনোদিকে একটা বস্তি নেই। মাঠে শুধু শাল আর মউল গাছ দূরে দূরে, জ্যোৎস্নার আলোতে এই দীর্ঘ অজানা প্রান্তর যেন আমাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস তৃণভূমি—আকাশের নেশা, পথহীন পথের নেশা, অজানার উদ্দেশে ক্লান্তিহীন যাত্রার নেশা।

অথচ কতটুকুই বা যাবো! আমরা উত্তরমেরু আবিষ্কার করতে যাইনি, যাচ্ছি তো ভাগলপুর থেকে দেওঘর, বড়জোর একশো পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। কিংবা হয়তো তারও কম!

আসল কথা, মনের আনন্দই মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় মাপকাঠি। আমি দশ মাইল গিয়ে যে আনন্দ পেলুম, তুমি যদি হাজার মাইল গিয়ে সেই আনন্দ পেয়ে থাকো তবে তুমি-আমি দুজনেই সমান। দশ মাইলে আর হাজার মাইলে পার্থক্য নেই।

তবে ঘরকে একেবারে মন থেকে তাড়াতে হয়। ঘর মনে থাকলে পথ ধরা দেয় না। ঘর দুদিনের বন্ধন, পথ চিরকালের।

জয়পুর ডাক-বাংলোয় পৌঁছে গেলুম আরও প্রায় একঘণ্টা হেঁটে। এখানে চৌকিদারকে ডেকে বললুম—বাপু, রঘুনাথ পাটোয়ারী কোথায় থাকে, তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে এসো তো।

চিঠিখানা লছমীপুরের দেওয়ান দিয়েছিলেন পাটোয়ারীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে। চৌকিদার চলে যাওয়ার কিছু পরেই দেখি চার-পাঁচজন লাঠি-হাতে লোক সঙ্গে করে অনেক পাগড়িবাঁধা, মেরজাইআঁটা বৃদ্ধ এদিকেই আসচে। কাছে এসে লোকটি একটা লম্বা সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালো। তারই নাম রঘুনাথ, বাবুরা স্বচ্ছন্দে থাকুন ডাকবাংলোয়, সে এখুনি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে ডাকবাংলোতে রাত্রে পাহারার জন্য লোক এনেচে সঙ্গে।

—পাহারার লোক কেন?

—বাবুসাহেব, এই ডাকবাংলো জঙ্গলের ধারে মাঠের মধ্যে। লোকজন নেই কাছে—এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়। এক মাড়োয়ারী শেঠ এখানে ছিল সে-বছর, তাকে মেরে-ধরে টাকাকড়ি নিয়ে যায়। জায়গা ভালো না।

—আমাদের সে ভয় নেই পাটোয়ারীজী—সঙ্গে কিছু নেই যে নেবে। তবে লোক থাকে

রেখে দাও। আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা ক'রো না—কেবল একটু চা যদি হত—

সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি এখুনি। আপনারা স্টেটের অতিথি—খাবেন না তা কি কখনো হয়। দেওয়ানজী লিখেচেন আপনাদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আর টাকাকড়ির কথা বলচেন, এ জংলী দেশে চার আনা পয়সার জন্তে অনেক সময় মানুষ খুন হয়। পাহারা রাখতেই হবে।

রাত্রে পুরী ও হালুয়ার ব্যবস্থা করে দিলে রঘুনাথ পাটোয়ারী। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, এমন চমৎকার ভঁয়সা ঘি আর কখনো দেখিনি কোথাও—লছমীপুর আর এই জয়পুর ডাকবাংলো ছাড়া। কলকাতার বাজারে আমরা যে জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে কিনে থাকি, তা আর যাই হোক, খাঁটি ভঁয়সা ঘি যে নয়, তা বেশ ভালো ভাবেই বুঝলাম। এই রকম ঘি আর দেখেছিলুম বৈকুণ্ঠ পাঁড়ের বাড়িতে। পাটোয়ারীজীকে ডেকে বললুম—পুরী কি ঘিয়ে ভাজা?

—কেন বাবুসাহেব, ভঁয়সা ঘিয়ে।

—একটু নিয়ে এসে দেখাতে পারো?

একটা বাটিতে খানিকটা ঘি ওরা আমাদের কাছে নিয়ে এল—তার রং কলকাতার বাজারের ঘিয়ের মতো সাদা নয়—কটা, মাছের ডিমের মতো দানাদার। সুগন্ধে ঠিক গাওয়া-ঘির মতো—বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।

পাটোয়ারী বললে—বাবুসাহেব, দেহাত থেকে মাড়োয়ারীরা এই ঘি নিয়ে গিয়ে পাইল করে, মানে চর্বি আর অন্য বাজে তেলের সঙ্গে কিংবা খারাপ ঘিয়ের সঙ্গে মেশায়—তারপর টিন-বন্দী করে বাজারে ছাড়ে। শহর বাজারে সেই জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে চলে। খাঁটি ভঁয়সা ঘি কোথা থেকে আপনারা বাজারে পাবেন?

রাত্রে সুনিদ্রা হল, শরীর দুজনেরই ছিল খুব ক্লান্ত। একবার মাঝ রাত্রে উঠে বাংলোর বাইরে এসে চেয়ে দেখলুম—দূরে লছমীপুরের জঙ্গলের সীমারেখা আলো-আঁধারে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আকাশে বৃহস্পতি ও শনি এক সরলরেখায় অবস্থিত; জলজ্বল করচে বৃহস্পতি, তার নীচে কিছু দূরেই শনি মিটমিট করচে। বিশাল মাঠের সর্বত্র বড় বড় শাল ও মহুয়া ছড়িয়ে আছে দূরে দূরে। অল্পদূরেই ত্রিকূটের দুটি শৃঙ্গ আধো-অন্ধকারে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কি একটা রাত-জাগা পাখী প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কুস্বরে ডাকচে। ডাকবাংলোর বারান্দায় রঘুনাথ পাটোয়ারীর দরওয়ান তিনটি নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্চে। বনপ্রান্তরে যেন কি একটা অব্যক্ত রহস্য থম্ থম্ করচে—যা মনেই শুধু অনুভব করা যায়—কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে উঠে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে উঠলুম এসে।

দুপুর পর্যন্ত হেঁটে মহিষারডি বলে একটা গ্রামে এক আহীর গোয়ালার বাড়ি একটু জল চাইলুম।

গ্রামখানি ছোট—প্রায় সবই গোয়ালা অধিবাসী গ্রামে। বাড়ির মালিক বললে—কোথা থেকে আসচেন আপনারা?

—ভাগলপুর থেকে।

—কিসে?

—পায়ে হেঁটে, বৈষ্ণনাথজী যাচ্ছি।

কথাটা শুনে শ্রদ্ধায় লোকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আমাদের বিশেষ অনুরোধ করলে আমরা যেন সে-বেলা তার আতিথ্য স্বীকার করি। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবেলা রওনা হলে রাত আটটার মধ্যে আমরা ত্রিকূটের পাদদেশে মোহনপুর ডাকবাংলোর পৌঁছে সেখানে রাত কাটাতে পারি।

আমাদের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। অত রৌদ্রে ক্লান্ত শরীর নিয়ে পথ হাঁটা চলবে না এবেলা।

লোকটির নাম হরবংশ গোপ।

সে বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে আমাদের দেখিয়ে বললে—দেখ, কলিকালে ধর্ম্ম নেই কে বলে? বাবুজিরা ভাগলপুর থেকে পাঁওদলে আসচেন বৈষ্ণনাথজীর মাথায় জল চড়াতে। অথচ বাবুরা ইংরিজি বিস্তের জাহাজ—মস্ত বড় এলেমদার লোক। দেখে শেখ্।

আমরা দুজনেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লুম—এ প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নয়। তীর্থ করতে আমরা যাচ্ছিনে এই সওয়া-শো মাইল হেঁটে—এই সরল পল্লীবাসীরা সে কথা বুঝবে না। পুণ্যের আকর্ষণ ভিন্ন আর কিসের আকর্ষণে আমাদের এতখানি পথ টেনে এনেচে, তা এদের বোঝাতে গেলে আমাদের উন্মাদ ঠাওরাবে। অতএব ভক্ত তীর্থযাত্রী সেজে থাকায় জটিলতা নেই ভেবে আমরাও ওদের কথার প্রতিবাদ করে ওদের ভুল ভাঙাবার আগ্রহ দেখালাম না।

ওরা তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে আমরা কি খাবো।

আমরা বললুম—যা হয় খেতে পারি। তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের খাওয়া না হলেও চলবে।

হরবংশ গোপ সে কথা শুনলে না। চাল ডাল বার করে দিলে—আমরা রেঁধে খাবো। ওইখানে পড়ে গেলুম মুশকিলে। পথে বার হয়ে এ পর্যন্ত রান্না করে খেতে হয়নি একদিনও। আমরা ওজর-আপত্তি করলুম—ওরা ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাইয়ে জাত মারতে রাজি নয়।

মহিষারডি গ্রামখানার অবস্থান স্থান বড় চমৎকার। বামে কিছুদূরে ত্রিকূট শৈল; ডাইনে খানিকটা নাবাল জমি, তাতে শুধু বড় বড় পাথর ছড়ানো আর চারা শালের বন—দূরে একটা বড় বনের শীর্ষদেশ দেখা যায়—খুব ফাঁকা জায়গাটা।

তা ছাড়া অনেক আকর্ষণ আছে। এ ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঐশ্বর্যবান গ্রাম রেল-স্টেশনের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সেখানে কলকাতার লোকে বাড়ি না করে ছাড়তো না। গ্রামের যেদিকটা নাবাল জমি, তার বুড় ঢালুতে চারা শালের বনে খুব বড় তিন চারখানা শিলাখণ্ড ঠিক যেন হাতীর মতো উঁচু ও বড়। অন্তত দুখানা এমন শিলার ওপরে দুটি অর্জুন গাছের চারা ঠিক একেবারে পাথর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ও দুটোতে যথেষ্ট ছায়াদান করচে। বেশ ওঠা যায় পাথরে—সকালে, বিকালে, রাত্রে ত্রিকূট শৈল ও পেছনদিকের মুক্ত প্রান্তরের দিকে

চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে আপনমনে কাটানো যায়, বই পড়া যায়—বড় সুন্দর নিভৃত শিলাসন। আশেপাশে নিকটে দূরে অনেকগুলো পলাশবৃক্ষ।

রাঙা সিঁদুরের মতো মাটি, কাঁকরের ডাঙা, ছবির মতো একটি ঝরনা ত্রিকূট থেকে বেরিয়ে গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেচে সেই নাবাল জমিটার পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে।

ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্তেই যেন গ্রামের মধ্যে কয়েকঝাড় কাঁটা-বাঁশ রাঙা-মাটির ডাঙার ওপর সাজানো।

অম্বিকাকে বললুম—চেয়ে দেখ গ্রামখানার রূপ! এখানটা বাস করার উপযুক্ত স্থান। আমার যদি কখনো সুবিধে হয়, ঠিক এই মহিষারড়ি গ্রামে এসে বাস করবো।

অম্বিকাও বললে—সত্যি, এটা একটা বিউটি স্পট। যদি এত দূর আর এমন বেখাপ্পা জায়গায় না হত—আমিও এখানে বাস করতুম।

আমি ভেবে দেখলুম, রেল থেকে এই দূরত্বই (অন্তত বত্রিশ মাইল) ওকে আরও সৌন্দর্য দান করেচে। রেলস্টেশনের কাছে হলে এ গ্রাম যেন সাধারণের উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়তো—এ এখন রূপসী, সরলা বঙ্গবালা—শুভ্র ও অপাপবিদ্ধ। এই দিশাহীন রাঙামাটির মুক্ত প্রান্তর, অদূরের ওই শৈলচূড়া, হাতীর মতো বড় বড় পাথরের আসনগুলো—নাবাল জমিটার ও ঝরনাটার সৌন্দর্য এ গ্রামকে অদ্ভুত শ্রী দান করেচে—অথচ এখানে কলকাতার কোনো লোক এখনও বাড়ি করেনি—কোনদিন করবেও না—এ গ্রাম এমনি জনবিরল, নিস্তব্ধ ও শান্ত বনপ্রান্তরের মধ্যে চিরদিন নিজের সৌন্দর্য অটুট রেখে চলবে—একথা ভেবেও মনে আনন্দ পেলুম।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা গুপ্ত-বাসনা অবিশ্যিই থাকে—যদি কখনো সুবিধে হয় তবে এখানে বাড়ি করবো।

—জমির এখানে কি দাম হরবংশ?

—জমির দাম? কি করবেন বাবুসাহেব?

—ধরো যদি বাস করি?

হরবংশ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—বাস করুন না, জমি কিনতে হবে না বাবুজি। ওই মোড়ের ধারে ভালো জমি আমার নিজের আছে—আপনাকে দিচ্চি। আসুন না! যেখানে আপনাদের পছন্দ হবে গাঁয়ের মধ্যে জমি নিন। পনেরো কুড়ি টাকা বিঘে দরে জমি বিক্রী হয়। ওই রাঙা মাটির বড় ডাঙাটা নিন না! বাসের পক্ষে চমৎকার জায়গা। ওটা বাইশ বিঘের ডাঙা—আমি গ্রামের প্রধানকে বলে সস্তায় করে দেবো। দশটাকা বিঘে দরে ডাঙাটা আমি আপনাকে করে দিতে পারি। পড়েই তো রয়েচে আমার জন্ম থেকে। দশটাকা বিঘে পেলে বর্তে যাবে।

মহিষারড়ি থেকে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম।

যাবার সময় বার বার মনে করলুম, যদি কখনো সুবিধে হয়, আর একবার এই সুন্দর গ্রামখানিতে ফিরে আসবো। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি—কিন্তু

মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে হয় গ্রামখানির কথা। গত বৎসর বড়দিনের পরে কার্যোপলক্ষে একবার দেওঘর যেতে হয়েছিল, কতবার ভেবেছিলুম লছমীপুরের পথে গিয়ে একবার মহিষারডি গ্রামে হরবংশ গোপের সঙ্গে দেখা করে আসি, আবার ওদের রাঙামাটির সেই হাতীর মতো বড় পাথরখানার ওপর বসে আসি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ হয় কই!

মোহনপুর ডাকবাংলোয় আমরা পৌঁছে গেলাম বেলা দশটার মধ্যে। এই স্থানটিও খুব সুন্দর—ত্রিকূট-শৈলের পাদদেশে ডাকবাংলোটি অবস্থিত, দেওঘর থেকে বাউসি দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তারই ধারে।

আমরা সেখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেলা দুটোর সময় সেখান থেকে রওনা হবো ঠিক করেচি, কিন্তু অম্বিকা বললে—এতদূর এসে একবার ত্রিকূট পাহাড়ে ওঠা দরকার। পাহাড়ে না উঠে যাবো না।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম।

প্রথম অনেকদূর পর্যন্ত কাঁটা-বাঁশের বন। পাহাড়ে উঠবার পথ বেশ ভালো, বড় বড় পাথরের পাশ বেয়ে ঝরনার জল গড়িয়ে আসচে—কিছুদূর উঠে জন-দুই সাধুর সঙ্গে দেখা হল।

একজন বললেন—বাবুজিরা কোত্থেকে আসচেন ?

—ভাগলপুর থেকে, পায়ে হেঁটে দেওঘর যাবো।

—আপনাদের ধর্মে মতি আছে ; একালে এমন দেখা যায় না।

সাধু বাবাজিদের কাছে মিথ্যে ভক্ত সেজে কি করব, আমরা খুলেই বললুম সব কথা। আমাদের আসল উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে দেওঘর আসা, বৈদ্যনাথজীদর্শন নয়, যদিও মন্দিরে নিশ্চয়ই যাবো এবং দেবদর্শনও করবো।

ওঁরা আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিলেন, হালুয়া ও দুটি কলা।

আমরা কিছু প্রণামী দিয়ে সেখান থেকে নেমে এলুম।

বেলা পড়ে এল পথেই—দেওঘর পৌঁছুতে প্রায় রাত আটটা বাজলো।

১৯৩২ সালে আমার একটি বন্ধু মধ্যপ্রদেশের রেওয়া স্টেটের দারকেশা বলে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম থেকে আমায় চিঠি লিখলেন, সেখানে একবার যাবার অনুরোধ করে। তাঁর চিঠিতে স্থানটির অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা পড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মধ্য প্রদেশের ঘন বন ও পাহাড়ের মধ্যে গ্রামখানি অবস্থিত। তিনি সেখানে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করেন, ইদানীং কাঠের ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন, দুতিনটি ভালো ঘোড়াও কিনেচেন, অনেক কুলি ও লোকজন তাঁর হাতে, বনে বেড়াতে ইচ্ছা করলে তিনি সেদিকে যথেষ্ট সুবিধে করে দেবেন লিখেচেন।

আমি কখনও মধ্যপ্রদেশে যাইনি তার আগে, বেঙ্গল নাগপুর রেলের গাড়ি চড়ে এমন কি কোনোদিন রামরাজাতলাতেও যাইনি। তিনি লিখলেন, বিলাসপুর থেকে যে লাইন কাটনি

গিয়েচে,-তারই ধারে কার্গিরোড বলে একটি ছোট স্টেশন আছে, সেখান থেকে বত্রিশ মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে তাঁর ওখানে পৌঁছুতে। তিনি স্টেশনে ঘোড়া ও লোক রেখে দেবেন আমার চিঠি পেলে।

আমার সেই বন্ধুটির ছোট ভাই কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তার সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করলাম। সে-ও আমায় খুব উৎসাহ দিলে। সে ছুটিতে একবার সেখানে গিয়েছিল, চমৎকার জায়গা, গ্রামের ধারেই বিশাল বনভূমি, হরিণের দল চরে বেড়ায়, ময়ূর তো যথেষ্ট, গ্রামের গাছপালার ডালে বনময়ূর এসে বসে—ইত্যাদি।

আমি বললুম—কোন্ সময় যাওয়া ভালো? এখন তো বর্ষাকাল।

—পুজোর সময় রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যায়, পাহাড়ী ঝরনার জল শুকিয়ে যায়—সেই সময়েই যান।

ঠিক হল সে-ও পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু মাস-দুই পরে যখন পুজোর অবকাশ এসে পড়লো—সে বললে, তাকে একবার তাদের গ্রামে যেতে হবে, এখন সে যেতে পারবে না।

আমি তাকে বললুম—তোমার দাদাকে চিঠি লিখে দাও আমি ষষ্ঠীর দিন কলকাতা থেকে রওনা হবো, তিনি যেন সব বন্দোবস্ত রাখেন।

সে বললে—ঘোড়া চড়তে পারেন তো? বত্রিশ মাইল ঘোড়ায় ওপর যেতে হবে। রাস্তাও খুব ভালো না। উঁচুনীচু পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম, ঘোড়ায় চড়া আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। ওর চেয়ে বেশি পথও আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েচি। দিন ঠিক করে দুজনেই দুখানা পত্র দিলাম তার দাদার কাছে।

নির্দিষ্ট দিনে জিনিসপত্র নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বম্বে মেলে রওনা হলাম। সেবার সারা বর্ষাকাল ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে দিন-পনেরো কুড়ি আকাশ বেশ নির্মল হয়ে রৌদ্র ফুটেছিল। যাবার সময় দেখলুম রেলের দুধারে যথেষ্ট ধান হয়েচে, ফসল খুব ভালো হবে। বৈকালের ছায়ায় বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল ধানক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কোলাঘাটে পৌঁছে গেলুম। রূপনারায়ণের পুল যখন পার হই, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেচে। বম্বে মেল ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গিধনি, ঘাটশিলা, গালুডি পার হয়ে গেল।

রাত হয়েচে বেশ।—আমার মুশকিল হয়েচে খড়্গপুর জংশনে খাবার কিনিনি, ভেবেছিলুম তখনও তত রাত হয়নি—আগের কোনো স্টেশনে কিনবো এখন। বি এন আর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না—এ লাইনে যে ভালো খাবার পাওয়া যায় না, তখন তা জানতুম না। অপকৃষ্ট ঘি-এ ভাজা পুরী ও কুশ্রী তরকারি দেখে খাবার প্রবৃত্তি কমে গেল।

টাটানগরে গাড়ি প্রায় আসে, এক সহযাত্রী ভদ্রলোক পাশ থেকে আমায় বললেন—মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—আমার বাড়ির খাবার সঙ্গে আছে, আপনাকে কিছু দিতে পারি?

তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দু-চারটি কথাবার্তা হয়েচে। ভদ্রলোক ডাক্তার, রাজপুর

যাচ্ছেন তাঁর কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি—এইটুকু মাত্র তাঁর পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন কথাবার্তার মধ্যে।

ভদ্রলোক দেখি খাবার ব্যার করে দুভাগে ভাগ করচেন।

আমি বিনীত ভাবে তাঁকে বললুম, আমার খিদে নেই, কিছু খাবো না। শরীর ভালো নয়।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন, কি হয়েছে আপনার?

—না, বিশেষ কিছু হয়নি। খাবার ইচ্ছে নেই।

লোকটি অদ্ভুত ধরনের। কতকালের পরিচিতের মতো তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বাঃ খাবেন না বললেই হল? এত খাবার দিয়েচে বাড়ি থেকে, আমি কি একলা খাবো, না খেতে পারি? আপনি তো কিছুই খাননি, সারারাত কাটাবেন কি করে? আর এ লাইনে ভালো খাবার পাবেন না যে কিনে খাবেন এরপর খিদে পেলে। ওকথা শুনবো না—খান, খান, আসুন—বলেই তিনি আমার সামনে খাবারের এক ভাগ এগিয়ে দিলেন।

আমি এমন ধরনের মানুষ কখনো দেখিনি, মানুষকে এত অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয় ও অন্তরঙ্গদের মতো ভাবতে পারে যে লোক, তার অনুরোধ উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়।

অগত্যা খেতে হল।

ভদ্রলোক নিজে খান, আমার পাত্রের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তরকারিটা, না? আমার মা, বুঝলেন না?

আমি সম্ভ্রমের ভাব মুখে এনে বলি—ও!

—বাহাত্তরের ওপর বয়স।

—বলেন কি?

—নিশ্চয়ই। বাহাত্তরের ওপর বয়স।

এর উত্তরে কি বলা উচিত ঠিক বুঝতে পারিনে। খুব খানিকটা বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব মুখের ওপর এনে ফেলার চেষ্টা করি—যদিও একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বয়স বাহাত্তর হওয়ার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই নেই।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন—মা এখনও সংসারের যাবতীয় রান্না সব নিজের হাতে করে থাকেন। এই যা খাচ্ছেন, সব তাঁর নিজের হাতের।

আমি এবার আর নিরুত্তর রইলুম না, উত্তর দেওয়ার পথ খুঁজে পেয়েচি। বললুম—তাই বলুন। এ রকম রান্না কি কখনো একালের মেয়ের হাতে···খেয়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি—এ না জানি কার হাতের!

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—পারবে কেউ আজকালের মেয়ে? বলুন!

—আরে রামোঃ! একালের মেয়ে—হেঃ—

আমি অবজ্ঞাসূচক হাসি টেনে আনি মুখে।

মনের গোপন তলায় একটা প্রশ্ন বার বার উঁকি মারছিল—ভদ্রলোক অবিবাহিত না বিপত্নীক ? কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, এমন নয় তো ?

—আর দুখানা পুরী নিন—না না, লজ্জা করবেন না মশাই, লজ্জা করলে ঠকবেন রাত্রে। সেই বিলাসপুরে ভোর, তার আগে কিছু মিলবে না ভালো খাবার—

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল দুজনেরই। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব মাতৃভক্ত, তাঁর মাতৃদেবীর গুণকীর্তন শুনতে হল অনেকক্ষণ বসে। শোবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শয্যা আশ্রয় করতে পারলুম না।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আমার ঠিক মনে নেই, একটা কি স্টেশনে দেখি ভদ্রলোক আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলচেন—ও মশাই, উঠুন—একটু চা খান—খুব ভালো চা এই স্টেশনের—এই ধরুন কাপটা—

উঁকি মেরে জানালা দিয়ে দেখি স্টেশনের নাম ঝার্সুগুডা।

বললুম, রাত কত মশাই ?

—তিনটে পঁচিশ—

ট্রেন ছাড়লে চেয়ে দেখি রেলের দুধারে শেষরাত্রের অন্ধকারে কেবল বন আর বন। মধ্যপ্রদেশে এসে পড়া গেল নাকি ? আরও অনেক স্টেশন চলে গেল। বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন, শেষ-রাত্রের ঘন অন্ধকারে কেমন অপরূপ মনে হচ্ছে।

কখনো এ লাইনে আসিনি—বনের এমন শোভা যে এ লাইনে আছে তা আমার জানা ছিল না। সেদিক থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ একটি বিশেষ লাইন, যা কিনা চক্ষুষ্মান্ ও প্রকৃতিরসিক যাত্রীর সামনে আদিম ভারতের ছবি ধীরে ধীরে খুলে ধরবে, তার নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের বস্তির সারি, স্থানের অনার্য নাম ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় প্রাক্-আর্য যুগের ভারতবর্ষের কথা।

জানালা খুলে অন্ধকারে বনশ্রেণীর দিকে চেয়ে বসে রইলুম। ঘুম আমার চোখ থেকে চলে গেল। পয়সা খরচ করে দেশ বেড়াতে এসেচি, ঘুমোবার জন্যে নয়। আমার সহযাত্রী কিছুক্ষণ বসে ছিলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। ট্রেনের কামরার মধ্যে কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমুচ্চে, আমার নীরব উপভোগের বাধা জন্মায় এমন কোনো বিবাদী সুর কানে আসে না, মনে হল বহুকাল ধরে চেয়ে থাকলেও চোখ আমার কখনো শ্রান্ত হয়ে উঠবে না, মন তার আনন্দকে হারাবে না।

রাতের অন্ধকারে সে বিশাল বনভূমির দৃশ্য যে না দেখেচে, সে পৃথিবীকে অত্যন্ত মহিমময় একটি রূপে আদৌ প্রত্যক্ষ করেনি, তার শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বিশালের অনুভূতি মনে জাগায় এমন যে কোনো দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বক্তৃতার চেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিস শিক্ষার দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ এখনও এ বিষয়ে উদাসীন, নতুবা ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে দেশ বেড়াবার ব্যবস্থা করতো, পয়সা খরচ করে যদি নাও হয়, পায়ে হেঁটে যতদূর হয় তাও তো করা যেতে পারে।

আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বা বিরাট, কোথাও রুক্ষ ও বর্বর—তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।

আমার সহযাত্রী এই সময় ঘুম থেকে উঠে আমায় বললেন—কোন্ স্টেশন গেল?

আমি স্টেশনের নাম পড়িনি, তা জানালুম। তিনি উঠে বসলেন। বাইরের অরণ্যের চেহারা দেখে বললেন—ও, এবার বিলাসপুরের কাছাকাছি এসে পড়েচি, এ সব সম্বলপুরের ফরেস্ট।

—তাই নাকি! আমি জানতুম না। চমৎকার দেখাচ্ছিল।

—ঘুমোননি বুঝি? বসে বসে দেখছিলেন নাকি?

—না, এই ঝার্সুগুডা থেকে একটু অমনি—

—আপনি নতুন আসচেন, আমি বহুবার দেখেচি এ সব। সেই টানেই তো আসি।

—আপনারও খুব ভালো লাগে এসব—না?

—খুব। কালাহাণ্ডি ফরেস্টের নাম শুনেচেন? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানে শিকারে গিয়েচি—বড় ইচ্ছে করে আবার যেতে।

লোকটিকে এতক্ষণ ভালো চিনতে পারিনি। সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। পিপাসা থাকলেই হল—না দেখলেও ক্ষতি নেই। পিপাসা আত্মার জিনিস—দেখাটা বহিরিন্দ্রিয়ের। মনের বেদীতে হোমের আগুন না নিবে যায়। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো সে আগুন অতি যত্নে যে রক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করবে—কারণ তার চোখ ও মন তৈরী হয়ে গিয়েচে। তার আত্মার স্পর্শ লেগেচে বিরাটের, অনন্তের।

আমার সহযাত্রী সোৎসাহে কালাহাণ্ডি ফরেস্টে শিকারের কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার কখন নিদ্রাবেশ হয়েচে জানিনে—হঠাৎ কতক্ষণ পরে যেন আমার কানে গেল কে বলচে—উঠুন, উঠুন, বিলাসপুর আসচে—জিনিস গুছিয়ে নিন—ও মশাই—

তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ট্রেনের বেগ কমিয়েচে, বন পাহাড় অদৃশ্য, অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়ে বেশ দিনের আলো ফুটেচে। দূরে একটা স্টেশনের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যাল দেখা গেল। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, কারণ আমায় বিলাসপুরেই নামতে হবে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভয়ানক মেঘ করেচে, মন বড় দমে গেল মেঘ দেখে। আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয় তবে এবারকারের বেড়ানোটা মাটি করে দেবে।

হলও তাই।

বিলাসপুর রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে বসে চা খাচ্চি—এমন সময় ভীষণ বৃষ্টি নামলো। সে বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখলুম না ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেও, অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে কাট্‌নি লাইনের ট্রেনে চড়লুম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

দু'ধারে শালের বন আর অনুচ্চ পাহাড়। রেলের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি শ্রাবণ মাসের বর্ষাদিনের মতো নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন চেহারাখানা আকাশের—মেঘের

জোড় মিলিয়ে দিয়েচে—ছুই মেঘের মধ্যে একচুল ফাঁক নেই আকাশের কুত্রাপি।

প্রমাদ গনলাম মনে মনে।

সূর্যের আলো না দেখতে পেলে মন আমার কেমন যেন মিইয়ে মুষ্‌ড়ে পড়ে। বর্ষাকালে বর্ষা ভালো লাগে না এমন কথা বলচিনে—কিন্তু পয়সা খরচ করে এতদূর বেড়াতে এসে যদি এমন অকালবর্ষা নামে, তবে মন খারাপ হওয়া খুব বেশি অস্বাভাবিক নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

কয়েকটি মাত্র স্টেশন পেরিয়ে এসেই কার্সিয়োড—ছোট স্টেশনটা, চারিদিক পাহাড় ও বনে ঘেরা।

একরকম ভিজতে-ভিজতেই নামলুম গাড়ি থেকে। জনপ্রাণী নেই কেউ কোনোদিকে, কোথায় বা বন্ধুর লোক, কোনোদিকে একটা ঘোড়ার টিকিও দেখলুম না। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের টিকিটঘরের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে রইলুম।

হয়তো এমন হতে পারে, বন্ধুর প্রেরিত লোকটা ঘোড়া নিয়ে আসতে আসতে এই ভীষণ বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে—তাই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টিটা থামলেই সে এসে পড়বে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো মুষলধারে, ঘণ্টা ছুই কাটলো—বেলা এগারোটা। কাছের একটা পার্বত্য ঝরনা ফুলে ফেঁপে উঠেচে—নালা দিয়ে তোড়ে জল চলেচে—পাহাড় থেকে জলের তোড় নেমে রাস্তায় অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়েচে।

বেলা এগারোটার পর বৃষ্টি একটু কম জোরে পড়তে লাগলো, একেবারে থামলো না—কিন্তু বন্ধুর প্রেরিত কোনো লোকের চিহ্ন দেখা গেল না রাস্তার ওপর।

আমি ঠায় বসে আছি বেঞ্চিখানার ওপর, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টার একবার আমার দিকে চেয়ে দেখে নিজের বাসায় চলে গেল। স্টেশন জনহীন।

আমি পেছনের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। মেঘ যেন পাহাড়ের মাথায় এসে জড়িয়ে আছে—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে—ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছিলুম—সেও ঠিক এমনিধারা এক বর্ষণমুখর দিনে—ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজার উঁচু খিলানের মাথায়, সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক যেন মেঘের মধ্যে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। মেঘের রাশি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে পাক খাচ্চে বুলন্দ দরওয়াজার খিলানের কার্নিসে। এই বনবেষ্টিত নির্জন স্টেশনটিতে বসে কয়েক বৎসর আগে দেখা সে ছবিটা মনে এল।

মুশকিল হয়েচে, ছাতিটা পর্যন্ত আনিনি যে, না হয় জিনিসপত্র স্টেশনঘরে রেখে একটু পাহাড়ের ওপর গিয়ে বেড়িয়ে আসবো।

বেলা ছুটো বাজলো স্টেশনের ঘড়িতে, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টারটি বাসা থেকে ফিরে এল, বোধ হয় খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে উঠে এল এবং পূর্ববৎ একজায়গায় বসে আছি দেখে আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে স্টেশনঘরে ঢুকলো। কাটনি থেকে একখানা ডাউনট্রেন কিছু পরেই এল, মিনিট ছুই দাঁড়ালো, ছেড়ে বিলাসপুরের দিকে চলে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখেচি। এ বনের মধ্যে কোথাও একটা দোকান-পসার চোখে পড়েনি যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাই। কিছু মেলে না এ বনে, নিকটে একটা বস্তি পর্যন্ত নেই। এমন জানলে বিলাসপুর থেকে কিছু খাবার কিনে আনতাম।

স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করবো? কোনো দোকান না থাকলে ওরাই বা খাবার কোথা থেকে আনায়! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো। ভাবলুম, লোকটা মনে করতে পারে হয়তো তার বাড়িতেই আমি খেতে চাইচি। না, এ প্রশ্ন ওকে করা হবে না।

বেলা চারটে। তখন আমি সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েচি। যদি লোক না-ই আসে তবেই বা কি করবো? স্টেশনের দেওয়াল-সংলগ্ন টাইমটেবিল দেখে বুঝলাম রাত সাড়ে সাতটায় বিলাসপুরে ফিরে যাবার আর একখানা ডাউনট্রেন আছে—তাতেই ফিরে যাবো বিলাসপুরে এবং সেখান থেকে কলকাতায়। পয়সা খরচ করে এতদূরে অনর্থকই এলুম! এখানে বসে থেকেও তো আর পারিনে। সেই বেলা ৯টা থেকে আর বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়েদেয়ে ঠায় একখানা বেঞ্চির ওপর বসে আছি, স্টেশনটা মুখস্থ হয়ে গেল; এর কোথায় কি আছে আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, ততকাল নিখুঁত ভাবে মনে থাকবে এমন গভীর ভাবে এর ছবি আঁকা হয়ে গিয়েচে আমার মনে। অথচ বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামলেও একেবারে নির্দোষ হয়ে থেমে যায়নি।

এই সময় স্টেশন-মাস্টারটি স্টেশন ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের বাসায় ফিরে চললো। যাবার সময় পুনরায় আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল; একবার জিজ্ঞাসাও করে না যে আমি কে, কেন এখানে সেই সকাল থেকে বসে আছি দারুব্রহ্মের মতো অচল অবস্থায়—বেশ লোক যাহোক!

স্টেশন আবার জনহীন। একে মেঘান্ধকার দিন, তার হেমন্তের ছোট বেলা, এরই মধ্যে যেন বেশ বেলা পড়ে আসে আসে হল, মনে হতে লাগলো সন্ধ্যা হবার আর বেশি দেরি নেই। কি করা যায় এ অবস্থায়? রাত্রি কাটাতে হলে যতদূর বুঝচি, স্টেশন-মাস্টারের স্টেশনের ঘরখানার মধ্যে আমায় জায়গা দেবে না, এই বাইরের বেঞ্চিখানাতেই আমায় শুয়ে থাকতে হবে।

এমন সময় দূরে বাজনা-বাদ্যির শব্দ শোনা গেল। চেয়ে দেখি একদল লোক বাজনা বাজিয়ে স্টেশনের দিকে আসচে। কাছে এলে দেখলুম তারা বরযাত্রী, দশ-বারো বছরের একটি বালক বরসাজে ডুলি চেপে এসেচে ওদের সঙ্গে। আশ্বিন মাসে বিবাহ কি রকম? এদেশে বোধহয় হয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে তিন-চারজন লোক এসে আমার বেঞ্চিতে বসলো। নিজেদের মধ্যে ওরা খুব গল্প-গুজব হল্লা করচে, একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—কেউ কোনো-রকম ধূমপান করচে না। পরের পয়সায় ধূমপান করবার এমন সুযোগ যখন বরযাত্রী হয়ে এরা ছেড়ে দিচ্চে তখন মনে হল ধূমপানের প্রথা এদেশে কম। পরে জেনেছিলুম, আমার অনুমানের মধ্যে অনেকখানি

সভ্যতা আছে। কাঁচা শালপাতা জড়ানো পিকা ছাড়া এদেশে বিদেশী চুরুট বা সিগারেটের চলন খুব কম।

একজন আমার দিকে চেয়ে হিন্দিতে বললে, বাবু, কোথায় যাবেন?

বাবা! এতক্ষণ পরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলুম। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল কথা না বলে। বললুম, দারকেশা যাবো—

সে বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললে, দারকেশা! আপনি কোন্ গাড়িতে নেবেচেন? কোথা থেকে আসচেন?

—সকালের গাড়িতে। কলকাতা থেকে আসচি—

—তবে এতক্ষণ বসে আছেন যে?

সব খুলে বললাম। লোকটির চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখে খুব উচ্চবর্ণের বলে মনে হয়নি, এই বরযাত্রীর দলের মধ্যে কেউই উচ্চবর্ণের নয় এই আমার ধারণা, কিন্তু লোকটি ভদ্র ও অমায়িক। সব শুনে সে বললে, আপনার তো বড় কষ্ট হয়েচে দেখচি, সারাদিন বসে এভাবে, খাওয়া-দাওয়া হয় নি বোধহয়। আপনি কি করবেন এখন?

—কি করবো, বুঝতে পারচিনে।

—দারকেশায় যাবেন কেন, সেখানে বড্ড বন, জংলী জায়গা—

শুনে আমার আরও আগ্রহ বাড়লো দারকেশা দেখবার জন্যে। সে জায়গা না দেখে চলে যাবো এত দূর এসে? ওকে বললাম, কোনো ব্যবস্থা হতে পারে সেখানে যাবার?

সে ওদের দলের দু-তিন জনকে ডেকে গোঁড় বুলি মিশ্রিত হিন্দীতে কি পরামর্শ করলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, সব ঠিক হয়ে গেল। আমাদের দলে যারা এসেচে, তাদের মধ্যে তিনজন ডুলি নিয়ে ফিরে যাবে। আপনি ডুলি চেপে এখান থেকে ন-মাইল দূরে মান্সার বলে একটা গাঁয়ে যাবেন। সেখানে রাত্রিটা থাকবেন।

—কোথায় থাকবো? ডাক-বাংলো আছে?

—সে ব্যবস্থা বলে দিচ্চি ডুলিওয়ালাদের। আপনি ওদের ডুলিভাড়া একটা দিয়ে দেবেন সেখানে গিয়ে। ওরা আপনাকে থাকবার জায়গা করে দেবে।

—তারপর আর বাকি পথ? বত্রিশ মাইলের ন-মাইল হল মোটে।

—আজ রাত তো সেখানে থাকুন। কাল সকালে উঠে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই ব্যবস্থাই ভালো। ফিরে যাওয়া বা এখানে স্টেশনের ওজনকলের মতো বসে থাকার চেয়ে এগিয়ে চলাই যুক্তি। ন'মাইল ন'মাইলই সই। লোকটিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমি ডুলি চাপলাম।

উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, তোড়ে জল চলেচে রাস্তার পাশের নালা দিয়ে। শালগাছ সর্বত্র। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মধ্যপ্রদেশের এই অংশকে Deccantrap-এর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দেশ করেচেন, শালবৃক্ষ এই অঞ্চলে সকলের চেয়ে বেশি জন্মায়।

স্টেশন ছাড়িয়ে প্রথমটা দু ধারে অনেক পাহাড় পড়লো, তারপর রাস্তা অনেকখানি নীচু

হয়ে গিয়ে একটা ঝরনা পার হয়েচে. তারপর খানিকটা সমতল প্রান্তর, ইতস্তত ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো।

সেই মাঠের মধ্যে বেলা পড়ে এল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে নামচে। আমার ডুলির পেছনে পেছনে ওদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার জিনিস-পত্র মাথায় করে নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে আমার মনে হল লোকটি নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ভিক্ষের আসামী। ডুলিবাহকদের একজনকে বললুম, এ বেচারী মোট বইতে পারচে না; তোমরা কেউ জিনিস নিয়ে ওর কাঁধে ডুলি দাও।

তারা হেসে বললে—বাবু, চুপ করে বসুন, ও একজন ভালো শিকারী। গায়ে ওর খুব জোর—কোনো ভাবনা নেই।

—কি শিকার করে?

—হরিণ মারে, ভাল্লুক মারে। সব কিছু মারে—

—কোন্ জঙ্গলে শিকার করে?

—আপনি যেখানে যাবেন বাবু, সেখানে খুব বড় জঙ্গল আছে। সেখানে ও গিয়েচে অনেকবার।

শুনে লোকটার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল। ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, গায়ে চর্বি বোধহয় এক আউন্সও নেই, কিন্তু লোহার তারের মতো শক্ত দড়ি-দড়ি হাত-পা। গলাটা যেন একটু বেশি লম্বা, চক্ষুদুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, গলার হাড় বেরুনো, চেহারায় দস্তুরমত বিশেষত্ব আছে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

পথে বেশ অন্ধকার হল।

আমার একটু ভয় যে হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। সঙ্গে তিনজন অপরিচিত লোক, সুটকেসে কিছু টাকা-কড়িও আছে, জামায় সোনার বোতাম আছে, হাত-ঘড়ি আছে, এই পাহাড়ী জায়গায় এদের বিশ্বাস কি।

জিজ্ঞেস করলুম—মান্‌সার আর কতদূর হে?

—আর বাবু তিন মিল।

ওদের তিন মিল আর শেষ হয় না, তারপর দুঘণ্টা কেটে গেল। ডুলির বাইরে বড় অন্ধকার হয়ে এসেচে, কিছু দেখা যায় না, তবে মনে হচ্চে মাঝে মাঝে শালবন, মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড় পড়চে রাস্তার দু-ধারে, ঝরনার জলের শব্দও পাচ্চি।

আজ দেবীপক্ষের সপ্তমী, অথচ মাঠ বন ঘুট-ঘুটে অন্ধকার।

আরও কিছুক্ষণ পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে দু একটা আলো দেখা গেল। একটা ছোট-মতো খালের হাঁটুজল পেরিয়ে আমরা মান্‌সারে পৌঁছে গেলুম।

ওরা বললে—বাবু, আপনাকে থাকবার জায়গায় দিয়ে আসি। কাল সকালে এসে আবার আমরা দেখা করবো।

একটা বড় চালাঘরে ওরা আমায় নিয়ে গেল। ঘরের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, তিন-

দিকে কিসের বেড়া দেওয়া অন্ধকারে ভালো ঠাওর হল না। একটা আলো পর্যন্ত নেই, ভীষণ অন্ধকার। আমি তো অবাক, এ রকম ঘরে জিনিসপত্র নিয়ে রাত কাটাবো কেমন করে?

বললুম, এ কারো বাড়ি, না কি এটা?

আমাদের মণ্ডপ-ঘর। সাধারণের জন্তে সাধারণের চাঁদায় তৈরী। এখানে থাকুন, কোনো ভয় নেই। আমি খুব আশ্বস্ত হলুম না। আর কোনো কিছুর ভয় না থাকলেও সাপের ভয় যে আছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মধ্যপ্রদেশের এই সব বনাঞ্চলে শুনেচি নাকি শঙ্খচূড় (King Cobra) সাপের খুব প্রাদুর্ভাব।

ওদের বললুম কথাটা। ওরা আমায় নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলে। সাপ কখনো তারা চোখে দেখেনি, সাপ কাকে বলে তারা জানেই না। আমি নির্ভয়ে এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারি।

কিন্তু সাপ যদি না-ও থাকে, এ খোলা জায়গায় চোরের ভয়ও কি নেই? নিশ্চয়ই এখনো এদেশে সত্যযুগ চলচে না।

ওরা আমার কথা শুনে হাসলে। চুরি নাকি এদেশে অজ্ঞাত। তাদের জ্ঞানে কখনো মানসারে চুরি হয়নি। বিশেষ করে বিদেশী লোকের জিনিস কেউ ছোঁবেও না।

আমাকেই রান্না করতে হল রাত্রে। যবের রুটি, ঢেঁড়সের তরকারি ও দুধ। এদেশে আটার রুটি খাওয়ার প্রচলন তত নেই—বাজার থেকে আটা ময়দা এরা বড় একটা কেনে না। নিজেদের ক্ষেত্রোৎপন্ন যব, গম ও মকাই এর রুটিই সারা বছর খায়। গম খুব বেশি হয় না বলেই তার সঙ্গে যব ও মকাই যোগ না করলে বছর কাটে না। অনেক সময় যব, গম ও মকায়ের ছাতু—তিন দ্রব্যের সংমিশ্রণেও রুটি তৈরি করা হয়।

রাত্রে সুনিদ্রা হল। পরদিন সকালে উঠতেই গ্রামের অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের মুখে খবর নিয়ে জানা গেল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস এ গ্রামে। প্রধান উপজীবিকা চাষ ও লাক্ষা সংগ্রহ। লাক্ষাকীট পোষা ও সংগ্রহ করে মাড়োয়ারী মহাজনদের কাছে বিক্রি করা সারা উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান কুটীর বাণিজ্য।

আকাশের দিকে চেয়ে প্রমাদ গনলাম। আবার ভয়ঙ্কর মেঘ জমা হয়েচে, বর্ষা দেখচি নামলো কালকের মত। এই বর্ষার মধ্যে এই আশ্রয় ছেড়ে রওনা হব কিনা ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি নামলো সত্যিই।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারায়, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। সেই সময়টা আমার ঘরে কেউ নেই, সবাই গল্প করে উঠে গিয়েচে। একটি বালক ভিজতে ভিজতে এক ঘটি দুধ নিয়ে এল আমার জন্তে।

আমি তাকে বলি—চা পাওয়া যায় না এখানে?

—না বাবু-সাহেব।—এ কথা আমার আদৌ মনে ছিল না যে বন-জঙ্গলের দেশে চা

পাওয়া যাবে না হয়তো। মনে পড়ল বিলাসপুর থেকেও তো নিতে পারতুম। অগত্যা গরম দুধ খেয়ে চায়ের পিপাসা দূর করতে হল। ছেলেটি দুধ জ্বাল দিয়ে দিলে। দুধ এক সেরের কম নয়; আমি ওকে বললুম—কত দাম দেবো?

সে বললে, প্রধান বলে দিয়েচে বাবু-সাহেবের কাছে দুধের দাম নিবিনে।

—তোর দুধ?

—হাঁ বাবুজি, আমাদের বাড়ির দুধ। মা দিয়েচে।

—তোর জল-খাবার বলে দিচ্চি—দুধের দাম না হয় না নিবি!

—না বাবু-সাহেব, পয়সা আমি নিতে পারবো না।

—আমি তোকে বকশিশ দিতে পারিনে?

—না বাবু, আমরা বকশিশ নিইনে। আমরা মাহাতো, গোয়ালা—দুধই বেচি।

না, একে দেখচি কিছু বোঝানো যাবে না। ভিজতে ভিজতেই ছোকরা চলে গেল। দুপুরের আগে সে-ই আবার এল কিছু চাল ও ঢেঁড়শ নিয়ে। নুন তেল কাল রাত্রের দরুন কিছু অবশিষ্ট ছিল। ওর সাহায্য নিয়ে ভাত ও ঢেঁড়শ-ভাতে রান্না করলুম—দুধ ছিল আধ সেরের ওপর, সেটা আর একবার গরম করে নিলাম। খাওয়া শেষ হল; ছোকরাকেও খেতে বললুম, সে আপত্তি করলে।

বেলা দুটোর সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। গ্রামের লোক দেখা করতে এল ওদের চাল-ডালের দাম দিতে গেলে কিছুতেই নিলে না। মণ্ডপঘরে যারা আশ্রয় নেয়, তারা গ্রামের অতিথি। প্রধানেরা এ সব ব্যবস্থা করে, গ্রাম-ভাটি থেকে এর খরচ হওয়ার প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন।

আমি বললুম—বেশ, গ্রাম ভাটিতে কিছু চাঁদা দিতে কোনো আপত্তি হতে পারে কি?

—না বাবু সাহেব, অতিথির কাছ থেকে কিছু নেওয়া নিয়ম নেই।

সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনতে হলে এ ধরনের গ্রামের, অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে হয়। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বেড়ালে আর যাকেই চেনা যাক, চীরবাসা ভৈরবী ভারত-মাতাকে চেনা যায় না।

বেলা দুটোর পরে ওরা একটা ঘোড়া ভাড়া করে দিলে। ঘোড়ার সহিসই আমার জিনিস-পত্র নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে যাবে ঠিক হল। দারকেশা পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া ও সহিসের মজুরি ধার্য হল পাঁচ টাকা।

আমি রওনা হয়ে পথে বেরিয়েচি—মাইল দুই এসে দেখি দুজন লোক আসচে, একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একজন, ঘোড়ার পেছনে পেছনে আর একজন।

আমাকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আমিও ঘোড়া থামালুম।

—তোমরা কোথায় যাচ্চ?

—কার্গি রোড স্টেশনে। প্রতাপবাবু পাঠিয়েচেন। বাবুজি কি কলকাতা থেকে আসচেন? আপনার নাম?

আমি বললুম—এত দেরি করে এলে কেন ? তোমাদের জন্তে স্টেশনে বসে বসে কাল হয়রান হয়েচি।

আসলে এদের চিঠি পেতে দেরি হয়েছিল। এ সব জংলী জায়গায় চিঠি বিলি হতে দু-একদিনের এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আমি আমার আগের ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে নতুন ঘোড়ায় চড়লুম। নতুন সঙ্গীদের বললুম—বেলা তো এখুনি যাবো-যাবো হল, রাত্রে কোথায় থাকা যাবে ?

ওরা বললে—চোরামুখ গালার কারখানায়।

—সে কতদূর ?

—এখনও বাবুজি, আট মাইল। রাত সাতটায় সেখানে পৌঁছবো।

পথের সৌন্দর্য সত্যই বড় চমৎকার। পথের বাঁ-পাশে একটা ছোট নদী এঁকে বেঁকে চলেচে, অভ্রকণা মেশানো বড় বড় শিলা দিয়ে তার দুই পাড় যেন মাঝে মাঝে বাঁধানো। এক একটা গাছের কি আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি। পড়শী ও ভেলা গাছ এ অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র, কিন্তু কোথাও বেশি বড় বন নেই।

একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটা সুন্দর লাগলো। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে স্থানে স্থানে নীল রং বেরিয়ে পড়েচে। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে এল, তারপরেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ফুটলো।

দুতিনটি বস্তি পার হওয়া গেল রাস্তায়। একটা বস্তিতে কি একটা পাঠ হচ্চে। চাঁদোয়ার নীচে বাতি জ্বলচে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ পাঠককে ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনচে। আমাদের দেশের কথকতার মতো। সন্ধ্যার পর বন আর চোখে পড়ে না, শুধুই একঘেয়ে মোরুম ছড়ানো বড় বড় মাঠ—এ মাঠে যদি ডাকাত পড়ে আমাদের সবাইকে খুন করেও যায়, তাহলেও কেউ দেখবে না। কোনো দিকে লোক নেই, একটা বস্তির আলোও চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় পুরো দু ঘণ্টা লাগলো এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হতে, অবিশ্যি ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার উপায় ছিল না আমার—কারণ পথ চিনি না, সঙ্গের দুজন লোক ঘোড়ার পাশে হেঁটে যাচ্চে —তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া চলে না।

প্রায় যখন সাড়ে সাতটা, তখন দূরে আলো দেখা গেল।

ওরা বললে—ওই চোরামুখ বস্তির আলো।

বেশ শীত করচে, বোধ হয় বাদলার হাওয়া আর এই একদম খোলা মাঠের জন্তেই। অগ্রহায়ণের প্রথমে যেমন শীত পড়ে বাংলা দেশে, সেই রকম শীতটা। গরম কাপড় সঙ্গে বিশেষ কিছু আনিনি, মনে হল না-এনে বড় ভুল করেচি।

চোরামুখ পৌঁছে একটা বড় খোলার কুলি-ধাওড়ার মতো ঘরে ওরা আমায় ওঠালে। সঙ্গে কোনো আলো নেই—আমার সঙ্গেও না। জায়গাটা নিতান্ত অন্ধকার। জিনিসপত্র নামিয়ে বিশ্রাম করচি, এমন সময় আমার নজরে পড়লো ঘরটার সামনের রাস্তা দিয়ে বাঙালী

ধরনের ধুতি-কামিজ পরা একজন লোক যাচ্ছে—কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক চিনতে পারলুম না লোকটি বাঙালী কি না।

আমি ওদের বললুম—এখানে দোকান আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, ছোট একটা বাজার আছে—সব পাওয়া যায়।

ওদের পয়সা দিলুম চাল ইত্যাদি কিনে আনতে। মোমবাতি যদি পাওয়া যায়, তাও আনতে বলে দিলুম। আমি অন্ধকারে বসে আছি চুপ করে—প্রায় মিনিট কুড়ি পরে দেখি আগের সেই বাঙালী-পোশাক পরা লোকটি সামনের রাস্তা দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে যাচ্চে। দু-একবার ডেকে জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হলেও শেষ পর্যন্ত চুপ করেই রইলুম।

তারপর আমার লোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। ওরা মোমবাতি পায়নি—কিন্তু মহুয়ার তেল ও মাটির প্রদীপ কিনে এনেচে। দড়ি দিয়ে সল্‌তে করে মাটির প্রদীপই জ্বালানো গেল। পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন করে ঘরের এককোণে রান্না চড়িয়েচি ওদের সাহায্যে—ভাত প্রায় নামে নামে এমন সময় পেছন থেকে কে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো—মশাই কি বাঙালী?

পিছন দিকে চেয়ে দেখি সেই বাঙালী পোশাক পরা লোকটি। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালীই বটে। কলকাতা থেকে আসচি।

ভদ্রলোক মহা খুশী হলেন মনে হল। বললেন—তা এখানে কি করচেন?

আমি সংক্ষেপে সব ব্যাপার খুলে বললুম। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে উঠলেন—তাও কি কখনো হয়! আপনি বাঙালী, এখানে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন! আসুন, চলুন। ওসব যা রাঁধচেন, আপনার সঙ্গের লোক খাবে এখন। আপনি চলুন আমার বাড়ি।

—আপনি কি করে জানলেন আমার কথা?

—বাজারে শুনলুম। বললে, এক বাঙালী বাবু কলকাতা থেকে এসেচেন, দারকেশ্বা যাচ্চেন, আপনারই গুদামে আশ্রয় নিয়েচেন। চাল ডাল কিনে এনেচে আপনার লোক তাও জানি।

—এ বুঝি আপনার গুদাম?

—এখানে জংলী গালা রাখা হয়, আমারই ঘরটা বটে।

ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে গেলুম ওঁর সঙ্গে। মিনিট পাঁচ-ছয় সোজা রাস্তায় গিয়ে তারপর একটা সরু পথ গিয়েচে বাঁ-দিকে। সে পথে গিয়ে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে বাঁ দিকের সেই যে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা, আমাদের সঙ্গে রাস্তার সমান্তরাল ভাবে অনেকদূর থেকে চলে আসচে, সেইটে পার হওয়া গেল। ঝরনাটা পার হয়ে আবার একটু উঁচুদিকে উঠে মাঠের রাস্তায় আরও মিনিট তিন চার হাঁটবার পর একখানা খোলার বাংলো ধরনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে এসে তিনি বললেন, আসুন, এই হলো গরিবের কুঁড়ে। বসুন এখানে। চা খান তো? বাড়িতে বলে আসি। আপনি বাঙালী, বড় আনন্দ হল, বাঙালীর মুখ কতদিন যে দেখিনি।

সত্যই ভদ্রলোককে মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়! বিদেশে না যে কখনো বার হয়েচে, সে বুঝবে না দূরদেশে একজন বাঙালীর দেখা পাওয়া কি আনন্দের ব্যাপার।

অল্পক্ষণ পরে ভদ্রলোক এসে বসলেন—চা-ও এল।

আমি বললুম—এখানে কতদিন আছেন?

—তা আজ সতেরো বছর, কি তার কিছু বেশি।

—কি উপলক্ষ্যে থাকা হয় এখানে?

—আমার একটা গালার কারখানা আছে, দেখাবো এখন। তাই নিয়ে পড়ে আছি—এই তো চাকুরির বাজার।

—না না, বেশ ভালো করেচেন। আপনি বাঙালী, এতদূর এসে গালার কারখানা খুলেচেন, এ খুব গৌরবের কথা। চলচে বেশ ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ, তা একরকম আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে; তবে কি জানেন, এতদিন যা হয় হয়েচে, মন আর এখন টেঁকে না।

—আপনার বাড়ির সব এখানেই বোধ হয়। তবে আর মন টেঁকাটেঁকি কি, সব নিয়েই যখন আছেন।

ভদ্রলোক তখনকার মতো চুপ করে গেলেন আমার মতে সায় দিয়ে, দুএকবার নিরুৎসাহ-সূচক ঘাড় নেড়ে। রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি বৃদ্ধা মাতা ছাড়া ভদ্রলোকের সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই, সম্ভবত আর একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকে, সে তখন পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল।

ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ও অগোছালো। বাড়ির পেছনে একটা সংকীর্ণ উঠান, তার মধ্যে কিসের একটা মাচা; উঠানটাতে বেজায় কাদা হয়েচে কদিনের বৃষ্টিতে। মাটির কলসীতে জল রাখা মাচাতলার নীচে। ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের নাম জেনেছিলাম; তিনি ব্রাহ্মণ, নদীয়া জেলায় বাড়ি একথাও জেনেচি। তাঁর বৃদ্ধা মাকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম।

খাওয়ার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা চালের ভাত, ডাল ও ঢেঁড়শের তরকারি, বড়ি ভাজা। এদেশে কোনো তরি-তরকারি বা মাছ বড় একটা মেলে না—ঢেঁড়শ ও টোমাটো ছাড়া। খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট। এসব কথা শুনলুম ভদ্রলোকের কাছেই।

খাওয়ার পরে যেতে উদ্যত হলুম, ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—কোথায় যাবেন? সেই খোলা গুদোমে? আপনি বেশ লোক তো! এখানে আপনাকে রাত্রে একটু জায়গা দিতে পারবো না বুঝি?

রাত্রে শোবার আগে ঁর অনেক কথাই বললেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের দু-বার স্ত্রীবিয়োগ হয়েচে—এই বয়সে সংসার শূন্য, একটি মাত্র আট বছরের ছেলে আছে। বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। নিজের বয়স হয়েচে পঁয়ত্রিশ মাত্র।

ভদ্রলোকের মন বুঝে বললুম—আপনার বিবাহ করা উচিত পুনরায়।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন—তা মশায় হয় কি করে। এখানে থেকে কোনো যোগাযোগ করা অসম্ভব।

—কেন ?

—সন্ধান পাই কোথা থেকে বলুন। বাঙালীর মুখই দেখিনে। সেই তো হয়েচে মুশকিল।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ভদ্রলোক বললেন—আপনি কতদিন এদেশে থাকবেন ?

—কত আর, দিন কুড়ি কি একমাস।

—ফিরে গিয়ে দয়া করে যদি একটি মেয়ের সন্ধান করে দেন তবে বড়ই···এই দেখুন বুড়ো মা একা সংসারের সব খাটুনি খাটেন, তারপর ছেলেটির যত্ন করা, তাও তেমন হয় না, সংসারের কতদিক একা দেখবো বলুন।

—বেশ, বেশ, আমি ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো—

—আমরা ভট্টাচাজ্যি, রাঢ়ী শ্রেণী। আগের বিয়ে কোথায় করেছিলুম সে ঠিকানাও আপনাকে দিচ্চি। যাঁরা মেয়ে দেবেন, তাঁরা সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন, বংশে কোনো খুঁত নেই আমাদের।

সকালে উঠে আমাকে তিনি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন। বড় বড় মাটির গামলায় বোধহয় গালা ভিজানো আছে, চামড়ার কারখানার মতো ভীষণ দুর্গন্ধ, আর ভারি অপরিষ্কার সমস্ত জায়গাটা। খুব বড় খোলার ঘর, লম্বা ধরনের। যে গুদামটাতে রাত্রে ছিলাম, ঠিক তেমনি ধরনের কুলি-ধাওড়ার মতো সেই ঘরটা।

বললুম—গালা কোথা থেকে কেনেন ?

—জংলী গালা গোঁড় মেয়েরা বিক্রী করতে আসে, তাই কিনি। এখানে আরও দুটো কারখানা আছে মাড়োয়ারীদের।

—কি রকম আয় হয় কারখানা থেকে, যদি কিছু মনে না করেন ?

—মনে করবো কেন বলুন। তা মাসে গড়ে শ-দেড়েক টাকা দাঁড়ায়, খরচ-খরচা সব পুষিয়ে। তবে আরও বাড়াতুম, কিন্তু কাজে মন লাগচে না মশাই।

নিতান্ত খারাপ আয় নয়, একজন বাঙালী ভদ্রলোক এতদূরে এসে স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্চেন মাড়োয়ারী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কেরানিগিরি না করে। এতে আনন্দ হবার কথা বটে। আমি তাঁকে বোঝালুম অনেক, নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি ব্যবসা যেন না ছাড়েন।

সকালে চা খেয়ে ওঁদের কাছে বিদায় নিলুম।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত এলেন। দু তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কলকাতায় ফিরে সব ভুলে যাবো না তো ? বিশেষ করে তাঁর বিষয়টা। আরও বললেন—যাবার সময় এই পথেই তো ফিরবেন, আমার সঙ্গে না দেখা করে যেন যাবেন না।

বললুম—নিশ্চয়ই, এ পথে ফিরবার সময় মায়ের হাতের রান্না না খেয়ে কি যাবো ভেবেচেন ?

—ওকথাটা তাহলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মনে রইল। বিশেষ চেষ্টা করবো জানবেন।

বস্তির পথের বাঁকে আমার ঘোড়া ও লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোক চোরামুখ বস্তির শেষপ্রান্তে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিছন ফিরে দু একবার রুমালও উড়িয়েচি।

ফিরবার সময় এপথে ফিরিনি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, দেশে ফিরে ভদ্রলোকের বিবাহের জন্য আমি দু-তিন জায়গায় মেয়ে সন্ধান করেছিলুম—আমার স্বগ্রামস্থ এক প্রতিবেশীর বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল, তাদের কাছেও কথা পেড়েছিলুম। ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়ে পত্র ব্যবহার করবার অনুরোধও করি।

কিন্তু যে ক-টি পাত্রীর সন্ধান করেছিলুম, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউই অত দূর বনে জঙ্গলের দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজি হননি।

আমার স্বগ্রামের পাত্রীটির বাপ একরকম রাজি হয়েছিলেন কারণ তাঁর অবস্থা তত ভালো ছিল না, কিন্তু মেয়ের মা ভয়ানক আপত্তি তোলেন।

আমায় ডাকিয়ে বললেন, অমন সীতা-নির্বাসনে কে মেয়ে দেবে বাপু? আমার মেয়ে তো ফেল্‌না নয়, সেখানে গিয়ে কথা বলবার লোক পাবে না, হাঁপিয়ে উঠবে।

যাক্ সে কথা। চোরামুখ ছাড়িয়ে বেলা দশটার সময় আমরা পৌছে গেলুম সালকোণ্ডা বলে একটা ছোট গাঁয়ে। রাস্তার ধারেই একটা চুনের ভাঁটি আছে, আশেপাশে অনেকগুলো বড় ছোট চুনের ভাঁটি। এখানে অনেকগুলি গোঁড় কুলি কাজ করে, তাদের জন্য বড় বড় কুলি ধাওড়া খান পাঁচ ছয় ভাঁটির আশেপাশে ছড়ানো। জায়গাটার দৃশ্য বেশ ভালো লাগলো আমার কাছে। চারিধারে বড় বড় শাল ও কেলা গাছ, মাঝে মাঝে ধাতুপ ফুলের ঝোপমতো গাছ—একদিকে তো ধাতুপ ফুলেরই বেড়া। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুকুর দেখা যাচ্চে কিছু দূরে। দূর ও নিকটে শৈলশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে স্থানটির চারিধার ঘিরেই শৈলমালা, মধ্যে যেন একটি বড় উপত্যকা।

এই অঞ্চলের সব বন পাহাড় ও গ্রাম 'ছত্তিশগড়ি' পরগনার মধ্যে পড়ে।

পূর্বে এই দিকের সব স্থান মারহাট্টা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখনও অনেক ছত্তিশগড়ি মারহাট্টা পরিবার এই সব গ্রামের অধিবাসী। তবে স্থানীয় আদিম অধিবাসী গোঁড়দের সংমিশ্রণে এদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক জায়গায় উভয় জাতির আচার ব্যবহার উভয়ের মধ্যে বিস্তৃতি-লাভ করেচে, বিশেষ করে এই সব দুর্গম বন্য-অঞ্চলে।

চুনের ভাঁটির গদিতে বসে কাজ করচেন জনৈক মারাঠী ভদ্রলোক। তাঁর চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথার মুরাঠা সবই আমার চোখে অদ্ভুত লাগলো। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি উঠে এলেন আমার কাছে। হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা থেকে আসচেন? আমি পরিচয় দিতে তিনি যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—আসুন, আমার গদিতে একটু বসুন।

গিয়ে বললুম তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনি যে বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়; সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা কিনা আমার চোখে অপরিচিত সাজপোশাক ও মুখের গড়নের জন্যে।

আমায় বললেন—আজ আমার ওখানে দয়া করে থাকতে হবে। আমার বন্ধু অনেক বাঙালী আছেন, আমি বাঙালীদের বড় ভালোবাসি। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের মূলে রয়েচে বাঙালী। এই সম্পর্কে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করলেন বারবার অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ছত্তিশগড়ির শৈলারণ্যবেষ্টিত ক্ষুদ্র এক গ্রামে এক চুনের ভাঁটিতে বসে আমার মাতৃভূমির দুজন সুসন্তানের নাম উচ্চারিত হতে শুনে গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠলো।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক, রংড়ে ব্রাহ্মণ, বাড়ি খাণ্ডোয়া নাগপুরের ওদিকে। এখানে এই চুনাপাথরের খনি ইজারা নিয়ে ভাঁটিতে চুন পুড়িয়ে মোটর লরি করে এগারো ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে চালান দেন। আমি যে পথে এসেচি, ও পথে বা স্টেশনে নয়, কারণ ওটা মোটর গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নয়।

বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও একটি দশবৎসরের ছেলে থাকে বাসায়। সকলেই আমার সামনে বার হলেন বটে, মেয়েরা কিন্তু কথা কেউই বললেন না।

গৃহস্বামী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি স্নান করুন। জল তুলে দেবে, না পুকুরে নাইবেন?

—পুকুরের জল ভালো?

—খুব ভালো, এমন জল কোথাও দেখবেন না।

সত্যিই শালবনের মধ্যে পুকুরটিতে স্নান করে খুব আরাম হল। আজ মেঘ মোটেই নেই আকাশে, বেশ রৌদ্র চড়েচে, এতখানি ঘোড়ায় চড়ে এসে গরম বোধ হচ্ছিল দস্তুরমত। তা ছাড়া, চালবিহীন ঘোড়ায় চড়ার দরুন পেটে খিল ধরে গিয়েচে।

বালকৃষ্ণজী বললেন—আমরা কিন্তু মাছমাংস খাইনে বাবুজী—আপনার বড় অসুবিধে হবে খেতে।

আমি শশব্যস্ত হয়ে বললুম—কি যে বলেন! তাতে হয়েচে কি? আমি মাছমাংসের ভক্ত নই তত।

খাবার জিনিস অতি পরিপাটী। 'তুপ' অর্থাৎ ঘিয়ে ডোবানো মোটা আটার রুটি, কুমড়োর ছোঁকা, পাঁপর, ছোলার ডাল, চাটনি ও মহিষের দুধের দই। বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক একা আহার করলেন আমার মতো সাত জনের সমান। সেই মোটা রুটি আমি চারখানার বেশি ওঁদের অত্যন্ত অনুরোধ সত্ত্বেও খেতে পারলুম না, উনি খেলেন কম্‌সে কম ষোলখানি। সেই অনুপাতে ডাল-তরকারি ও দইও টানলেন।

আহারাদির পর তাঁকে বললুম—এদেশে অন্ন কি ব্যবসা সুবিধে?

—আপনি যেখানে যাচ্ছেন, ওদিকে জঙ্গল বেশি, অনেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ বিক্রি করে।

—কোনো বাঙালীকে ব্যবসা করতে দেখেছেন এদিকে ?

—একজন আছেন তাঁর নাম আমি জানিনে, অমর-কণ্টকের কাছে অনেক বন তিনি ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দিতেন জানি।

বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমার ভালো লাগে না। অর্থের জন্যে প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্যভূমি বিনষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু অরণ্য সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে ?

এখান থেকে দারকেশা মাত্র দশ মাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে পৌছনো যাবে। আমি আমার সঙ্গীদের বললুম, কার্গিরোড থেকে মোটে বত্রিশ মাইল শুনেছিলুম দারকেশা, এ তো তার অনেক বেশি হয়ে গেল—

ওরা বললে—বাবু, চল্লিশ মাইলের ওপর ছাড়া কম হবে না, তবুও আপনাকে আমরা খানিকটা সোজা পথ দিয়ে এনেচি। আসল পথটা ঘুরানো, কিন্তু এর চেয়ে ভালো।

সালকোণ্ডা চুনের ভাঁটি ছাড়িয়ে জমি ক্রমশ নীচু হয়ে গেল। যখনই এমন হয় তখনই আমি জানি এবার নিশ্চয়ই কোনো নদী আছে সামনে। হলও তাই, একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পড়লো সামনে, তার নামও সালকোণ্ডা। নদীর ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে পুল তৈরি করা, তার ওপর দিয়ে ঘোড়া যাবে না, অথচ নদীর বেগ দেখে মনে হল, না জানি গভীরতাই বা কতটা!

ঘোড়া নামিয়ে দিলুম। দেখি ক্রমশ জল বাড়চে, ক্রমে আমার এমন অবস্থা হল রেকাব থেকে পা তুলে পা দুখানা মুড়ে জিনের দুপাশে নিয়ে এলুম, তখনও জল বাড়চে। পার্বত্য নদীতে বৃষ্টি নামলেই আর দেখতে হবে না কোথা থেকে যে জল বাড়বে! জিনে পর্যন্ত জল ঠেকিয়ে তখন ঘোড়া দেখি আর একটু উঁচু জায়গায় পা পেলে। ডাঙায় উঠে এমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো বুনো ঘোড়াটা যে, আমারসুদ্ধ, জিনসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল আর কি। যে ঘোড়ার চাল থাকে না, সে ঘোড়ার আদব-কায়দা কখনই সুমার্জিত ও ভদ্রতাসঙ্গত হয় না, এ আমি বহুদিন থেকে দেখে আসচি।

এই দশ মাইলের শোভা কিছুই নেই, তবে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উঁচুনীচু মরুম-কাঁকরের ডাঙার যদি কারোর কাছে মূল্য থাকে, সে হিসেবে এ অঞ্চলের তুলনা নেই।

শুধু Space যাদের ভালো লাগে, জনহীন মুক্ত Space, তাদের কাছে এমন স্থান হঠাৎ কোথাও মিলবে না। পৃথিবীর মুক্ত-রূপের মহনীয় সৌন্দর্যে এ স্থান সত্যিই অতুলনীয়।

তবে অনেকে এর মধ্যে গাছপালা হয়তো দেখতে চায়, হয়তো ভাবে, এতটা ফাঁকা কেন রে বাপু, মাঝে মাঝে দু-দশটা শালঝোপ থাকলে এমন বা কি মন্দ হত!

কিংবা যদি থাকতো মাঝে মাঝে শিমুল গাছ বা রক্তপলাশ, তবে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ফুল ফুটলে এই অঞ্চল হয়ে উঠতো মায়াময় পরীরাজ্য।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেলা প্রায় পড়ে গেল। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। সেই সময় অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ আমি ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

বহু দূরে, পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের অনেকটা জুড়ে কালো বনরেখা দেখা দিয়েচে। রেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, তখন বেলা নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো। আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলুম, ওই কি দারকেশা ?

ওরা বললে, বন আরও অনেক দূরে, দারকেশা আর বেশি দূর নেই।

একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে অনেকগুলো ঘরবাড়ি দেখা গেল, এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। ওরা বললে—ওই দারকেশা।

আমার বন্ধুটি এখানে কণ্ট্রাক্‌টারি করেন। দু পয়সা হাতে যে না করেচেন এমন নয়! অনেক দিন পরে একজন বাঙালী বন্ধু পেয়ে তিনি খুব খুশী।

আমি রোজ সকালে উঠে বনের দিকে বেড়াতে যাই, কখনো ফিরি দুপুরে, কোনদিন সন্ধ্যাবেলা। বন্ধু বললেন—বনে যখন তখন অমন যেও না—বড্ড জন্তু-জানোয়ারের ভয়।

—কি জন্তু ?

—ভাল্লুক তো আছেই, বাঘ আছে, বুনো কুকুর আছে।

দারকেশা একটি ছোট বস্তি।

এর পশ্চিম দিকে চক্রবাল জুড়ে অরণ্যরেখা ও শৈলশ্রেণী। গ্রাম থেকে বনের দূরত্ব দু মাইলের বেশী নয় কিন্তু বন এখানে কোণাকুণি ভাবে বিস্তৃত, উত্তরপশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের দিকে চলে গেল লম্বা টানা বনরেখা ; যে জায়গাটা খুব নিকটে এসে পড়েচে, সেইটিই দু মাইল।

বনের মধ্যে ছোট বড় চুনাপাথরের টিলা ও অনুচ্চ শিলাশৃঙ্গ। এই বন তেমন নিবিড় নয়। এক ধরনের শুভ্রকাণ্ড, বনস্পতিজাতীয় বৃক্ষ এই বনে আমি প্রথম দেখি। এর গুঁড়ি ও ডালপালা দেখলে মনে হবে কে যেন গাছের গায়ে পঙ্খের কাজ করেচে, চক্‌চকে সাদা। গুঁড়ির গায়ে হাত দিলে হাতে খড়ির গুঁড়োর মতো এক প্রকার সাদা গুঁড়ো লেগে যায়, মুখে মাখলে পাউডারের কাজ করে। এই গাছের নাম রেখেছিলুম শিব গাছ।

দারকেশা একটা উঁচু পাথুরে-ডাঙার ওপর, তিনদিক থেকে ডাঙাটা নীচু হয়ে সমতল জমির সঙ্গে মিশেচে, ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরনা ডাঙার নীচে বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝির করে, ঝরনার দুধারে ছোট ছোট গাছ ও এক প্রকারের লতার ফুল।

এখানে ছত্রিশগড়ি রাজপুত অধিবাসীদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী আছে, সে আমার বন্ধুর অধীনে কাঠ যোগানোর কাজ করেছিল অনেকদিন।

লোকটার নাম মাধোলাল। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় বসে বসে তাদের দেশ সম্বন্ধে গল্প করতুম।

মাধোলাল একদিন আমায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে। খাওয়ালে মোটা মোটা যবের আটার রুটি, উচ্ছে ভাজা ও লঙ্কার আচার। এদেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ খাওয়ানো উচিত বলে আদৌ ভাবে না, যা হয় খাওয়ালেই হল।

মাধোলালের বাড়ি খেয়ে আমার পেট ভরলো না। রুটি দিয়ে উচ্ছে ভাজা কখনো খাইনি, সুখাদ্যের তালিকার মধ্যে অন্তত আমি এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের নাম করতে পারিনে। শেষকালে এল যে জিনিসটা, তাকে আমি নাম দিয়েচি গমের পায়েস।

কাঁচা গমের ছাতুর সঙ্গে দুধ আর ভেলিগুড় গুলে এই জিনিসটি তৈরী, তার সঙ্গে মেথি বাটা ও হিং মিশানো, বাঙালীর মুখে অখাদ্য।

খাওয়ার পরে মাধোলাল আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে।

—বাবুজি, আপনি এদেশে বাস করুন।

—কেন মাধোলালজি?

—আপনাকে বড় ভালো লাগে। এদেশে বিয়ে করুন না?

—বলো কি মাধোলালজি। আমাদের সঙ্গে গোঁড়া ছত্রিশগড়ি সমাজের কে মেয়ের বিয়ে দেবে?

—বাবুসাহেব, বলেন তো যোগাড় করি। কেন দেবে না?

—আছে নাকি সন্ধানে?

—আপনি বললেই সন্ধান করি। আছেও।

—এই গাঁয়েই নাকি?

—হ্যাঁ বাবুজি। ব্রাহ্মণের মেয়ে, দেখতে বেশ সুন্দরী।

—গোঁড় সমাজের?

—না বাবু, গোঁড়দের জঙ্গে মিশনে পালিতা মেয়ে। ইংরিজি লেখাপড়া, সূচের কাজ, রান্না—সব জানে।

মনে মনে মাধোলালজের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। মিশনে পালিতা মেয়ে ছত্রিশগড়ি সমাজের কেউ বিয়ে করবে না জেনে শুনে। তবে বাঙালী বাবুদের জাতও নেই, সমাজও নেই, দাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে।

আমার বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম মাধোলাল একজন সমাজসংস্কারক। মেয়েটিকে সে এনে নিজের বাড়িতেই রেখে দিয়েচে আজ চার-পাঁচ বছর, তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়া মাধোলালের একটা সাধ।

মাধোলাল দু তিন-দিন পরে আমায় আর একদিন রাস্তায় পাকড়ালে।

—বাবুজি, আমার সেই কথার কি হল?

—সে হবে না মাধোলালজি।

—কেন বাবুজি, মেয়ে আপনি দেখুন কেমন, তারপর না হয়—

—না মাধোলালজি, মিশনের মেয়ে আমাদের সমাজে চলবে না। আমাদেরও তো সমাজ আছে, না নেই ?

—বাবুজি আপনি না করেন, ওর একটি ভালো পাত্র তবে যোগাড় করে দেবেন ?

—আমি কথা দিতে পারিনে মাধোলালজি, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দারকেশা থেকে এগারো মাইল দূরবর্তী গভর্ণমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট একদিন দেখতে গেলুম। সেদিন সঙ্গে কেউই ছিল না—আমি ঘোড়া করে বেলা দশটার সময় বার হয়ে বেলা একটার সময় একেবারে পথহীন বিজন বনের মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

বড় বড় গাছ, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি—নীচে কোথাও যেন মাটি নেই, শুধুই সাদা পাথরের নুড়ি ছড়ানো—মাঝে মাঝে ঝরনা। এ বনেও অনেক বুদ্ধ-নারিকেলের গাছ দেখা গেল। ঝরনার ধারে ঘন জঙ্গল, অন্যত্র বন এত ঘন নয়। এই বনে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ফুলের (Lantana Camera) ভিড়, বিশেষ করে ঝরনার ধারে। এই সুদৃশ্য ফুল এখানে ফুটেচে খুব বেশি ও নানা রঙের।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বাঘ শিকারের মাচান বাঁধা। দেখে মনে হল কিছুদিন আগে এখানে কেউ শিকার করতে এসেছিল। এই বন যে হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত, তা মনে পড়লো এই মাচান দেখে—আরও গভীরতর অরণ্যে অবেলায় প্রবেশ করা সমীচীন হবে না ভেবে ঘোড়ার মুখ গ্রামের দিকে ফেরালুম।

পথে একজন খাকী পোশাক পরা কালো লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি গবর্নমেন্টের অরণ্যবিভাগের জনৈক কর্মচারী। আমায় দেখে বললে—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

আমি বললুম, বনে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

লোকটি বললে—অন্যায় করেচেন, একা যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। বনে বাঘের ভয় আছে, এ সব অঞ্চলের বাঘ বড় খারাপ। একটা মানুষ-খেকো বাঘও বেরিয়েচে বলে জানি।

সামনে আসচে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত্রি। আমার প্রবল আগ্রহ ছিল অমন জ্যোৎস্নারাত্রিটি বনের মধ্যে কোথাও যাপন করা। অনেক বক্তৃতা দিয়েও একজন লোককেও যোগাড় করা গেল না যে আমার সঙ্গী হতে পারে, কারণ মানুষ-খেকো বাঘের কথা কানে শুনে সেখানে একা যেতে চাইবো এমন সাহস আমার ছিল না।

অবশেষে দারকেশার পূর্বপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর সে রাত্রে খানিকক্ষণ বসে থেকে আমার সাধ খানিকটা মিটলো। আমার সঙ্গে গ্রামের দু-তিন জন লোকের মধ্যে মাধোলালও ছিল।

মাধোলাল এই অরণ্য-অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানে। আমায় বললে, বাবুসাহেব, আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।

—কেন মাধোজি ?

—মন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় সব চাপা।

—বনের মধ্যে গিয়েচ রাত্রে ?

—অনেকবার বাবুজি। আমার এক বন্ধু ভালো শিকারী ছিল, সে বনে মাচান বাঁধলে, বাঘ শিকার করবার জন্যে। অনেকদিন আগের কথা।

—তারপর ?

—আমি বললুম আমায় সঙ্গে নাও। সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, তারপর রাজি হল একটা শর্তে। বললে—মাচানে তোমায় বেঁধে রাখা হবে। আমি তো অবাক, বেঁধে রাখা হবে কেন ? সে বললে, যখন বাঘ আসবে, তখন তুমি এমন লাফ-ঝাঁপ মারবে ভয়ে যে মাচান থেকে পড়ে যেতে পারো—হয়তো আমারও বিপদগ্রস্ত করতে পারো। আমি রাগ করলুম বটে মনে মনে, কিন্তু রাজি হয়ে গেলুম।

—বেঁধে রাখলে নাকি ?

—মাচানের খুঁটি আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখলে। পরে বুঝেছিলুম এই বেঁধে রাখবার জন্তই সেদিন আমার আর আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। রাত বেশি হল, মাচার ওপর আমরা মাত্র দুজন। এই যে বন দেখচেন, এই বনেরই ব্যাপার। তবে তখন আরও ঘন ছিল, এখন ইজারাদারেরা কেটে কেটে অনেক সাবাড় করে দিয়েচে। অনেক রাত্রে বাঘ এল—প্রকাণ্ড ম্যান-ঈটার। আমার বন্ধু বললে—গুলি করো। আমি জীবনে তখন বন-মুরগী ছাড়া কোনো বড় জন্তু মারিনি—আর বুনো বাঘ কখনো দেখিওনি। তার গর্জন শুনে আর চেহারা দেখে আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। বন্দুক হাত থেকে পড়ে যায় আর কি। তারপর সেই বাঘ যখন আমার বন্ধুর গুলি খেয়ে লাফ মেরে ভীষণ হাঁক দিয়ে দিয়ে সামনে উঠতে গেল—আমি মাচানের পেছন দিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম।

আমার তখন জ্ঞান নেই, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েচে ভয়ে। দু-দুবার বাঘ লাফ মারলে দু সেকেণ্ডের মধ্যে দুবার, আমি পেছন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম সেই দুই সেকেণ্ডের মধ্যে। পারলুম না শুধু গাছের সঙ্গে বাঁধা আছি বলে। তখন বন্ধু বললে, যদি তোমায় না বাঁধতুম, বুঝেচ এখন কি হত ?

—বাঘ মারা পড়লো শেষ পর্যন্ত ?

—নাঃ, সে রাত্রে সেটা পালালো। পরদিন সকালে এক মাইল দূরে এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে বসে আছে, তখন আবার গুলি করা হল। বাঘ চার্জ করলে—তখন দুই ভুরুর মাঝখানে আর এক গুলি। ওই হচ্চে আসল জায়গা, যতক্ষণ ওখানে গুলি না লাগচে, ততক্ষণ বাঘ বা কোনো জন্তু কাবু হবে না। অন্য যে কোনো জায়গায় গুলি লাগলে, বাঘ জখম হতে পারে বটে, মরবে না।

আমি জানতুম মাধোলাল বড় শিকারী না হলেও ইদানীং জানোয়ার মেরেচে অনেক। আমার বন্ধুর মুখেই ওর শিকারের অনেক গল্প শুনেচি।

বললুম—আচ্ছা মাধোলালজি, অনেক বনে তো বেড়িয়েচ, কখনো কোনও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ার, যার কথা কেউ জানে না—এমন কিছু দেখেচ ?

আমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এই বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তে বসে মনে একটু রহস্য ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসা। জীবনকে উপভোগ করবার একটা দিক হচ্ছে, যে-সময়ে যে-রসের বা অনুভূতির আবির্ভাব প্রীতিকর—সে সময়ে সেটি মনে আনবার চেষ্টা করতে হবে। দূরে বনরেখা জ্যোৎস্নার আলোয় অস্পষ্ট দেখালেও টানা, সোজা, কোণাকুণি রেখাটি টেঁরা ভাবে দূরদিগন্তে যে কোন্ মায়ালোকের সীমা নির্দেশ করচে, আকাশচ্যুত জ্যোৎস্না-রাত্রির দল যেন ওই বনের অন্তরালে দল পাকিয়ে থাকে—আরও কত অজানা সৌন্দর্য, অজানা ভয়, অজানা বিপদের দেশ ওটা।

আমার সামনে বড় একটা শিলাখণ্ড, তার গা ঘেঁষে একটা বাঁকা গাছ। গাছটার বড় বড় পাতা, অনেকটা পেঁপে পাতার মত, পাথরখানার ওপর অনেকগুলো শুকনো পাতা ঝরেও পড়েচে—তার মধ্যে খড় খড় শব্দ করে এদেশী বড় বহুরূপী যাতায়াত করচে।

মাধোলাল আমার কথার উত্তরে বললে—না বাবুজি, তা কখনো দেখিনি।

—দেখ ভেবে। তোমার দেখে আশ্চর্য মনে হয়েছিল, এমন কিছু ?

আমি ওকে ছাড়চিনে, ও না বললে কি হবে ? এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে ওর মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের গল্প না শুনলেই চলবে না আমার।

কিন্তু মাধোলাল অনেক আকাশপাতাল ভেবেও কিছু বার করতে পারলে না। অদ্ভুত জানোয়ার কিছু দেখেনি,- তবে বাঘ তারপর দু-চারটে মেরেচে, ভালুক, শূয়োরও—আর হরিণের তো কথাই নেই।

বললুম—তবে মাধোলাল, আমার একটা আশ্চর্য গল্প শুনবে ?

মাধোলাল উৎসাহের সঙ্গে বললে—নিশ্চয়ই, বলুন।

বানিয়ে বানিয়ে ওকে একটা খুব বড় ও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারের গল্প করলুম—আরাকান ইয়োমোর জঙ্গলে দেখেছিলুম। মাধোলাল বিশ্বাস করলে। আমার উদ্দেশ্য খানিকটা ভয় ও রহস্যের সৃষ্টি করা, এই অরণ্য-প্রান্তের এমন অপূর্ব পূর্ণিমারাত্রিকে আরও নিবিড় ভাবে পাবার জন্যে।

শীত করতে লাগলো। তখন রাত বারোটার কম নয়।

আমি ওকে বললুম—এ বন খুব বড়।

—রেওয়া স্টেট পর্যন্ত চলে গিয়েচে—বেশি নয়, মাইল বাইশ-তেইশ এখান থেকে। ওদিকে অমর-কণ্টক পর্যন্ত চলেচে। খুব বড় বন।

—বেশ দেখবার জায়গা—না ? সিনারি ভালো ?

—সিনারি আপনারা কাকে বলেন বুঝি না। তবে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না, এখানেই থাকি মনে হয়। একটা জায়গার কথা বলি। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই বনের একটা পাহাড়ের নাম ঘোড়াঘাটির পাহাড়। দেখতে চান তো একদিন নিয়ে যাবো। সাদা পাথরের পাহাড়টা, অনেকটা উঁচু, বড্ড কাঁটাগাছের জঙ্গল, আর পাথরের ফাটলে পাহাড়ী মৌমাছির চাক। গ্রামের লোকেরা ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে

মধু সংগ্রহ করতে যায় চৈত্র মাসে। সে সময় একরকম সাদা ফুল ফোটে, খুব বড় বড়, ভারি সুগন্ধ। ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে ওই ফুলের গাছ অনেক। বেশ বড় গাছ। আপনি গিয়ে দেখবেন, যাকে আপনারা সিনারি বলেন, তা আছে কি না।

—এখান থেকে কতদূর হবে ?

—তা তেরো-চোদ্দ মাইল হবে। ঘোড়াঘাটি পাহাড়ের গায়ে দুটো গুহা আছে, একটার মধ্যে একজন সাধু থাকতেন—আজ প্রায় পনেরো বছর ছিলেন। এখন কোথায় চলে গিয়েচেন। আর একটা গুহায় ঢোকা যায় না, মুখটা কাঁটাজঙ্গলে বুজোনো। যাবেন একদিন ?

যাবার যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও আমার সেখানে যাওয়া হয়নি।

এর দুদিন পরে আমি এখান থেকে রওনা হই পদব্রজে। বনের মধ্যে দিয়ে উনিশ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে তবে রেওয়া স্টেটের প্রান্তে শালগড়িসাস্তারা ডাকবাংলো। বনের বিচিত্র শোভা এই উনিশ মাইল পায়ে হেঁটে না গেলে কিছু বোঝা যেতো না।

আসল ভারতবর্ষের রূপ যেন দেখচি, প্রাচীন ভারতবর্ষ। আর্যাবর্তের বিশাল সমতলভূমি নয়, যা নাকি গঙ্গা ও যমুনার পলি-মাটিতে সেদিন তৈরী হল—কালকের কথা।

এ ভারতবর্ষ যখন হয়েচে তখন হিমালয় পর্বত গজায়নি, বহু প্রাচীন যুগ-যুগান্তের পূর্বের বৃদ্ধতম ভারতবর্ষ এ ; এর অরণ্য এক সময় বৈদিক আর্যগণের বিস্ময়, রহস্য ও ভীতির বস্তু ছিল; প্রথম ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে কঙ্গো ও ইউগাণ্ডার আগ্নেয় গিরিশ্রেণী ও ঘনারণ্য যেমন ছিল, ঠিক তেমনটি।

বনের অদ্ভুত রূপ দেখতে হয় যদি তবে পদব্রজে এ পথে অমরকণ্টক পর্যন্ত যাওয়া উচিত। তবে হিমারণ্যের মতো বিচিত্র বনপুষ্পশোভা এ বনে নেই, মধ্যপ্রদেশের বনভূমির রূপ অন্য ধরনের, একটু বেশি রুক্ষ ও অনাড়ম্বর।

বনপুষ্প ও ফার্ন পাওয়া যায় যেখানে আছে বড় বড় পাহাড়ী ঝরনা, তার ধারে বড় বড় আর্দ্র শিলাখণ্ডের গায়ে কত কি ছোট ছোট লতা ও চারাগাছে রঙীন ফুল ফুটে আছে বটে কিন্তু বাইরের বনে এ সময়ে কোনো ফুল দেখিনি, কেবল বন্য শেফালি ছাড়া।

এ বনে বন্য শেফালি গাছ অজস্র। পথের ধারে যা পড়ে, তাতেই আমার মনে হয়েচে এই গাছের সংখ্যা এ অঞ্চলে যথেষ্ট। তবুও আমি গভীর বনের মধ্যে যাইনি, আমার সঙ্গে চার-পাঁচজন অমর-কণ্টকের যাত্রী ছিল, তারাও আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যের অভ্যন্তরপ্রদেশে ঢুকতে দেয়নি।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। গ্রামে ছোট মুদীর দোকান, সেখানে সিজার সিগারেট পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় আটা, ডাল, তেলিগুড়, নুন, মোটা চাল। বিভিন্ন মিশন সোসাইটি এইসব বন্য-পল্লীতে স্কুল বসিয়ে গোঁড়দের শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করচে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কোনো কোনো গ্রামে নিতান্ত কম নয়।

দুপুরে নিভৃত কোনো ঝরনার ধার খুঁজে নিয়ে গাছের নিবিড় ছায়ায় আমরা রান্না চড়াতুম। আমাদের দলের পাচক ছিল মান্দারু বলে একটি ছোকরা। সে মাধোলালের

বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছিল ছেলেবেলা, এখন কাঠের মিস্ত্রির কাজ করে। যদিও সে এক-জন দস্তুরমত ভবঘুরে, কোথাও বেশিদিন থাকা তার ধাতে নাকি একেবারেই সয় না।

আমি বলতুম—আজ কি রান্না হবে মান্দারু ?

—আটা আর দাল।

—আর কি রাঁধতে জানো ?

—আর আলুর চোখা।

দুবেলা এই একই রান্না, নতুনত্ব নেই। আটার হাতে-গড়া রুটি, অড়রের ডাল আর আলুর চোখা। এমন বিচিত্র রান্না জীবনে কখনো খাইনি। এমন ঘোর আনাড়ি ও প্রতিভা-বিহীন রাঁধুনিও সহজে খুঁজে মিলবে না। এতদিন হাতে-কলমে রান্নার কাজ করা সত্ত্বেও মান্দারু এতটুকু উন্নতি করতে পারেনি ও কাজে, কোনদিন পারবেও না।

বনের মধ্যে যে-কটি অদ্ভুত দিন কেটেছিল, তার কথা জীবনে কখনো ভুলব না। মধ্য-প্রদেশের এইসব বনে যথেষ্ট হিংস্রজন্তুর বাস বটে—কিন্তু আমরা কোনোদিন কিছু দেখিনি। আমার একজন সঙ্গী একরাত্রে বললে, সে নাকি বাইসন দেখেচে—কিন্তু তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি।

প্রথমে তো, বাইসন মাদ্রাজ অঞ্চলে ছাড়া ভারতের অন্য কোনো বনে দেখা যায় না। মধ্যপ্রদেশে 'গৌর' বা 'গায়ের' বলে যে মহিষজাতীয় জন্তু আছে তাকে অনেকে 'ইণ্ডিয়ান বাইসন' বলেন বটে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বনে 'গৌর' প্রায় নির্বংশ হয়ে এসেচে। শিকারীরা বন-বাদাড় ঠেঙিয়েও তার সন্ধান পান খুবই কম। দ্বিতীয় কথা, এই বন্যজন্তু অত্যন্ত হুঁশিয়ার, মানুষের সাড়াশব্দ তারা অনেক দূর থেকে পায় এবং সে জায়গার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

তবে শেয়াল প্রায়ই যেতো—আর দেখতুম ময়ূর; প্রায়ই ময়ূর ডাল থেকে উড়ে বসত পথের ওপর। ময়ূর ছাড়া আরও অনেক পাখী ছিল সে বনে; দুপুরে যখন গাছতলায় একটু বিশ্রাম করতুম, তখন বিহঙ্গ-কাকলী আমাদের পথশ্রান্তি দূর করতো।

এই রকম বেড়াবার একটা নেশা আছে—বড় ভয়ানক নেশা সেটি। তা মানুষকে ঘরছাড়া করে ভবঘুরে বানিয়ে দেয়। আমরা যে ক-জন বনের পথে চলেচি, সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলুম সেই অদ্ভুত ও তীব্র আনন্দ, শুধু মুক্ত জীবনেই যার দেখা মেলে।

আমরা সাধারণত রাত্রে কোনো একটা গ্রামে আশ্রয় নিতুম, সকাল হলে হাঁটা শুরু করে দুপুরের মধ্যে দশ-বারো মাইল কি পনেরো মাইল পার হয়ে যেতুম। এই সকালের হাঁটাই হল আসল। বিকেলে বেশিদূর যেতে না যেতে বনের মধ্যে ক্রমশ ঘন ছায়া নেমে অন্ধকার হয়ে আসতো, তখন কোথাও আশ্রয় না নিলে চলতো না।

দুপুরে অনেকখানি পথ হেঁটে একটা সুন্দর জায়গা আমরা বেছে নিতুম যেখানে বড় বড় গাছের ছায়া, ঝরনার জল কাছে, বসবার উপযুক্ত শিলাখণ্ড পাতা, পাখীর কাকলীতে বনভূমি মুখর। তারপর মান্দারু জায়গাটা ডালপালা ভেঙে পরিষ্কার করতো, আমরা কম্বল পেতে

ফেলতুম তিন চারখানা—কখনো বা জোড়া দিয়ে, কখনো আলাদা আলাদা। কতরকমের গল্প হত, চা চড়তো, আমরা চা খেয়ে খুব খানিকটা বিশ্রাম করে ঝরনায় জলে নেমে আসতুম—এদিকে মান্দারু রান্না চড়িয়েচে, আরও কিছুক্ষণ বসবার পরে মান্দারু শালপাতায় আমাদের ভোজ্য পরিবেশন করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক সবাই ঘুমিয়ে নিতো, তারপর আবার উদ্যোগ করে তাঁবু উঠিয়ে সবাই মিলে রওনা হওয়া যেতো।

কোন উদ্বেগ নেই, চিন্তা নেই মনে—দূর কোনো বৃক্ষচূড়ায় ময়ূরের ডাক, বনের ডালপালায় বাতাসের মর্মর শব্দ, ঝরনার কলতান, প্রচুর অবকাশ ও আনন্দ, এ যেন আমরা আবার আমাদের প্রাচীন অরণ্য জীবনে ফিরে গিয়েচি। বিংশ শতাব্দীর কর্মবহুল দিনগুলি থেকে পিছু হেঁটে দায়িত্বহীন মুক্তজীবনের আনন্দে আমাদের মন ভরপুর। তা ছাড়া, এই বিরাট বনপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যও আমাদের সকলের মনে কেমন একটা নেশা জাগিয়ে তুলেচে।

আমাদের মধ্যে একজন বললে, তার কোনো এক বন্ধু আলমোড়া থেকে পায়ে হেঁটে হিমারণ্যের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে ওই পথে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাবার জন্যে বেরিয়েছিল, সে আর ফিরে এল না। এখন ওইখানে কোনো জায়গায় থাকে, সাধুসন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে। হিমালয়ের নেশা তাকে ঘরছাড়া করেচে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি ক্ষুদ্র গোঁড় বস্তিতে পৌঁছলুম। আমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর নেই সেখানে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, তাদেরই জায়গা কুলোয় না। অবশেষে একটা গোয়াল ঘরে আমাদের জায়গা করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বস্তির লোকজন আমাদের ঘিরে গল্প-গুজব করতে এল।

একজন বললে—তোরা ভালুকের ছানা কিনবি ?

আমরা দেখতে চাইলুম। তারা দুটি ছোট লোম-ঝাঁকড়া বিলিতি কুকুরের ছানার মতো জীব নিয়ে এল। মাত্র দুমাস করে তাদের বয়েস, এই বয়সেই বড় কুকুরের মতো গায়ে শক্তি। ওরা বললে, একটা বাঘের বাচ্চাও ছিল, কিছুদিন আগে ডোঙরগড় থেকে এক সাহেব শিকারী এসেছিল, তার কাছে ওরা সেটা বিক্রী করেচে।

আমরা ভালুকের ছানা কিনিনি, বনের মধ্যে কোথায় কি খাওয়াবো, দলের অনেকেই আপত্তি করলে।

বস্তিটাতে ঘর-দশেক লোক বাস করে। আমরা বললুম—তোমরা জিনিসপত্র কেনো কোথা থেকে ?

ওরা বললে—এখানে আমরা ভুট্টা আর দেধানার চাষ করি। নুন কিনে আনি শুধু অমর-কণ্টকের বাজার থেকে। তীরধনুক আছে, পাখী আর হরিণ শিকার করি। অমর-কণ্টকের মেলার সময় হরিণের চামড়া, ভালুকের ছানা, পাখীর পালক ইত্যাদি বিক্রী করি যাত্রীদের কাছে। তা থেকে কাপড় কিনে আনি।

বেশ সহজ ও সরল জীবনযাত্রা। তবে এরা বড় অলস। জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর সরলতাই এদের অলস ও শ্রমবিমুখ করে তুলেচে। পয়সা দিতে চাইলেও কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এরা

সহজে করতে রাজী হয় না। পয়সা রোজগার করবার বিশেষ ঝোঁক নেই। বিনা আয়াসে যদি আসে তো ভালো, নতুবা কষ্ট করে কে আবার পয়সা উপার্জন করতে যায়! সবগুলি বন্ত গ্রামেই প্রায় এই অবস্থা।

কতবার বলে দেখেছি—একবোঝা কাঠ ভেঙে এনে দে না, পয়সা দেবো।

ওরা সোজা জবাব দিয়ে বসে—আমাদের দিয়ে হবে না বাবু, আমরা পারবো না।

—পয়সা পাবি, দে না।

—কি হবে পয়সা বাবু! পারবো না আমরা।

অথচ পয়সা-কড়ি বিষয়ে এরা যে উদাসীন ও সরল, তা আদৌ নয়। সুবিধা পেলে বিদেশীকে ফাঁকি দিতে বা ঠকিয়ে জিনিস বিক্রী করতে ওস্তাদ। আসল কথা, খেটে পয়সা রোজগার করা ওদের ধাতে সয় না।

বেলা আটটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে কানে শালপাতার পিকা বা বিড়ি গুঁজে, নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ের ধারে সারাদিন বসে হয়তো মাছ ধরছে। মেয়েরা বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে এল, লোকটি চুপ করে ঠায় জলের ধারে অর্জুন গাছের ছায়ায় বসেই আছে। এক জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকতেও পারে। দারকেশাতে এ দৃশ্য কতবার দেখেছি।

আর একটা জিনিস, এদের সময়ের জ্ঞান নেই অনেকেরই।

—বয়স কত?

—কি জানি বাবু।

—তবুও আন্দাজ?

—বিশ পঁচাশ হবে।

হয়তো উত্তরদাতার বয়েস ষাট পেরিয়েচে, তবুও তার কাছে বিশও যা পঞ্চাশও তাই। কতদিন আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল তার সঠিক ধারণা এদের একেবারেই থাকে না, অনেককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। সময়ের মাপজোপ সভ্যসমাজেই প্রয়োজন, সভ্যতার সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদের সময়-সমুদ্রের ঊর্মিমালা গণনার প্রয়োজন কি।

আমরা দামুত্তি বলে একটা গ্রামে পৌঁছে দুদিন বিশ্রাম করলুম। এখান থেকে রেলওয়ে স্টেশন মাত্র ন-মাইল। অমর-কণ্টকের যাত্রীরা এখান থেকে হেঁটে অমর-কণ্টক চলে যাবে, আমি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠবো। দামুত্তি পৌঁছবার পূর্বে আমরা যে গ্রাম থেকে রওনা হই, তার অধিবাসীরা আমাদের বারণ করেছিল—বাবুসাহেব, ওপথে যাবেন না, বড় বাঘের ভয়, তিন-চারজন মানুষকে বাঘে নিয়েচে, গোরু-বাছুর তো রোজই নেয় বস্তি থেকে।

আমরা খুব সতর্ক হয়ে পথে হাঁটতুম, অথচ এই পথে বন খুব কম, যোজন ছড়ানো ডাঙাই প্রায় সবটা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন-আর পাহাড়। এই ছোট বনের মধ্যেই নাকি বাঘে মানুষ নিয়েচে!

এই সব বন্তগ্রামে বাঘের উৎপাত খুব বেশি।

একজন বৃদ্ধ বললে—এমন গ্রাম নেই, যেখান থেকে বছরে দু-চারটে গোরু-বাছুর না নেয়, মানুষও নেয় মাঝে মাঝে।

—বাঘ ছাড়া আর কি জানোয়ারের উৎপাত আছে?

—বাঘের পরেই বুনো মহিষের উপদ্রব। ফসল বড় নষ্ট করে দেয় এরা।

—তোমরা কি কর তখন?

—আমরা আগুন জ্বালি, টিন বাজাই—সারা রাত জাগতে হয় ক্ষেতের মধ্যে মাচা বেঁধে।

—বাঘ মারো না?

—বাবু, সবাই শিকারী নয় তো, বাঘ শিকার করা সহজ নয়। যখন বড্ড উৎপাত হয়, তখন অন্য জায়গা থেকে শিকারী ডেকে আনতে হয়।

—তীরধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করে?

—চিরকাল তাই হয়ে এসেচে, যখন কিছুতেই না পারা যায়, তখন বন্দুকওয়ালা সাহেব শিকারীকে আনাতে হয়। তাও একবার এমনি হল, সাহেব শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে জখম হল, শহরের দাওয়াইখানায় নিয়ে যেতে যেতে পথেই মারা পড়লো।

—বড় সাপ দেখেচ কখনো? আছে এ বনে?

—বড় ময়াল সাপ আছে, তবে তাদের বড় একটা দেখা যায় না, পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের খোড়লে লুকিয়ে থাকে। একবার আমি একটা দেখেছিলুম। অনেকদিন আগের কথা, তখন আমার জোয়ান বয়স, পাহাড়ের ধারে ছাগল চরাতে গিয়েচি এমন সময় একটা ছাগল হঠাৎ ব্যা ব্যা করে ডাকতে লাগলো কোন্ দিক থেকে! অনেক ছাগল এদিকে-ওদিকে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে, প্রথমটা তো বুঝতে পারিনি কোথা থেকে ডাক আসচে—

—তারপর?

—তারপর দেখি এক জায়গায় একটা বাবলা গাছ আছে, তার তলায় সামান্য একটু জায়গায় লম্বা ঘাসের বন, সেই বনটার মধ্যে থেকে ছাগলের ডাক আসচে। ব্যাপার কি দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ভীষণ অজগর সাপ ছাগলটার পেছন দিকের দুখানা ঠ্যাং একেবারে গিলে ফেলেচে। বাবলা গাছের গুঁড়িতে সাপটা জড়িয়ে ছিল, একবার একটু একটু করে পাক খুলচে। তখন আমি ছাগলের সামনের পা ধরে টানাটানি আরম্ভ করতেই সাপটা আর পাক না খুলে গাছের গুঁড়ি এমন জড়িয়ে এঁটে ধরলে যে আমি জোর করেও ছাগলটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনে। ময়াল সাপের গায়ে ভীষণ জোর। তখন গ্রাম থেকে লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে সাপটা মেরে ফেলি।

দামুণ্ডি ছাড়িয়ে মাইল দশেক হেঁটে আমি অমর-কণ্টক রোড স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরলুম।

১৯৩৩ সালে খবরের কাগজে বার হল যে উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর জেলায় বিক্রমখোল

নামক স্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েচে। অনেক লোক দেখতে যাচ্চে এবং স্থানীয় পুলিসে লোকজন যাবার অনেক সুবিধে করে দিয়েচে। এ-কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর এবং হরিণ, বনমোরগ, সম্বর প্রভৃতি বন্যজন্তু যথেষ্ট পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক। সজনীবাবু আমাকে 'বঙ্গশ্রী'র তরফ থেকে বিক্রমখোল পাঠাতে সম্মত হলেন—সঙ্গে যাবেন 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় ও ফটো-গ্রাফার হিসাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের মধ্যম ভ্রাতা প্রমোদরঞ্জনও আমাদের সহযাত্রী হবেন ঠিক হল।

৩রা মার্চ শুক্রবার আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হবো ধার্য ছিল। এদিন বেলার তিনটের সময় আমি 'বঙ্গশ্রী' আপিসে গিয়ে কিরণ ও পরিমলবাবুকে তাগাদা দিলাম। পরিমলবাবু ক্যামেরা ও জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে আমার অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। আমি বললুম—আপনারা রওনা হয়ে যাবেন সাতটার সময়ে, হাওড়া স্টেশনে বি. এন. আর-এর ইণ্টার ক্লাস টিকিটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ আমি না যাই।

প্রমোদবাবুকেও ফোন করে সে কথা জানানো হল। বনজঙ্গলের পথে কয় বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে যাবো, মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ। নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি শুধু কিরণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন টিকিটঘরের সামনে। ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি মাত্র বাকি—আমাদের দুজনেরই মন দমে গেল। বন্ধুরা সব একসঙ্গে গেলে যে আনন্দ হবার কথা, দুজনে মাত্র গেলে সে আনন্দ পাওয়া যাবে না। অনেকবার এ-রকম হয়েচে, যারা যারা যাবে বলেচে কোথাও, শেষপর্যন্ত তাদের অধিকাংশই আসেনি।

কিরণবাবু বললেন—টিকিট করে চলুন আমরা আগে গিয়ে জায়গা দখল করি।

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বেজায় ভিড় হয়, আমরা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুতরাং কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল।

গাড়িতে উঠে আমরা বেপরোয়া ভাবে চারজনের জন্যে চারখানা বেঞ্চিতে বিছানার চাদর, গায়ের কাপড় ইত্যাদি পেতে জায়গা দখল করলুম। তারপর কিরণবাবুকে পাঠিয়ে দিলুম বাকি দুজনের খোঁজে।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট দশেক আগে ছুটতে ছুটতে সবাই এসে হাজির। পরিমলবাবু শেষ মুহূর্তে তাঁর ক্যামেরার জন্যে কি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন—তাই দেরি হল।

একজন রেলওয়ে কর্মচারী বলে গেল—এ গাড়ি সিনি জংশন হয়ে যাবে।

আমরা বললুম—মশাই, বেলপাহাড় যাবে তো?

বেলপাহাড় বহুদূরের স্টেশন। লোকটি খোঁজ রাখে না, নামও শোনেনি। বললে—সে কতদূরে বলুন তো? বিলাসপুরের এদিকে?

—অনেক এদিকে, ঝার্সাগুডার পরে।

—নির্ভাবনায় যান—এ লাইন খারাপ হয়েচে তার অনেক আগে। চক্রধরপুরে গিয়ে আবার যেন লাইনে উঠবেন।

ট্রেন ছাড়লো। আমাদের ঘুম নেই উৎসাহে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত সবাই মিলে বকবক্ করচি। রাত্তে সাড়ে বারোটায় ট্রেন খড়্গাপুরে এলে আমরা চা খেলুম। খড়্গাপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে বেড়ালুম।

চমৎকার জ্যোৎস্না। শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সামনে আসচে পূর্ণিমা।

খড়্গাপুর ছাড়িয়ে জমির প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। রাঙা মাটি, উঁচুনীচু পাথুরে জমি, বড় বড় প্রান্তর—জ্যোৎস্নারাত্রে সে সব জায়গা দেখাচ্চে যেন ভিন্ন কোনো রহস্যময় জগৎ, আমাদের বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী যেন এ নয়। যেন কোন্ অজানা গ্রহলোকে এসে পড়েচি—যেখানে প্রতিমুহূর্তে নব সৌন্দর্যের সম্ভার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবার সম্ভাবনা।

এ পথে আমার সঙ্গীরা কেউ কোনোদিন আসেনি। বিশেষ করে প্রমোদ ও পরিমল দুজনেই প্রকৃতিরসিক, তারা ঘুমোবার নামটি করে না। আমিও এ পথে একবার মাত্র এসেচি, তাও অন্ধকার রাত্রে, পথের বিশেষ কিছুই দেখিনি—সুতরাং আমিও জেগে বসে আছি।

সর্ডিহা ছাড়িয়ে রেললাইনের দুধারে নিবিড় শালবন, বসন্তে শিমুল ফুল ফুটে আছে শালবনের মাঝে মাঝে—যদিও রাত্রে কিছু বোঝা যায় না, গাছটা শিমুল বলে চেনা যায় এই পর্যন্ত।

গিডনি ছাড়িয়ে গেলে আমি বললুম—এইবার সব ঘুমিয়ে নাও—রাত একটা বেজে গিয়েচে—কাল পরশু কোথায় খাবো, কোথায় ঘুমুবো কিছুই ঠিক নেই। পথে বেরুলে শরীরটাকে আগে ঠিক রাখতে হবে।

সারারাত্রি ট্রেন চললো। আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—কখন যে ঘুম এসেচে, আর কিছুই জানি না। ফিরিওয়ালার চীৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে—আর সামনের রাস্তা দিয়ে লম্বা মোটরের সারি ক্রমাগত স্টেশনের দিকে আসচে।

তার আগে কখনো টাটানগর দেখিনি—এ বনজঙ্গলের দেশে এত মোটর গাড়ির ভিড় যখন, এ টাটানগর না হয়ে যায় না। আমার নিদ্রিত সঙ্গীদের ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি হাঁক দিয়ে বললাম—ও প্রমোদবাবু, ও কিরণ—ঘুমুতেই এসেচ কি শুধু পয়সা খরচ করে? উঠে টাটানগর দেখ—টাটানগর এসেচে—

পরিমল উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললে—কি স্টেশন এটা?

—টাটানগর।

—চা পাওয়া যাচ্চে তো?

—অভাব কি। ওদের সব ঘুম ভাঙিয়ে দাও—চা ডাকি।

প্রমোদবাবু প্ল্যাটফর্মে নেমে বললে—আরে এ টাটানগর কোথায়। লেখা আছে সিনি জংশন।

আমরা সবাই অবাক, এ কি, এত বড় জায়গা—এত মোটরের ভিড় সিনি জংসনে! কখনও তো নামও শুনিনি।

দু-চারজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এত মোটরের ভিড়ের কারণ, সেরাইকেলার রাজার ছেলের বিয়ে—সিনি জংশন থেকে সেরাইকেলা মাইল পনেরো-কুড়ি পথ—এসব মোটর বরযাত্রী নিয়ে আসচে সেরাইকেলা থেকে।

আমরা চা খেয়ে ট্রেনে উঠে বসলুম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমার বন্ধুরা সব জানালার কাছে বসেচে। প্রমোদবাবু কেবল চেঁচিয়ে বলেন—ও বিভূতিবাবু, এমন চমৎকার একটা পাহাড় গেল দেখতে পেলেন না!

ওদিকে কিরণ চেঁচিয়ে ওঠে—কি সুন্দর নদী একটা! দেখুন দেখুন—এই জানলায় আসুন—চট্ করে—

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশনে থেকে মনোহরপুর পর্যন্ত দু-ধারের অরণ্য-পর্বতের দৃশ্য অতুলনীয়। গৈলকেরা স্টেশনে এসে পাহাড় জঙ্গলের দৃশ্য দেখে প্রমোদবাবু তো একেবারে নির্বাক! পরিমলবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনের পাহাড়ের একটা ফটো তুলে নিলেন। তারপর রেলপথের দুধারেই অপূর্ব দৃশ্য—জানালা থেকে চোখ ফেরাতে পারিনে। গৈলকেরা স্টেশনে বড় বড় পেঁপে গোটাকতক কেনা হয়েছিল—কিরণ সেগুলো ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে নিলে।

বসন্তকাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সায়েঙ্গ টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজপত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্যালোক, বনের মাথার ওপরে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য নদী শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেচে, কোথাও একটা বড় নির্জন পথ রেললাইনের দিক থেকে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কোথাও প্রকাণ্ড কোয়ার্ৎজ পাথরের পাহাড়টা বনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, কোথাও একটা অদ্ভুতদর্শন বিশাল শিলাখণ্ড বনের মধ্যে পড়ে আছে—প্রমোদবাবু আর কিরণের খুশি দেখে কে! পরিমল বেচারী তো ফটো নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচে, আর কেবল মুখে বলচে, ওঃ, এইখানে যদি ট্রেনটা একটু দাঁড়াতো! ওখানে যদি ট্রেন একটু দাঁড়াতো!

বেলা দুটোর সময় ঝার্সাগুডা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। এখানে আমরা চা খেয়ে নিলুম।

প্রমোদবাবু টাইমটেবল দেখে বললেন—বিছানা বেঁধে ফেলুন সবাই, আর দুটো স্টেশন পরেই বেলপাহাড়। ওখানেই নামতে হবে।

ইব বলে একটা ছোট স্টেশন ঘন বনের মধ্যে।

স্থানটার বড় চমৎকার শোভা। স্টেশনের কাছেই একটা নদী, তার দুপারে ঘন বন, বনের মধ্যে রাঙা ধাতুপ ফুলের মেলা।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল নদীর নাম ব্রাহ্মণী বা বাম্‌নী।

বেলপাহাড় স্টেশনে নামবার আগে দেখি ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অনেকগুলি লোক

সারবন্দী হয়ে কাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই তারা আমাদের কাছে ছুটে এল—উড়িয়া ভাষায় বললে—বাবুরা কলকাতা থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ। তোমরা কাকে খুঁজচো?

—সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েচেন। আপনাদের আসবার কথা ছিল, আপনাদের সব বন্দোবস্তের ভার নেবার পরোয়ানা দিয়েচেন আমাদের ওপর।

প্রমোদবাবুর দাদা বন্ধুবর নীরদবাবুর সঙ্গে সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতির আলাপ ছিল, সেই সূত্রে নীরদবাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে এনেছিলুম, আমি ও প্রমোদবাবু কয়েকদিন পূর্বে। চিঠির মধ্যে অনুরোধ ছিল যেন গ্রাম্য পুলিস আমাদের গন্তব্য স্থানে যাবার একটু ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা যে এভাবে অভ্যর্থনায় পরিণত হবে তা আমরা ভাবিনি।

বেলপাহাড় স্টেশন থেকে কিছুদূরে ডাকবাংলোয় তারা নিয়ে গিয়ে তুললে। একটু দূরে একটা বড় পুকুর, আমরা সকলে পুকুরের জলে নেমে স্নান করে সারাদিন রেলভ্রমণের পরে যেন নতুন জীবন পেলাম। পুকুরের পাড়ে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির।

স্থানটি চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা—অবিশ্যি পাহাড়শ্রেণী দূরে দূরে।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ডাকবাংলোয় আমাদের জন্তে রান্না করে রেখেচে। স্নান করে এসে আমরা আহারে বসে গেলুম, শালপাতায় আলোচালের ভাত আর কাঁচা শালপাতার বাটিতে ডাল। পাচক ব্রাহ্মণটি যেন সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি, শান্ত নম্রস্বভাব—আমাদের ভয়েই যেন সে জড়সড়। সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাদের পরিবেশণ করছিল—যেন তার এতটুকু ত্রুটি দেখলে আমরা তাকে জেলে পাঠাবো। ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু আমরা—বলা তো যায় না। তারপর জিজ্ঞেস করে জানা গেল ব্রাহ্মণ পুকুরপাড়ের সেই মন্দিরের পূজারী।

বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙা মাটির টিলার গায়ে।

কি ঘন শালবন, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা।

ডাকবাংলো থেকে অল্প দূরে একটি গ্রাম্য হাট বসেচে। আমরা হাটে বেড়াতে গেলুম। উড়িয়া মেয়েরা হাট থেকে ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরচে। আমরা হাট বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলুম। পরিমল কয়েকটি ফটো নিলে। বেগুন, রেড়ির বীজ, কুচো শুটকি চিংড়ি, কুমড়ো প্রভৃতি বিক্রি হচ্চে। এক দোকানে একটি উড়িয়া যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি কিনচে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলুম। পাচক ব্রাহ্মণটি এসে বিনীত ভাবে উড়িয়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, রাত্রে আমরা কি খাবো। আমাদের এত আনন্দ হয়েচে যে, কত রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে বসে আমরা গল্প করলুম। রাত দশটার সময় আহারাদি শেষ হয়ে গেল—কিন্তু ঘুম আর আসে না কারো চোখে।

পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হই। আমাদের সঙ্গে রইল গ্রাম্য পাটোয়ারী ও দুজন ফরেস্ট গার্ড—একখানা গোরুর গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র চললো, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলুম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম বিক্রমখোল এখান থেকে প্রায় তেরো মাইল।

বেলপাহাড় থেকে বিক্রমখোল পর্যন্ত এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে চিরকালের ছবি এঁকে রেখে দিয়েচে। কতবার অবকাশমুহূর্তে স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই নদী-পর্বত-অরণ্য-সমাকুল নির্জন বন্যপথটির স্মৃতি। প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশবনের শোভা ও রাঙা ধাতুপ ফুলের সমারোহ সারাপথে, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর খাত বেয়ে ঝিরঝির করে জল চলেচে পাথরের নুড়ির রাশির ওপর দিয়ে।

এক জায়গায় বড় বড় গাছের ছায়া। সামনে একটি পাহাড়ী নদীর কাঠের পুলের ওপর ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে দিচে। ঝরনার দুধারে পাহাড়ী করবীর গাছ ফুলের ভারে জলের ওপর মুয়ে আছে। প্রমোদবাবু প্রস্তাব করলেন, এখানে একটু চা সেরে নেওয়া যাক বসে।

কিরণ বললে—চা খাওয়ার উপযুক্ত জায়গা বটে। বসুন সবাই।

আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কে চা ছিল, আর ছিল মার্মালেড আর পাঁউরুটি। মার্মালেডের টিনটা এই প্রথম খোলা হল। প্রমোদ ও পরিমল রুটি কেটে বেশ করে মার্মালেড মাখিয়ে সকলকে দিলে—কিরণ চা দিল সবাইকে টিনের কাপে।

কিছুক্ষণ পরে কিরণ রুটি মুখে দিয়ে বললে—এত তেতো কেন ? এঃ—

আমিও রুটি মুখে দিয়ে সেই কথাই বললুম। ব্যাপার কি ? শেষে দেখা গেল মার্মালেডটাই তেতো। মার্মালেড নাকি তেতো হয়, পরিমল বললে। কি জানি বাবু, চিরকাল পড়ে এসেচি মার্মালেড মানে মোরব্বা, সে যে আবার তেতো জিনিস—তা কি করে জানা যাবে ?

এ নাকি সেভিলের তেতো কমলালেবুর খোসায় তৈরী মার্মালেড, টিনের গায়ে লেখা আছে।

পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার ওপর সবাই খাপ্পা। কেন বাপু কিনতে গেলে সেভিলের তেতো কমলালেবুর মার্মালেড। বাজারে জ্যাম জেলি ছিল না ?

হাঁটতে হাঁটতে রৌদ্র চড়ে গেল দিব্যি। বেলা প্রায় এগারোটা।…পথের নব নব রূপের মোহে পথ হাঁটার কষ্টটা আর মনে হচ্ছিল না। এ যেন জনহীন অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে চলেচি—এতটা পথ চলে এলুম, কোথাও একটা চষা ক্ষেত চোখে পড়লো না। শুধু পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

এক জায়গায় পাহাড় একেবারে পথের গা ঘেঁষে অনেক দূর চলেচে। পাহাড়ের ছায়া আগাগোড়া পথটাতে। আমাদের বাঁদিকে জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে একটা নদীর খাতে গিয়ে মিশলো। সমস্ত ঢালুটা বন্য-করবী ফুলের বন। পাহাড়ের ওপর বাঁশবন এদেশে এই প্রথম দেখলুম। বন্যবাঁশ আমি চন্দ্রনাথ ও আরাকান-ইয়োমার পাহাড়শ্রেণী ছাড়া ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের আর্দ্রতা-শূন্য আবহাওয়ায় এই বন্যবাঁশ সাধারণত জন্মায় না। বাঁশ যেখানে আছে, তা মানুষের সযত্নরোপিত।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা ত্রিগোলা বলে একটি গ্রামে পৌঁছলুম। এই গ্রাম আমাদের গন্তব্যস্থান থেকে মাত্র দু মাইল এদিকে, এখানেই আমরা দুপুরে খাবো-দাবো।

গ্রামে ঢুকবার আগে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঢুকবার পথের দুধারে সারবন্দী লোক দাঁড়িয়ে কাদের অপেক্ষা করচে যেন—অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রমোদবাবু বললেন—ওখানে অত লোক কিসের হে?

পরিমল বললে—আমি একটা ফটো নেবো।

আমরা কাছে যেতেই তারা আমাদের একযোগে পুলিস প্যারেডের মতো সেলাম করলে। ওদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—আমার নাম বিম্বাধর, আমি এই গ্রামের গ্রামীণ। ডেপুটি কমিশনার সাহেব পরোয়ানা পাঠিয়েচেন কাল আমার ওপর, আপনাদের বিক্রমখোল দেখবার বন্দোবস্ত করতে। সব করে রেখেচি—আসুন বাবুসাহেবরা।

কিরণ বললে—ব্যাপার কি হে?

পরিমল বললে—রাজশক্তি পেছনে থাকলেই অমনি হয়, এমনি আমরা ট্যাং ট্যাং করে এলে কেউ কি পুঁছত? এ ডেপুটি কমিশনারের পরোয়ানা—

আমি বললুম—টুঁ করবার জো-টি নেই।

গ্রামের মাঝখানে মণ্ডপঘর। সেখানে আমাদের নিয়ে গিয়ে সবাই তুললে। রথ-যাত্রার ভিড় লেগেচে সেখানে, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে জড় হয়েছে কলকাতা থেকে মহাপ্রতাপশালী বাবুরা আসচেন শুনে। ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং যাদের নামে পরোয়ানা পাঠান—তাদের একবার চোখে দেখে আসাই যাক!

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী ইতিমধ্যে জাহির করে দিয়েচে—বাবুরা সাধারণ লোক নয়! গবর্নমেণ্টের খাসদপ্তরের অফিসর সব। ভাইসব, হুঁশিয়ার!

বিম্বাধর আমাদের জন্যে এক ধামা ওকুড়া অর্থাৎ মুড়কি আর এক কড়া ভর্তি গরম দুধ নিয়ে এল। পরামর্শ করে স্থির হল আমরা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে এখনি বিক্রমখোল যাবো। সঙ্গে চারজন ফরেস্ট গার্ড এবং বিম্বাধর থাকবে। জঙ্গল বড় ঘন, বাঘ ভালুকের ভয়—বেলাবেলি সেখান থেকে ফিরতে হবে দেখে শুনে। এসে স্নানাহার করা যাবে—নতুবা এখন স্নানাহার করতে গেলে বেলা একেবারে পড়ে যাবে, সে সময় অত বড় জঙ্গলে ঢোকা যুক্তিযুক্ত হবে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলুম।

ত্রিগোলা ছাড়িয়ে মাইল দুই গিয়েই গভীর অরণ্যভূমি—লোকজনের বসতি নেই, শুধু বন্যবাঁশ আর শাল-পলাশের বন। প্রকাণ্ড বড় বড় লতা গাছের ডালে জড়াজড়ি করে আছে—গাছের ছায়ায় সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক; হরীতকী গাছের তলায় ইতস্তত শুকনো হরীতকী ছড়িয়ে পড়ে আছে—কোথাও আমলকি গাছে যথেষ্ট আমলকি ফলে আছে।

পূর্বে যে শুভ্রকাণ্ড বৃক্ষকে শিববৃক্ষ বলে উল্লেখ করেছি, এ বনে তার সংখ্যা খুব বেশি। এত শিব-বৃক্ষের ভিড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

এই বনে আর একটি পুষ্পবৃক্ষ দেখলুম—পরে অবিশ্যি সিংভূম অঞ্চলের পার্বত্য অরণ্যে এই জাতীয় গাছ আরও দেখেচি। গাছটার ফুল অবিকল কাঞ্চন ফুলের মতো, গাছটাও দেখতে সেই ধরনের। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে এই বৃক্ষ অজস্র পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

বনের মধ্যে মাইল দুই-তিন হাঁটবার পরে পথ ক্রমে উঁচু দিকে উঠতে লাগলো—এক জায়গায় গিয়ে পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। আমরা যেন একটা পাহাড়ের ওপর থেকে অনেক নীচু উপত্যকার দিকে চেয়ে দেখচি। আমাদের ওই উপত্যকার মধ্যে নামতে হবে সরু পথ বেয়ে, কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরুনো শেকড় ধরে।

বিষাধর আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বললে—পুলিসে জঙ্গল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েচে। নামতে তত অসুবিধে হবে না বাবু।

সবাই মিলে পাহাড়ের গা ধরে সন্তর্পণে অনেকটা নীচে নামলুম, আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে।

তারপর অপর দিকে চেয়ে দেখা গেল অনাবৃত পর্বতগাত্রে লম্বালম্বি-ভাবে খোদাই করা কতগুলি অজ্ঞাত অক্ষর বা ছবি। পরিমল বিভিন্ন দিক থেকে শিলালিপির ফটো নিলে, অক্ষর-গুলির অবিকল প্রতিলিপিও এঁকে নিলে। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। আমাদের আরও নীচে উপত্যকার মেজে। যে পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ, তাকে পাহাড় না বলে একটা মালভূমির অনাবৃত শিলাগাত্র বলাই সঙ্গত। নিম্নের উপত্যকা নানাজাতীয় বন্য-বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, তার মধ্যে কাঞ্চন ফুলগাছের মতো সেই গাছও যথেষ্ট—ফুলে ভর্তি হয়ে সেই নির্জন পর্বতারণ্যের শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করচে।

উপত্যকার ওদিকে আবার মালভূমির দেওয়াল খাড়া প্রাচীরের মতো উঠে গিয়েচে, সেদিকটাতেও ঘন জঙ্গল। এমন একটি জনহীন ঘন অরণ্যভূমির দৃশ্য কল্পনায় বড় একটা আনা যায় না, একবার দেখলে তারপর তার বন্য বাঁশ ঝোপের ছায়ায় বিচরণকারী মৃগযূথের ছবি মানসচক্ষে দর্শন করা কঠিন হয় না অবিশ্যি।

বেলা পড়ে আসচে। সমগ্র উপত্যকাভূমির অরণ্য ছায়াবৃত হয়ে এসেচে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে শালমঞ্জরীর সুগন্ধ।

বিষাধর বললে—এবার চলুন বাবুরা, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। অনেকটা যে ফিরতে হবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা সে স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে পরিমল আমাদের দলের একটা ফটো নিলে।

তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠলুম সবাই। বনের মধ্যে দিয়ে জোর পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা ত্রিগোলা পৌঁছলুম।

বিষাধরের লোকজন আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেছিল। ভাত ও পুরী দুই রকমই ছিল, যে যা খায়। আমরা নিকটবর্তী একটা পুকুরে স্নান করে এসে খেতে বসলুম।

গ্রামের লোকের ভিড় পূর্ববৎ। সবাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভোজন-রত বাঙালী বাবুদের দেখচে। গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা কেউ বোধ হয় বাকি নেই। চারিধারে উড়িয়া বুলি।

খাওয়া শেষ হল। একটি গ্রাম্য নাচের দল নাকি অনেকক্ষণ থেকে আমাদের নাচ দেখাবে বলে অপেক্ষা করচে। এখন যদি আমাদের অনুমতি হয় তো তারা আসে। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলুম। গ্রামের মণ্ডপঘরের সামনে রাস্তার ওপরে নাচ আরম্ভ হল। ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ে সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চললো নাচ।

বেলপাহাড়ের ট্রেজারী বললে—আর বাবু দেরি করবেন না। বড্ড পাহাড়-জঙ্গলের পথে ফিরতে হবে। এই বেলা রওনা হওয়া উচিত।

সেদিন দশমী তিথি। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো সন্ধ্যার পরই। আমার মনে একটা মতলব জাগলো। এই সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে সামনের সেই পাহাড়জঙ্গলের পথে একা যাবো। নতুবা ঠিক উপভোগ করতে পারা যাবে না।

সন্ধ্যার পরেই সবাই রওনা হল। আমি বললুম—হেঁটে আমি এক পা-ও যেতে পারবো না, পায়ে ব্যথা হয়েচে। আমি গোরুর গাড়িতে যাবো।

কিরণ বললে—বুঝতে পেরেচি, মুখেই শুধু বাগাড়ম্বর।

পরিমল বললে—বিভূতি দা'র সব মুখে। আমি ও অনেককাল থেকে জানি।

আমরা এবার রওনা হবো। জনৈক গৃহস্থ আমাদের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালে আজ রাত্রে তার মেয়ের বিয়ে—আমরা যদি আজ এখানে থেকে যাই এবং বিবাহ-উৎসবে যোগ দিই—তবে বড় আনন্দের কারণ হবে।

অবিশ্যি থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওদের ভদ্রতা আমাদের মুগ্ধ করলে। আমরা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বিবাহ-উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলুম। সময়ের অভাব, আজ রাত্রেই আমাদের ফিরতে হবে কলকাতায়।

যাওয়ার সময় বিদ্যাধর হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—আমার একটা আর্জি আছে বাবুদের কাছে—

—কি ?

—আমাকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স করে দিতে হবে। হুজুরদের মেহেরবানি।

গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত—সবাই আমাদের ঘিরে বিদ্যাধরের আর্জির ফলাফল জানবার জন্ত আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমোদবাবু বললে—ব্যাপার কি হে, বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া না দেওয়ায় আমাদের হাত কি তা তো বুঝলাম না। আমাদের ঠাউরেচে কি এরা ?

কিরণ বললে—গবর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী আর তার স্টাফ।

বিদ্যাধরকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারলুম না অতগুলো লোকের সামনে যে, আমাদের কোনো হাত নেই এ ব্যাপারে, গবর্নমেণ্টের ওপর আমাদের এতটুকু জোর নেই।

গম্ভীরভাবে বলতে হল—আমরা বিশেষ চেষ্টা করে দেখবো।

বৃদ্ধকে এ প্রতারণা করতে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের মানও তো বজায় রাখতে হবে !

প্রমোদ, পরিমল ও কিরণ হেঁটে রওনা হয়ে গেল। আমি একটু পরে গোরুর গাড়িতে রওনা হলুম। বিম্বাধর অনেকখানি রাস্তা আমার গোরুর গাড়ির পাশে পাশে এল। পথের পাশে শালবনে সেই নাচের দল রেঁধে খাচ্চে—শালপাতায় ভাত বেড়ে নিয়েচে, আর একটা অদ্ভুত গড়নের কাঁসার বাটিতে কি তরকারি।

বেশ আরগায় বসে খাচ্চে ওরা। গ্রাম সেখানে শেষ হয়ে গিয়েচে, ডাইনে বনশ্রেণী, পেছনের শৈলমালা জ্যোৎস্নায় কেমন অদ্ভুত দেখাচে। শালমঞ্জরীর গন্ধে-ভরা সান্ধ্য-বাতাস। ইচ্ছে হয় ওদের নাচের দলে যোগ দিয়ে এই সব জংলী গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই।

গ্রাম ছাড়িয়ে চলেচি। বিম্বাধর ও তার দল বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার ত্বধারে নির্জন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝে মাঝে শালপলাশের বন। পথ কখনো নিচে নামচে কখনো ওপরে উঠচে। গাড়োয়ান নীরবে গাড়ি চালাচ্চে, ত্ব একবার কি বলেছিল কিন্তু তার দেহাতী উড়িয়া বুলি আমি কিছুই বুঝলুম না। অগত্যা সে চুপ করে আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেচে।

সুতরাং এই জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ে, অরণ্যে ও প্রান্তরে আমি যেন একা। জ্যোৎস্না ফুটলে শালবনের রূপ যেন বদলে গেল, পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠলো। অনেকদিন কলকাতা শহরে বদ্ধ জীবন-যাপনের পরে, এই রোদপোড়া মাটির ভরপুর গন্ধ আমাকে আমার উত্তর-বিহারে যাপিত অরণ্যবাসের দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই রাত্রি, এই জ্যোৎস্না-লোককে আরও মধুময় করে তুলেচে।

ত্বটো তারা উঠেচে বাঁদিকের পাহাড় শ্রেণীর মাথায়। বৃহস্পতি ও শুক্র। পার্ক সার্কাসে টুইশানি করতে যাবার সময় রোজ দেখতুম তারা ত্বটো বড় বড় বাড়ির মাথার উপর উঠচে। সেদিনও দেখে এসেচি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম কোথায় পার্ক সার্কাসের সেই তেতালা বাড়িটা, সেই ট্রাম লাইন, আর কোথায় এই মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্না-ওঠা বনভূমি, ঝরনা, বাঁশবন, পাহাড়শ্রেণী!···কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই। একা যেন আমি এই সৌন্দর্যলোকের অধিবাসী।

মন এ সব স্থানে অন্য রকম হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত গভীর নির্জন স্থানে মাঝে মাঝে বাস করা। মন অন্যরকম কথা কয় এই সব জায়গায়। মনের গভীরতম দেশে কি কথা লুকোনো আছে, তা বুঝতে হলে নির্জনতার দরকার। ভারতবর্ষের রূপও যেন ভালো করে চেনা গেল আজ। বাংলার সমতলভূমিতে বাস করে আমরা ভারতের ভূমিশ্রীর প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি না। অথচ এই রাস্তা, মাটি, পাহাড় আর শালবন—এখান থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্য ভারতের এই রূপ।

খড়্গপুর ছাড়িয়েই আরম্ভ হয়েছে রাঙা মাটি, পাহাড় আর শালবন—এই চারশো মাইল বরাবর চলেচে; শুধু চারশো কেন, আটশো মাইল আরও চলেচে সহ্যাদ্রির অরণ্যানী ও ঘাট-শ্রেণী পর্যন্ত।

ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি, মালাবার উপকূলে ট্রপিক্যাল অরণ্য। আর্যাবর্তের সমতলভূমি

পার হয়েই নগাধিরাজ হিমালয়—ভারতের আসল রূপই এই। বাংলা অন্য ধরনের দেশ—বাংলা শ্যামল, কমনীয়, ছায়াভরা ; সেখানে সবই মৃদু, সুকুমার, গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এখানে যেন শিবমূর্তি ধরেচে—কমনীয়তা নেই, লাবণ্য নেই—শুধু রুক্ষ, বিরাট, উদার। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের বনের শিববৃক্ষ যেন এখানকার প্রকৃতির রূপের প্রতীক।

অনেকরাত্রে ডাকবাংলোয় পৌছলুম। বন্ধুরা তখনও কেউ আসেনি। একাই অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে দেখে এলুম।

—কে মেরেচে ?

—রেলের এক সাহেব। দেখে এসো, প্লাটফর্মে মরা হায়েনাটা এনে রেখেচে।

—তার চেয়ে ঠাকুরকে চা করতে বলা যাক, এসো চা খাওয়া যাক। মরা হায়েনা দেখে কি হবে।

সেই পূজারী ঠাকুর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ভাত বেড়ে দিলে।

এত রাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অনেকগুলি লোক ডাক-বাংলোয় এসেছিল আমাদের বিদায় দিতে।

দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ অস্ত গেল।

আমরা স্টেশনে চলে এলুম, রাত দুটোয় ট্রেন, শীত পড়েচে খুব।

পাটোয়ারী হাত জোড় করে বললে—বাবু, বিম্বাধরের আর্জিটা মনে আছে তো ? আমায় বার বার করে বলে দিয়েচে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে। আপনারা বড়লোক, একটু বলে দিলেই গরিবের অনেক উপকার হয়।

কথাটা ঠিক, কিন্তু বলি কাকে ?

হায় বিম্বাধর !
